সাহিত্যিকী

সংখ্যা ৫৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩

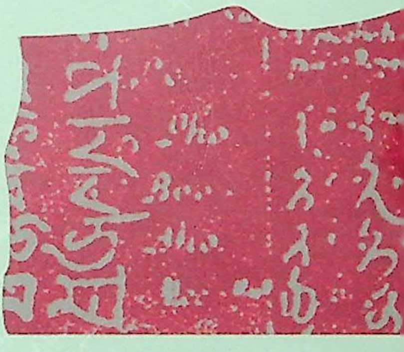

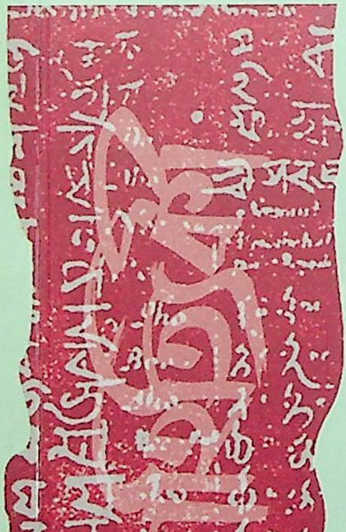

বাংলা গবেষণা সংসদ

সাহিত্যিকী

সাহিত্যিকী

সংখ্যা : ৫৩ ॥ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বর্ষ : ৬৪ ॥ আশ্বিন ১৪৩০

সেমিনার লাইব্রেরী
বাংলা বিভাগ
বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ ইকবাল
সম্পাদক

বাংলা গবেষণা সংসদ
বাংলা বিভাগ ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিকী
(Sahityiki)
ত্রিপঞ্চাশৎ খণ্ড

প্রকাশক
বাংলা গবেষণা সংসদ
বাংলা বিভাগ ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বত্ব
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫
বাংলাদেশ

মুদ্রণ
জাহান কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং ॥ রাজশাহী
ই-মেইল : mnhaquerajbd@gmail.com

প্রচ্ছদ
বিপ্লব দত্ত

মূল্য : চারশত টাকা

ISSN : 1994-4888

প্রাপ্তিস্থান : সম্পাদক, *সাহিত্যিকী*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ই মেইল : rubanglagobeshona@gmail.com

জ্ঞাতব্য : এ পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে লেখকের/ লেখকবৃন্দের একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নন।

SAHITYIKI, Vol. 53, September 2023
Edited by Shahid Iqbal, Professor and Chirman, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi, BANGLADESH. Published by Bangla Gobeshana Sangsad, Department of Bangla, University of Rajshahi; Printed by the Jahan Computer and Printing, Rajshahi.

সাহিত্যিকী

সম্পাদনা পরিষদ
(২০২২-২০২৩)

সম্পাদনা-পরিষদ

প্রফেসর শহীদ ইকবাল	সম্পাদক
প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন	সদস্য
প্রফেসর মনিরা কায়েস	সদস্য
প্রফেসর শামীমা হামিদ	সদস্য
প্রফেসর এ কে এম মাসুদ রাজা	সদস্য

বিভাগ
বিশ্ববিদ্যালয়

সূ চি প ত্র

মহীবুল আজিজ
প্রথম ইঙ্গভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ০৯-২০ পৃ.

মোহাম্মদ আজম
শার্লক হোমস সিরিজে উপনিবেশ প্রসঙ্গ ২১-৪৬ পৃ.

মো. মনিরুল ইসলাম
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ : উপনিবেশায়ন ও উপনিবেশিকতা ৪৭-৬৬ পৃ.

হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী : পূর্ববঙ্গের জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব ৬৭-৮২ পৃ.

সিনথিয়া মুমু
গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজি *দেশ মাটি মানুষ* : ১৯২২-১৯৪৬ কালপর্বে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী ৮৩-৯৮ পৃ.

সাদ্দাম হুসাইন
সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ ৯৯-১২৬ পৃ.

শতবার্ষিক-স্মরণ [১২৭-২০৪ পৃ.]

শেখ রজিকুল ইসলাম
সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* : জীবন ও বাস্তবতার প্রতীতি ১২৯-১৭০ পৃ.

শামসুদ্দিন চৌধুরী
ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মশতবর্ষ ও সাম্প্রতিক ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চার ধারা ১৭১-১৯২ পৃ.

জুনান নাশিত
নিরাভরণ মানবব্যক্তিত্ব কবি আবুল হোসেন ১৯৩-২০৪ পৃ.

সাহিত্যিকী সূচিপত্র (১৩৬৬-১৪২৯) • ২০৫-২৩৮ পৃ.

প্রথম ইঙ্গভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ

মহীবুল আজিজ*

সারসংক্ষেপ

প্রথম ইঙ্গভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর বাঙালিয়ানাকে নিয়ে গেছেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে। এমনকি বিদেশিরাও যখন ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন ও পর্যালোচনা করেন তখনও অনিবার্যভাবে তিনি পালন করেন পথিকৃতের ভূমিকা। অথচ এ কবির প্রসঙ্গ ও পরিচয় অধিকাংশের কাছে প্রায় অজানা। তাঁর ইংরেজি ভাষায় যে রচনাবলি সেগুলো প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এর যে কাব্যসুধারস ও অনিবার্য আলংকারিক দ্যোতনা তা অনবদ্য এবং অতুল্য সম্মুখসঞ্চারী। এক অর্থে 'প্রত্যাখ্যাত' এ বাঙালি কবি আমাদের নিকট নানা কারণেই হয়ে উঠতে পারেন আগ্রহের কেন্দ্র। এখানে উপনিবেশ ভারতবর্ষে কবি কাশীপ্রসাদের পরিপ্রেক্ষিত ও কাব্যবিভার সম্যক মূল্যায়নের প্রয়াস পাওয়া গেছে। এ থেকে আমাদের জ্ঞান-পরিসরে যুক্ত হবে নতুন অভিমুখ।

বর্তমানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা তেমন কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় নয়। বলা যায় বিশ্বসাহিত্যের অনিবার্য লেখকে পরিণত হয়ে তাঁরা ভারতীয় দিগন্তের বহুতর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু কোম্পানি আমলে কিংবা এমনকি ব্রিটিশ-শাসনকালে ভারতীয়দের ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা ছিল নানাবিধ আকর্ষণ ও কৌতূহলের বিষয়। ভারতীয়দের মধ্যে আবার যাঁরা ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে বাঙালি সাহিত্যিকদের অবস্থান যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের রচিত ইংরেজি ভাষার সাহিত্যও যে কোনো অংশে অবহেলার বিষয়বস্তু নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে অনেককাল আগেই। কেননা তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে ভারতীয় এবং অভারতীয় তথা ইংরেজিভাষী সমালোচকদের দ্বারা। সেইসব গ্রন্থে ইঙ্গভারতীয় লেখকদের সাহিত্য নির্ণীত-বিশ্লেষিত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমানে উপনিবেশমুক্ত স্বাধীন পরিস্থিতিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের যে-জয়জয়কার সেটির পূর্ব বা আদি প্রেক্ষাপট হিসেবে অবশ্যই ঔপনিবেশিককালের সাহিত্যিক পটভূমিটির গুরুত্ব বিবেচনাযোগ্য।

১৯০৮ সালে লন্ডন থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেটির রচয়িতা ই. এফ. ওটেন এবং গ্রন্থটির শিরোনাম *আ স্কেচ অব এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লিটারেচর*। এটি হচ্ছে কোনো

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অভারতীয় কর্তৃক ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়নমূলক প্রথম গ্রন্থ। ওটেন সাহেব তাঁর এই গ্রন্থে ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের জন্মক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ১৭৮৩ সালকে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ওটেন-এর এ মূল্যায়ন অভ্রান্ত নয় কেননা তিনি যাঁকে প্রথম ইঙ্গভারতীয় কবি হিসেবে সনাক্ত করেন তিনি মূলত ইংরেজ, ভারতীয় বংশোদ্ভূতই নন। অর্থাৎ তিনি তখন কর্মসূত্রে ভারতবর্ষে বসবাসরত ছিলেন কিন্তু কেবল কর্মের মানদণ্ডে তাঁকে ইঙ্গভারতীয়রূপে চিহ্নিত করা কতটা যুক্তিসঙ্গত সে-প্রশ্ন উত্থাপন করাই যায়। ১৭৮৩ সালে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথমবারের মতো পা রাখেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে বিচারক নিযুক্ত হন মার্চের ৪ তারিখে। একই বছরের ২০ মার্চ তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন এবং এপ্রিল মাসে আনা মারিয়া শিপলে'র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আরবি-ফারসি ভাষায় পারদর্শী জোন্স অবশ্য ইয়োন্স উক্সফার্দি (যেটির অর্থ অক্সফোর্ডের জোন্স) ছদ্মনামে লেখালেখি করেন। বিশেষ করে ১৭৭১ সালে প্রকাশিত *পারসিয়ান গ্রামার* গ্রন্থে মুদ্রিত হয় তাঁর এ ছদ্মনাম। ওটেনের মূল্যায়নটি জোন্সের ভারতে অবস্থানের নিরিখেই নির্ণীত হয়। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় ১৭৬৩ সালে অর্থাৎ ভারতে আগমনের আরও বহুকাল আগে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইংরেজিতে কবিতা রচনা করেন। ১৫২৭ সালে রচিত মার্কো গিরোলামো ভিডা'র ৬৫৮ পংক্তির কবিতা *স্কাশিয়া লুডুস* অবলম্বনে তিনি রচনা করেন *ক্যায়সা* নামক কবিতাটি। পৌরাণিক চরিত্র ক্যায়সা-কে দাবা খেলার দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীকালে ভারতে থাকাকালে তিনি রচনা করেন *দ্য এনচ্যান্টেড ফ্লুট*, *হিন্দু ওয়াইফস*হ আরও কিছু কবিতা।

ই. এফ. ওটেন রচিত গ্রন্থে আলোচিত প্রধান ইঙ্গভারতীয় লেখকরা হলেন জন লেডেন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, বিশপ হেবের, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (ডি. এল. রিচার্ডসন), জর্জ পাওয়েল থমাস, জে. বি. নর্টন, আলফ্রেড লায়াল, রুডইয়ার্ড কিপলিং, হেনরি মেরিডিথ পার্কার, এডউইন আর্নল্ড, ডব্ল্যু. টি. পিয়ারসি, এলিফ চিম, টি. এফ. বিগনোল্ড, ই. এইচ. এ্যাটকেন, ইলটুড্স্ প্রিচার্ড, মিডোজ টেলর, এইচ. এস. কানিংহ্যাম, জন লং, জি. বি. ফ্রেজার এবং আর. ডব্ল্যু. ফ্রেজার। ওটেনের গ্রন্থে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ রয়েছে যদিও তাঁদের সাহিত্যিক মূল্যায়ন নেই। এঁরা হলেন এইচ. বিজয়চাঁদ দত্ত, জি. সি. দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত, পি. সি. মিত্র, লাল মনোকর, ভেসুভালা সি. নওরোজি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামস্বামী রাজু। ই. এফ. ওটেন বাঙালি কবি, কেবল বাঙালি কবিই নন, প্রথম ইঙ্গভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি, এমনকি তাঁর নামেরও উল্লেখ করেন নি। যাহোক, বিবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থটি প্রশংসার যোগ্য। পরবর্তীকালে ওটেন সাহেবের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যান টি. ও. ডি. ডান (থিওডোর ও'ডগলাস ডান)। ১৯১৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ

বেঙ্গলি রাইটার্স অব ইংলিশ ভার্স : আ রেকর্ড এ্যান্ড এ্যান এ্যাপ্রিসিয়েশন। এটি ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়ন হলেও অবাঙালি ভারতীয় লেখকদের সাহিত্য এতে আলোচিত হয় নি। ডান-ই প্রথম বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেন।

১৯০৬ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সি. ই. বাকল্যান্ডের *ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি* গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় কাশীপ্রসাদ ঘোষের যে-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে সেটি লক্ষ করা যেতে পারে। তাঁর জন্ম ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। ১৮২১ সালে তিনি 'ফ্রি স্কলার' হিসেবে হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। ১৮২৮ সালে প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসনের অনুরোধে 'গভর্নমেন্ট গেজেট' ও 'এশিয়াটিক জার্নালে' প্রকাশের জন্য জন স্টুয়ার্ট মিল-এর *ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস* গ্রন্থের সমালোচনা রচনা করেন। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *শায়ের এ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স*। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের স্থানীয় রাজাদের সম্পর্কে লেখা ইতিহাস যা পূর্বে ছদ্মনামে প্রকাশ পায় ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের 'লিটারেরি গেজেট' পত্রিকায়। ১৮৪০ সালে রিচার্ডসন নির্বাচিত ব্রিটিশ কবিদের কবিতার সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর কবিতা। ১৮৪৬ সালের নভেম্বরে কাশীপ্রসাদ সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্স' প্রকাশ শুরু করেন এবং সেটি ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ সালে লর্ড কানিংহ্যামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ধর্মসভা'। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তখন সব ধরনের ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধিতা করেন। তাঁকে কলকাতা শহরের 'জাস্টিস অব দ্য পিস' এবং অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করা হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের ১১ নভেম্বরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বোডেন-অধ্যাপক বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হোরেস হ্যাম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) রচিত (১৮৪৫-৪৮ সালের কালপরিধিতে) তিন খণ্ডের গ্রন্থ *দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ফ্রম ১৮০৫-১৮৩৫*-এর ৫০৬-৫১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের যে-আত্মজীবনী মুদ্রিত হয়েছিল সেটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মন-মানসিকতা এবং তাঁর অভিরুচি সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা এ থেকে পাওয়া যাবে। অবশ্য তাঁর কবিতার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অনেককাল আগেই এই বাঙালি কবি তাঁর রচনায় এমন ভাব-বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন যা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়কর। ১২১৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে তথা ১৮০৯ সালের আগস্ট মাসে তাঁর জন্ম। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সামান্য ইংরেজি ও বাংলা পড়তে পারতেন। ১৮২১ সালে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় 'ফ্রি স্কলার' হিসেবে। ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজ পরিদর্শনে আসেন এইচ. এইচ. উইলসন। স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রদের কাব্যরচনার দক্ষতা যাচাই করবার জন্য তাদেরকে কবিতা রচনা করতে দেওয়া হয়। একমাত্র কাশীপ্রসাদই কাব্যরচনায়

সক্ষমতা দেখাতে পারেন। সেটি ছিল 'তরুণ কবির সর্বপ্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা'। সময়টা ছিল আগস্ট মাস। কিন্তু সে-কবিতা এবং সেইসঙ্গে আরও কিছু কবিতা কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাতিল করে দেন কাঁচা হাতের রচনা এমন বিবেচনায়। স্কুলে থাকাকালীন রচিত কবিতার মধ্যে অনুমোদন পায় তাঁর রচিত একমাত্র কবিতা যেটির শিরোনাম 'দ্য শায়ের', যেটির অর্থ 'আশা'। ডক্টর উইলসনের অনুরোধে কাশীপ্রসাদ ঘোষ মিল-এর 'দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'-র প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ের সমালোচনা রচনা করেন এবং যেটি প্রথমে ছাপা হয় ১৮২৯ সালের ১৪ ফ্রেব্রুয়ারির 'গর্ভনমেন্ট গেজেট'-এ। পরে আবার সেটি ছাপা হয় 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ। মূলত কবি হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি বেশকিছু সমালোচনামূলক গদ্যও রচনা করেছিলেন। 'লিটারেরি গেজেট' পত্রিকায় বেরোয় তাঁর লেখা 'দ্য ভিশন, আ টেল', 'অন বেঙ্গলি পোয়েট্রি' এবং 'অন বেঙ্গল ওয়ার্ক্স এ্যান্ড রাইটার্স' প্রভৃতি সমালোচনামূলক গদ্য। জেমস লং প্রকাশিত 'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর রচনা 'স্কেচেস্ অব রণজিৎ সিং' এবং 'দ্য কিং অব ওউধ'। এছাড়া লং-এর 'লিটারেরি গেজেট'-এ বেরোয় তাঁর 'মেমোয়ার্স অব নেটিভ ইন্ডিয়ান ডাইন্যাস্টি'।

হোরেস উইলসনের আহ্বানে লেখা আত্মজীবনীতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ আরও জানান, ছোট থেকেই তিনি কবিতা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং কবিতা লিখতেন। হিন্দু কলেজে বিদ্যালয়ে পড়তে এলে সেখানকার শিক্ষক আর. হ্যালিফ্যাক্স তাঁকে বেশ অনুপ্রেরণা যোগান এবং তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখে সেসব দেখান তাঁকে। হ্যালিফ্যাক্স সাহেব কাশীপ্রসাদের কবিতাগুলো সোৎসাহে পাঠ করেন এবং তিনি তাঁকে বেশকিছু প্রয়োজনীয় বই পড়বার পরামর্শ দেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাংলা বাইবেলের অনুবাদের সীমাবদ্ধতা ও অযথার্থতা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। পত্রিকাটি কাশীপ্রসাদের সমালোচনা মেনে নেয় এবং বাইবেলের প্রথম অনুবাদটি মিশন থেকে তাঁকেই পাঠানো হয় ১৮৩১ সালে। মিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য অনুরোধও জানানো হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিশ্রম করে কাশীপ্রসাদ বাইবেল-অনুবাদের সংশোধনী ও পরিমার্জনা করে দেন। যদিও পরে জানা যায়, শ্রীরামপুর মিশন সর্বৈবভাবে কাশীপ্রসাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করে নি। দ্রুত মুদ্রণের জন্য অনেকটা দায়সারাভাবে তাঁরা ছাপিয়ে ফেলেন উইলিয়ম কেরী অনূদিত সেই বাইবেল। এটা হতে পারে সত্তর বছর বয়েসী কেরী সে সময়টাতে মাঝে-মাঝে অসুস্থ হয়ে যেতেন। তাঁর পক্ষে বাইবেলের কাশীপ্রসাদকৃত পরামর্শে পুরোপুরি সাড়া দেওয়াটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তবে এ থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়, *কথোপকথন* ও *লিপিমালার* রচয়িতা উইলিয়ম কেরী'র অনুবাদও যে ইংরেজি জানা বাঙালির দক্ষ হাতে পড়ে বেশ একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীনই হয়েছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি ছাড়াও ফারসি, নাগরী এবং সংস্কৃতেও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

আত্মজীবনীতে নিজের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে যে-তথ্য দেন তা থেকে জানা যায় ১৮২৫ সালে সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করেন তিনি। ১৮২৮ সালে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয় এবং সে বছরেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। পুনরায় বিয়ে করেন তিনি। মাত্র এক বছর বয়সী তাঁর পুত্রসন্তানটি মারা যায়। ১৮৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন তাঁর পিতা। ১৮৩২ সালে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী একটি কন্যসন্তানের জন্ম দিয়ে একই দিনে মৃত্যুবরণ করে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তৃতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। কাশীপ্রসাদরা ছিলেন চার বোন ছয় ভাই। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে বেশ জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয় তাঁদের পরিবারে। এমনকি তাঁকে মামলায় পড়ে শরাণাপন্ন হতে হয় কোর্ট-কাছারির। তিনি জানান, সৎ ভাইয়ের সঙ্গে যৌথ মালিকানার সম্পত্তিঘটিত মামলায় তাঁকে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়াতে হয়। তাঁর সৎ ভাইয়েরা তখন সকলেই ছিল নাবালক। পরিবারের সদস্যরা যৌথ মালিকানাধীন তাঁদের সম্পত্তির সুষম বিভাজনে ব্যর্থ হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। কোর্ট বেশ সুচারুরূপেই সম্পত্তির মালিকানার সমাধান করে দেয় কিন্তু সে-মামলার খরচ হিসেবে কাশীপ্রসাদ ঘোষকে দিতে হয় ২৫ হাজার রুপি। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর রচনায় সেই সময়কার ব্রিটিশ আদালতের সমালোচনা করেন। তিনি জানান, মামলার জন্য স্থানীয় নাগরিকদের নিকট থেকে ব্রিটিশরা যে-খরচ আদায় করে তা অত্যন্ত অন্যায্য এবং প্রায় অত্যাচারের সামিল।

কলকাতা হিন্দু কলেজের শিক্ষক মিস রবার্টস্ হ্যালিফ্যাক্সের অনুপ্রেরণার কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কাশীপ্রসাদের বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে কাশীপ্রসাদের সাহিত্যরুচি এবং ইংরেজি ভাষায় লেখার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী মিসেস হ্যালিফ্যাক্স কাশীপ্রসাদকে জানান যে ইংল্যন্ডে গিয়ে তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে লিখবেন। এটিও খুব কৌতূহলোদ্দীপক একটি ঘটনা ছিল নিঃসন্দেহে। কোম্পানি আমলে উপনিবেশিত ভারতবর্ষের একজন বাঙালির জীবন ও সাহিত্যকর্মকে ইংরেজিভাষী একজন শিক্ষাবিদের এতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করাটা অবশ্যই সহজ ব্যাপার ছিল না। কাশীপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের প্রভা এবং তাঁর রচনার শক্তি ও শৈলী দ্বারাই মুগ্ধ হয়েছিলেন বিদেশিনী, একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। ১৮৩৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কাশীপ্রসাদ ঘোষ জানান, তিনি বাংলায় অনেকগুলো গান রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজিতেই। তিনি বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে লিখতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ভাব-ভাবনা-আবেগ এসব বাংলা না ইংরেজি কোন্ ভাষায় লেখা কবিতায় যথাযথভাবে ফুটে ওঠে সে-বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও কাশীপ্রসাদ জানান, বাংলার চাইতেও ইংরেজি ভাষায় পঠনপাঠন এবং রচনায় অধিক সময় ব্যয় করে গেছেন তিনি। প্রসঙ্গত টি. ও. ডি. ডান-এর মন্তব্য (৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায়) থেকেও কাশীপ্রসাদ ঘোষের আত্মবিশ্বাসী মূল্যায়নের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। ডান তাঁর

পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দ্য বেঙ্গল এ্যানুয়েল'-এর যে-সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং যেখানে নির্বাচিত গদ্য-পদ্যেরই স্থান হতো, সেখানে কাশীপ্রসাদের একাধিক কবিতা প্রকাশ পায়। এ থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি এবং কবিতার যোগ্যতার প্রমাণ মেলে বলে মন্তব্য করেন ডান।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত লতিকা বসু রচিত *ইন্ডিয়ান রাইটার্স অব ইংলিশ ভার্স* গ্রন্থে 'গভর্নমেন্ট গেজেট' এবং জেমস লং-এর 'লিটারেরি গেজেট' দুটোরই উদ্ধৃতিসূত্র রয়েছে। সেখানে কাশীপ্রসাদ ঘোষের বেড়ে ওঠা তাঁর আশৈশব কাব্যাবেগ এবং তাঁর কাব্যবিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শৈশবে মুগ্ধতা নিয়ে কান পেতে শুনতেন 'বৃষ্টিপাতের সংগীত'। বনের পাতার 'মর্মর' কেড়ে নিতো তাঁর মনোযোগ। প্রকৃতির সেইসব মুগ্ধতার আশ্রয়ে কবিতা লিখলেন তিনি এবং হিন্দু কলেজের 'হেড-লেকচারার' আর. হ্যালিফ্যাক্সকে সেটা দেখালেন। বাঙালি কবির কাব্য-প্রতিভার বিদেশি ভাষায় প্রতিফলন পাঠ করে মুগ্ধ হলেন হ্যালিফ্যাক্স সাহেব। কিন্তু তিনি দেখলেন কাশীপ্রসাদের কবিতা কাব্যগুণে গুণান্বিত ঠিকই কিন্তু কবিতার পংক্তিবিন্যাস স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ইংরেজি কাব্যের ছন্দরীতি বা বিন্যাস সেখানে অনুসৃত হয় নি। হ্যালিফ্যাক্স তাঁকে পরামর্শ দিলেন কেরী রচিত 'প্রোসোডি' গ্রন্থটি পাঠ করবার জন্য। কিন্তু বইয়ের দোকানে গিয়ে কাশীপ্রসাদ সে-বই পেলেন না। তখন তিনি নিয়ে এলেন মারে রচিত 'প্রোসোডি' এবং লর্ড কেইনের লেখা *ইলেমেন্টস্ অব ক্রিটিসিজম*। এই দুটি গ্রন্থ কাশীপ্রসাদের জন্য ছিল বিশেষ সহায়ক। কবিতার কলাপ্রকৌশল তিনি শিখলেন বইগুলো থেকে। এছাড়া শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতার পঠনপাঠন তিনি সমান্তরালে চালিয়ে যান। এতে করে তাঁর শ্রুতি ইংরেজি কবিতার ছন্দে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কাশীপ্রসাদ পূর্বে লেখা কবিতাটি আবার লিখলেন। এবারে ভাববস্তু ঠিক রেখে সেটিকে ছন্দের ছাঁচে ফেললেন। তারপর সেটি নিয়ে গেলেন হ্যালিফ্যাক্স সাহেবের কাছে। তিনি অনুমোদন করলে কাশীপ্রসাদ প্রকাশ করেন সে-কবিতা। ১৮৩০ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর কাব্যগ্রন্থ *শায়ের এ্যান্ড আদার পোয়েম্স* প্রকাশ পেলেও কাশীপ্রসাদ নিজের সে কাব্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কে বেশ খোলাখুলিভাবেই বলেন যে আসলে অতটা দ্রুত নিজের কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ না করলেও পারতেন। কেননা, সেসব কবিতায় বেশকিছু পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাকরণগত অযথার্থতা রয়ে যায়। ১৮৩৪ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত 'লিটারেরি গেজেট'-এ কাশীপ্রসাদ জানান যে পুনঃমুদ্রণের জন্য প্রথম গ্রন্থের কবিতাগুলো তিনি পরিমার্জনায় নিয়োজিত আছেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের সেই কাব্যগ্রন্থের পুনঃমুদ্রণের কোনো সংবাদ বা তথ্য পরবর্তীতে আর পাওয়া যায় না। এ থেকে সমালোচকগণের অনুমান, সে-কাব্যগ্রন্থ হয়তো আর পুনঃমুদ্রিত হয় নি। কিন্তু তা না হলেও প্রথম বইয়ের কবিতার সূত্রেই কাশীপ্রসাদের

কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণশক্তি টের পেয়েছিলেন সমকালীন সমালোচকমহল। বাঙালি নয় বরং ইংরেজ সমালোচকের মূল্যায়নেরই দ্বারস্থ হতে পারি আমরা। ডি. এল. রিচার্ডসন (ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন) নামেই যিনি সমধিক পরিচিত তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষের প্রথম কাব্য সম্পর্কে 'লিটারেরি গেজেট'-এ যে-মূল্যায়ন করেন (১৮৩৪ সালের ১ নভেম্বর) সেটি প্রণিধানযোগ্য : 'যেসব সংকীর্ণমনা লোক আক্রমণাত্মক-বিশ্রী অভ্যাসের বশে ভারতবাসীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন আমি তাদেরকে এই ছোট্ট কবিতাটি পড়তে বলি এবং তাদের জিজ্ঞেস করি– তারা কী এর চাইতে ভালো কবিতা বিদেশি ভাষায় নয়, তাদের মাতৃভাষাতেই লিখতে পারবেন।' সমালোচক লতিকা বসু তাঁর গ্রন্থটিতে কাশীপ্রসাদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর কাব্যের সমালোচনাও তিনি করেন যেটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিতে রিচার্ডসন হয়তো কাশীপ্রসাদের কবিতা প্রচেষ্টাকে খানিকটা সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। হতে পারে তিনি একজন ইংরেজের লেখা কবিতার পরিবর্তে একজন ইঙ্গভারতীয় কবির কাব্যপ্রচেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব দেন। কাব্যগ্রন্থটি মূলত একটি দীর্ঘকবিতার বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত শাখার সমাহার। মূল কবিতাটির শিরোনাম 'শায়ের'। তবে বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত গীতিকবিতা এতে রয়েছে।

'শায়ের' নামক কবিতাটি বর্ণিত হয় একজন চারণ কবির জবানীতে যাঁর হৃদয়েশ্বরীর মৃত্যু ঘটেছে এবং যাঁর হৃদয়ে সেই প্রেমিকার জন্যে যন্ত্রণা আর হাহাকার জমাটবদ্ধ। অনেক সমালোচক কবিতাটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিতায় প্রতিফলিত প্রকৃতিচেতনা ও নীতিবাদের প্রভাবসম্পাত লক্ষ করেন। প্রচলিত বিশেষণাতিশায়ন উপমা-উৎপ্রেক্ষা সবই সেই সময়কার কাব্যধারার ঐতিহ্যলালিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্যের খানিকটা উদ্ধৃতি এবং সেটির মৎকৃত বঙ্গানুবাদ লক্ষ করা যেতে পারে–

You may have seen the tender stem
That bears the rose's blooming gem—
How when the flow'ret falls away,
Snatched by a storm it doth decay! ...
You may have seen the lily flower
That liveth in the watery bower—
How smilingly and purely white
It blooms when shines the moon at night.

হয়তো দেখেছো তুমি গাছের নরম শাখা
যে-শাখা বহন করে ফুটন্ত গোলাপ-রত্ন–
কীভাবে সে-ফুল ঝরে পড়ে যায়,
ক্ষয়ে যায় তীব্র এক ঝড়ের প্রকোপে! ...
হয়তো দেখেছো তুমি শাপলার ফুল
বসতি যার জলময় সরোবরে–

কী যে স্মিত ও নিখুঁত সফেদ দেখায়
যখন ঝকঝকে ফোটে রাত্রির চন্দ্র-কিরণে।

'দ্য হিন্দু ফেস্টিভ্যালস্' কবিপ্রসঙ্গতাটিতে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ করে দেশীয় উৎসবাদির প্রতি কবির মুগ্ধতা এবং জনজীবনের সঙ্গে উৎসব-পার্বণ প্রভৃতির সম্পৃক্ততা বর্ণিত। ভারতীয় তথা সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রসঙ্গ এবং তাঁদের নামে যেসব পূজো-ব্রত রয়েছে সেগুলোর কথা এসেছে কবিতায়। অষ্টাদশ শতকের কবিদের কবিতায় যেমন গ্রিসদেশীয় দেবদেবীর প্রাধান্য তেমনি কাশীপ্রসাদের কবিতায় গ্রিসের স্থানে এসেছে ভারতীয় সভ্যতার দেবদেবী-মাহাত্ম্য। তবে তাঁর নৈসর্গিক কবিতাগুলোকে সমালোচকেরা ততটা উচ্চাঙ্গের বলে মনে করেন নি। বলতে পারি প্রকৃতিচিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি ইঙ্গভারতীয় কবিতার ঈশ্বর গুপ্ত। সূর্যাস্ত, মেঘমালা, মৃদুমন্দ সমীরণ সবই এসেছে কিন্তু এসেছে বস্তুগতভাবে, রোমান্টিকতার আবেশমাখানো নয় সেসব। ফুলের ক্ষেত্রে যদি বলি তাঁর কবিতায় গোলাপ কিংবা জেসমিনের প্রাধান্য। মাঝে-মাঝে এসেছে পদ্মফুলের প্রসঙ্গ। এখানে একটা বিষয় তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। অনেকেই বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিপুলতাপূর্ণ ও জ্ঞানগভীর প্রতিষ্ঠানের মতো কোনো জায়গায় লেখাপড়া না করেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কাশীপ্রসাদ যে-কাব্যচর্চার ও সৃষ্টির দৃষ্টান্ত রেখে যান তা দুইশ বছর আগেকার বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যময় একটি ঘটনা। তাছাড়া কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্যগ্রন্থটি আকারেও ছিল উল্লেখযোগ্য– সর্বমোট দুইশ' পৃষ্ঠার। অর্থাৎ কাব্যাভিষেকেই তিনি প্রসন্ন ভবিতব্যের ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন। বইটির মুদ্রণসৌকর্যের প্রশংসা করেছিলেন তাঁর কবিতার মূল্যায়নকারীরা। এটি মুদ্রিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়া গেজেট'-প্রেস থেকে। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক-কে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্য প্রকাশকালে তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর। পরবর্তীতে (১৮৩৪-১৮৩৫) বেন্টিংক ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। গ্রন্থস্থ অনেকগুলো কবিতা আলাদা-আলাদাভাবে সমকালীন বহু বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে হোরেস হ্যাম্যান উইলসন এবং হেনরি মেরিডিথ পার্কারের নাম বলা যায়। এসব থেকে কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের পরিমণ্ডলটিকেও অনুধাবন করা যায়। হোরেস উইলসনের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং মেরিডিথ পার্কারের মতো নামকরা কবির সান্নিধ্য ও প্রীতিধন্য হতে পেরেছিলেন খিদিরপুরের হেদুয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী একজন বাঙালি। বস্তুত কাশীপ্রসাদ ঘোষের এ অর্জন ও অবস্থান সমগ্র বাঙালির জন্যই গর্বের বিষয়। তোষামোদ করে বা আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিত্বশূন্য হয়ে তিনি সেটি অর্জন করেন নি, করেছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও মননের শক্তি দিয়ে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের অনেক কবিতাই সমালোচকদের সুদৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয় নি। সেটির কারণও চিহ্নিত করা যায়। কাব্যচর্চার প্রথম দিকে তিনি নিসর্গ প্রেম দৈনন্দিন

াবনের ঘটনানির্ভর কাব্য-উপাদানের দিকে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁর ধ্যে ভিন্নধর্মী চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। বলা যায় তাঁর উপলব্ধির জগতটি প্রসারিত য় এবং তাঁর মননাঞ্চলও হয় গভীরতাশ্রয়ী। 'দ্য লাভার্‌স লাইফ' কিংবা 'সং অব দ্য বাটম্যন টু গঙ্গা'র কাশীপ্রসাদকে পরবর্তীতে ভিন্নরূপে পাওয়া যায় 'ইন্ডিয়া' কিংবা ল্যামেন্ট অব ঔউধ্ অন দ্য এ্যানেক্সেশন, ১৮৫৬' প্রভৃতি কবিতায়। প্রথমটি ১৮৬২ াবং দ্বিতীয়টি রচিত হয় ১৮৭২ সালে। ১৮৭৩ সালে মৃত্যুর মাত্র বছরখানেক আগেও য-কবিতা কাশীপ্রসাদ রচনা করেন তাতে একজন সচেতন স্বাদেশিক ভারতবাসীর পস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'ইন্ডিয়া' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটিতে দেবদেবীর প্রাধান্য য়েছে ঠিকই কিন্তু এতে জয়গান গাওয়া হয়েছে বীরত্বের জন্যে স্মরণীয় ঐতিহাসিক-পৌরাণিক চরিত্রদের। তাছাড়া কবিতাটিতে প্রচ্ছন্নভাবে এসেছে এক ধরনের মুক্তির ত্যাশা। অবরুদ্ধ উপনিবেশিত স্বদেশের অবস্থা কবির সংবেদনা দিয়ে ধরবার চেষ্টা রেছেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কবির তেষট্টি বছর বয়সের রচনা তাঁর 'ল্যামেন্ট অব ঔউধ্ ন দ্য এ্যানেক্সেশন, ১৮৫৬' শিরোনামের কবিতাটি। সমালোচকগণ তাঁর এ-বিতাটির ওপর ততটা দৃষ্টি নিবদ্ধ না করলেও কবিতাটি নানা কারণেই স্মরণযোগ্য। ।-কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে যুগপৎ রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বাদেশিকতা। পনিবেশিক কর্তৃত্বের ভাষার আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও কাশীপ্রসাদের এমনতর ংবেদনশীলতা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই গুরুত্ববাহী। সঙ্গত বলা যায় ১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জেনারেল লর্ড ালহৌসি'র আদেশের বলে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা য় অযোগ্য শাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে এবং অঞ্চলটিকে নিয়ে আসা হয় ইস্ট ন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ অধীনতায়। এ ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে বলা যায় এক রনের আগ্রাসন। বস্তুত অযোধ্যায় বিরাজমান থাকা নবাবদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকে কাম্পানি সহ্য করতে না পেরে ছককষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটায় ইস্ট ইন্ডিয়া কাম্পানি। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানি এর ক্ষমতা প্রদর্শন করলেও ১৮৫৬ ালে এসে তারা 'চ্যাসাস বেল্লি' বা 'যুদ্ধের কারণ' সৃষ্টি করে নবাবকে সরিয়ে দিয়ে িজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। যেটা লক্ষ করবার বিষয় ১৮৫৬ সালে যখন এ টনাটি ঘটে তখন কাশীপ্রসাদ ঘোষের বয়স সাতচল্লিশ বছর। তখন বা তার কিছুকাল ারেও তিনি কবিতাটি রচনা করেন নি। ঘটনাটির ষোলো বছর পরে ষাটোর্ধ্ব াশীপ্রসাদ রচনা করেন কবিতাটি। অর্থাৎ জীবনাভিজ্ঞতার পরিপক্ব একটি স্তরে পৌঁছবার পরে কবিতাটির জন্ম। ঘটনার এত বছর পরেও যখন কবিতাটি লেখা হলো খন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবি তাঁর মন থেকে ঘটনাটিকে কখনই মুছে ফেলেন া বরং বিষয়টিকে তিনি জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেছেন। 'ল্যামেন্ট অব ঔউধ্ অন দ্য এ্যানেক্সেশন, ১৮৫৬' কবিতাটির শিরোনামটির দিকেই যদি দৃষ্টি দেই

তাহলে দেখবো এতে প্রতিফলিত হয়েছে বিলাপ বা শোকের কথা। কিন্তু এ বিলাপ ব্রিটিশদের পক্ষে নয়, বরং বিপরীত, বিলাপ জনগণের পক্ষে এবং উপনিবেশের বিপক্ষে। কাশীপ্রসাদের এ-কবিতায় রয়েছে জনগণের জীবনের ঐতিহ্যের কথা এবং ব্রিটিশদের সমালোচনা। বলা যেতে পারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায়ও যেখানে এতটা স্পষ্টভাবে ব্রিটিশদের সমালোচনা লক্ষ করা যায় না সেখানে কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতা নিঃসন্দেহে অগ্রবর্তী ভাবনার ধারক। কবিতাটি যেহেতু বাংলা ভাষায় রচিত নয়, তা বাঙালি পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সহজেই। কিন্তু বাঙালি কবির এ-কবিতা স্বাদেশিকতার বোধে এবং উপনিবেশবিরোধিতার উপলব্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ।

ইঙ্গভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিপ্রতিভার গুরুত্ব কতখানি সেটি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে পারা যায় ইংরেজ কবি লেটিসিয়া এলিজাবেথ ল্যান্ডন-এর (১৮০২-১৮৩৮) সূত্রের সহায়তায়। ক্ষণজন্মা এ কবি ও ঔপন্যাসিক অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *দ্য ফেট অব এ্যাডেলেইড*, *দ্য শিভালরি এ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স*, *দ্য ভেনেসিয়ান ব্রেসলেট* এবং উপন্যাস *এথেল চার্চিল*। নানা কারণে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন কবি এডগার এ্যালেন পো (১৮০৯-১৮৪৯) ল্যান্ডনের প্রতিভার মুগ্ধ স্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন। বিখ্যাত জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) এবং ফরাসি প্রসপার মেরিমে (১৮০৩-১৮৭০) ও শাতুব্রিয়ঁ-র সঙ্গে ছিল তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ। মাত্র ১৮ বছর বয়সে লেখা তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত পত্রিকায়। বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক ফিশারস্ এ্যান্ড সন্স-এর প্রকাশনা *ফিশারস্ ড্রয়িং রুম স্ক্র্যাপ বুক্‌স* ১৮৩২ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৮৩৮-এর সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৯ সালের সংখ্যাটি প্রস্তুত করে রেখে যান তিনি যেটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়) এটিকে বলা হতো 'এ্যানুয়েল গিফ্‌ট্ বুক'। মূলত কবিতাশ্রিত এ-প্রকাশনাটিতে বিচিত্র বিষয়ের কবিতা ছাপা হতো। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষই শুধু নয় আফ্রিকা মিশর লেবাননসহ পৃথিবীর নানা দেশ-জাতি-সংস্কৃতি-প্রকৃতি ইত্যাকার নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ প্রকাশনাটি সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গকে বহির্বিশ্বে পরিচিত ও উপস্থাপনের ব্যাপারে প্রকাশনাটির বিশেষ ভূমিকা ছিল লক্ষযোগ্য। ল্যান্ডন সম্পাদিত সময়টি ছিল প্রকাশনাটির স্বর্ণযুগ। ১৮৩৫ সালে কাশীপ্রসাদ ঘোষের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয় ল্যান্ডন সম্পাদিত ইংল্যান্ডের এ-পুস্তকে। এতে তাঁর নামের বানান ছিল Kasiprasad Ghose। কবিতাদুটির শিরোনাম যথাক্রমে 'Boatmen's Song to Ganga' এবং 'Storm and Rain'। ২৪ লাইনের প্রথম কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে গঙ্গানদীবিধৌত বাংলার জনজীবনের ও প্রকৃতির কবিত্বপূর্ণ চিত্র। কবিতাটিতে চিত্রিত কবি কাশীপ্রসাদের নিসর্গ, বসতি এবং সৌন্দর্যচেতনার বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় কবির আবেগ, বাঙালির জীবন-জগতের প্রতি মুগ্ধতা ও

কাব্যচেতনার চমৎকার প্রতিফলন আজ থেকে প্রায় দুইশ বছর আগে রচিত সাহিত্যের শৈল্পিক সাফল্যেরই প্রমাণ। কবিতাটির প্রথম দুই এবং অভ্যন্তরীণ আরও চারটি পংক্তির উদ্ধৃতি থেকে কবি কাশীপ্রসাদের কাব্যপ্রতিভার নমুনা লক্ষ করা যেতে পারে–

> Gold river! Gold river! How gallantly now
> Our bark on thy bright breast is lifting her prow. …
> Gold river! Gold river! How bright is she beam
> Which brightnessand crimsons thy soft-flowing stream;
> Whose waters beneath make a musical clashing;
> Whose ripples like dimples in childhood are flashing.

৫০ পংক্তির দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম 'Storm and Rain'। এ-কবিতার কয়েকটি পংক্তির উদ্ধৃতি–

> The mighty demons of the storm have met
> In battle fierce. Relentless anger fires
> Their bosoms, proud of desolating power.
> Their swords in rapid wavings flash; and oft
> In lightning gleams illume the darkened earth.

বাংলার প্রকৃতিতে বৃষ্টি ও বজ্রের ক্রিয়তা, প্রভাব ও ভূমিকার চমৎকার কাব্যিক প্রকাশ কবিতাটিকে প্রথমত শিল্পসফল করেছে এবং দ্বিতীয়ত এটি হয়ে উঠেছে বাঙালির জনজীবনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সৃজনশীল সৃষ্টিকর্ম। বৃষ্টি-বজ্রের দৃশ্য-চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ ঘটান সেগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিচয়বাহী। বৃষ্টির তীব্র-গতিময় ফলাকে তিনি তুলনা করেন প্রখর তরবারির সঙ্গে। বহুকাল পরেকার আরেক বাঙালি কবির বৃষ্টিবিষয়ক কবিতার কথা বলা যায় যেখানে তিনি ঢাকা শহরে বৃষ্টির বর্ণনায় বৃষ্টির ফলাকে বর্শার ফলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাছাড়া বজ্রের 'উন্মাদ চিৎকার', 'ক্রোধ' এসব উপমা লক্ষ করবার মতো। বৃষ্টিকে কবি তুলনা করেন মুক্তো হিরে'র সঙ্গে, এমনকি বৃষ্টিপাতের ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া সোঁদা ঘ্রাণও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় না। কবিতার এক জায়গায় কবির 'Cloud upon cloud' 'piled along' থেকে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষণস্নাত দিবসে 'মেঘের পরে মেঘ' জমবার দৃশ্য-চিত্র। কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং লেটিসিয়া এলিজাবেথ ল্যান্ডনের যোগাযোগ থেকে বাঙালি কবির মেধা-প্রতিভার শক্তি ও স্বীকৃতির দিকটিই প্রমাণিত হয়। কাশীপ্রসাদ কখনই ইংল্যান্ডে যান নি কিন্তু তাঁর কবিতা প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁর নিজের এবং ভারতবর্ষের। একজন ইংরেজ কবির সম্পাদনায় তাঁর কবিতা নির্বাচন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনুমান করা যায়, ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকায় ছাপা কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতাই ল্যান্ডন তাঁর পুস্তকে প্রকাশ করবার জন্যে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে আহূত হয়ে স্বয়ং কবিই বাংলা থেকে তাঁর কবিতাগুলো ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন।

যাহোক, যে-ইংরেজ কবির মেধা-প্রতিভার স্বীকৃতি দেন আরেক বিশ্বখ্যাত এডগার এ্যালেন পো সেই ব্যক্তিত্বের নির্বাচনে বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বাঙালির সাহিত্য-ইতিহাসে সাড়াজাগানো উপলক্ষ্য।

বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর বাঙালির পরিচয়কে নিয়ে গেছেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে। এমনকি বিদেশিরাও যখন ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন ও পর্যালোচনা করেন তখনও অনিবার্যভাবে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে গৌরবের অবস্থানে স্থিত থাকেন কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ। ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর সমগ্র রচনাবলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে আমরা হয়তো এ-কবির গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

গ্রন্থপঞ্জি

E. F. Oaten, A Sketch of Anglo-Indian Literature, London : 1908

T. O. D. Dunn, Bengali Writers of English Verse, A Record and An Appreciation, Calcutta, 1918

Latika Basu, Indian Writers of English Verse, University of Calcutta, 1933

C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: 1906

Reverend James Long, Handbook of Bengal Missions, in Connection with the Church of England-together with an Account of General Educational Effort in North India, London, 1848

শার্লক হোমস সিরিজে উপনিবেশ প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ
শার্লক হোমস সিরিজ শেষ-উনিশ শতকীয় তথা ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের সমাজ ও সংস্কৃতির খুব আকর টেক্সট হিসাবে দুনিয়াজুড়ে বহুল পঠিত। ইংল্যান্ডের সমসাময়িক বাস্তবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উপনিবেশ। মুখ্যত লন্ডন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সমাজ-বাস্তবতা উপস্থাপিত হলেও এ কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত উপনিবেশগুলোর বহু উপাদান এ সিরিজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে হোমস সিরিজ পঠিত হয়েছে প্রধানত উপনিবেশ-প্রসঙ্গকে কেন্দ্রে রেখে। টেক্সট-পাঠের কায়দা-কানুন ব্যবহার করে উন্মোচন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট উপকরণগত দিক এবং দৃষ্টিভঙ্গি। উপনিবেশ-অধ্যয়ন শাস্ত্রের প্রধান তিন উপাদান– উপনিবেশক, উপনিবেশিত ও উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া– বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, উপকরণের দিক থেকে প্রকাশ্যে এবং ভাবাদর্শের দিক থেকে গোপনে ওই তিন দিক সিরিজটির অন্যতম প্রধান গড়ন-উপাদান হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। উপনিবেশিতের উপস্থাপনার রাজনীতি আর উপনিবেশকের ভাবাদর্শিক অবস্থান নির্দেশ করে দেখানো হয়েছে, যদিও মুখ্যত ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই এসব টেক্সটের ভিত্তি ও লক্ষ্য, কিন্তু ক্ষমতা-সম্পর্কের অসম অবস্থান থেকেই– জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে– উপনিবেশের এক কার্যকর ও বহুব্যাপ্ত আবহ সূত্রবদ্ধ হয়েছে সিরিজটিতে, যা অন্তত কেন্দ্রের দিক থেকে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বুঝতে গভীরভাবে সাহায্য করে।

১ সূচনাপত্র

জীবনীকাররা ব্যতিক্রমহীনভাবে জানিয়েছেন, গোয়েন্দা কাহিনির লেখক হিসাবে– এমনকি শার্লক হোমসের মতো প্রায় শুরু থেকেই কিংবদন্তি হয়ে ওঠা চরিত্রের স্রষ্টা হিসাবেও– স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) পরিচিত হতে চাননি। কিন্তু লেখকজীবনের সফলতম অংশে এবং মৃত্যুর পরের শতকেও তিনি পরিচিত হয়েছেন মূলত এ গোয়েন্দা চরিত্রের লেখক হিসাবে। হোমসকে কেন্দ্রে রেখে তিনি লিখেছেন চারটি উপন্যাসধর্মী তুলনামূলক লম্বা কাহিনি ও ছাপ্পান্নটি ছোটগল্পধর্মী ছোট কাহিনি। জীবদ্দশায় এ লেখাগুলো জনপ্রিয়তার নতুন নতুন মাত্রা ও নজির স্থাপন করেছিল; আর পরবর্তী সময়ে চিত্রায়ণ, আলোচনা, গবেষণা, অনুকরণমূলক রচনা আর বাস্তব ব্যবহারে দুনিয়াজুড়ে যে দীর্ঘমেয়াদি 'হোমসীয় কাল্ট' গড়ে উঠেছে, তার তুলনা বিরল।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শার্লক হোমসের কাহিনিগুলো লেখা হয়েছে ১৮৮৭ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে। এর অন্তত প্রথম তিন দশক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগের অন্তর্গত। ১৯০০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ ভূমি ও সমপরিমাণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করত (উদ্ধৃত, Favor 1995 : 52)। এ প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতি স্বভাবতই ইংল্যান্ডের মানুষ, সমাজ ও সামগ্রিক বাস্তবতার অন্যতম প্রধান নিয়ামক ছিল। হোমস সিরিজের বহু কাহিনিতে কলোনির নিয়ন্ত্রক ইংল্যান্ড আর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের নানামুখী অবস্থার পরিচয়ও তাতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ বাস্তবতাসূত্রে উপনিবেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোর পর্যালোচনা করা হবে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান পক্ষ তিনটি– উপনিবেশক, উপনিবেশিত এবং উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে তৃতীয়টি প্রধানত উপনিবেশিত অঞ্চলে কার্যকর হলেও উপনিবেশক কেন্দ্রেও তার নানামুখী প্রতিফলন ঘটে। শার্লক হোমস সিরিজটি ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে বিশেষত লন্ডন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত। স্বভাবতই এতে উপনিবেশক শক্তিই সবচেয়ে দৃশ্যমান পক্ষ। অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদী দেশেরও সব মানুষ নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় শামিল হয় না, বা এমনকি এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতনও থাকে না। তবে বিপুল অধিকাংশ নাগরিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সুফল ভোগ করে থাকে। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী জোশ এবং দেশপ্রেমমূলক সচেতনতার মধ্য দিয়েও জনগোষ্ঠীর এ অংশ সচেতন-অচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অংশীদার হয়। তাদের সামষ্টিক ও সামগ্রিক অস্তিত্বের অন্যতম নির্ণায়ক-নিয়ামক হয়ে ওঠে উপনিবেশিত 'অপর', যাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং অপরায়ণজনিত অপরিচয়ের বোধ উপনিবেশক জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। হোমস সিরিজের অনেক রচনায় এ বাস্তবতার নিপুণ ব্যবহারই কেবল হয়নি, খোদ গোয়েন্দা চরিত্রটির পরিগঠনেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য টেক্সটের বিষয়গত দিক বিবেচনায় রেখে মুখ্যত উপনিবেশক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপনিবেশ ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণীত হবে।

উপনিবেশ-অধ্যয়ন সময়ের দিক থেকে অন্তত দুইভাগে বিভক্ত। উপনিবেশ-আমলে, বিশেষত এর স্বর্ণযুগে, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনকে দেখত, প্রত্যক্ষ উপনিবেশ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাতে স্বভাবতই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শার্লক হোমসের বর্তমান পাঠে এর সমকালীনতা যেমন গুরুত্ব পাবে, ঠিক তেমনি উপনিবেশ-উত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এ টেক্সট যেসব নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পঠিত হয়েছে বা হতে পারে, তাও খতিয়ে দেখা হবে। তবে উপনিবেশ-পাঠ শাস্ত্র শুধু দৃষ্টিভঙ্গিগত বিবেচনাতেই নিজেকে সীমিত রাখেনি; চিহ্নতত্ত্ব, নব্য ইতিহাসতত্ত্ব,

সংস্কৃতি-অধ্যয়ন তত্ত্ব ইত্যাদির প্ররোচনায় উপনিবেশক, উপনিবেশিত এবং উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বহু সামষ্টিক মাত্রাও উন্মোচন করেছে। হোমস সিরিজ মুখ্যত 'সাহিত্যিক' এবং সে অর্থে 'আলঙ্কারিক' টেক্সট– এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উক্ত মাত্রাগুলোর মধ্যে দুটিকে আমরা বর্তমান পাঠে পদ্ধতিগত বিবেচনায় অধিকতর গুরুত্ব দেব। এর একটি রিপ্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনার দিক, অন্যটি ইডিয়লজি বা ভাবাদর্শিক দিক। উপনিবেশ-সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর পরিচয়প্রদানপূর্বক উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি, আর উপস্থাপিত উপাদানগুলোর ভাবাদর্শিক ভিত্তি পরীক্ষা করা প্রবন্ধটির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

২ শার্লক হোমস সিরিজ অবলম্বনে উপনিবেশ-পাঠের যুক্তি

শার্লক হোমস কাহিনিকে সাধারণভাবে গোয়েন্দা কাহিনির এক ধ্রুপদি টেক্সট হিসাবে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ফেভর (১৯৯৫) দেখিয়েছেন, ভিক্টোরীয় ও এডওয়ার্ডীয় জমানার ব্রিটিশ নাগরিকদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভঙ্গির উত্তম প্রকাশ হিসাবে একে পড়া চলে। হোমস নিজেই তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি; আর এর স্রষ্টা কোনান ডয়েলও তাই।

হোমসের গল্প শুরু হওয়ার আগেই আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে পরিচিত হই। ওয়াটসন আমাদের কাছে হাজির হয় আফগান প্রতিপক্ষের বিপরীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নিষ্ঠাবান খাদেম হিসাবে। আফগান ফ্রন্টে ডিউটিরত অবস্থায় আহত হয়ে তাকে চলে আসতে হয় পেশোয়ার হাসপাতালে। পরে বিশ্রামের জন্য লন্ডন। সেদিক থেকে হোমসের সাথে তার জুড়ি খুব স্বাভাবিক কার্যকারণেই জমে উঠেছিল। হোমস নিজেই জাতীয়তাবাদী ইংল্যান্ডের সেবক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুউচ্চ মহিমা ঘোষণার অন্যতম সিপাহসালার। এ খাঁটি 'ভিক্টোরীয়' নায়কের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের ব্যক্তিজীবন ও ভাবাদর্শ তাঁর সৃষ্ট কাহিনি ও চরিত্র থেকে মোটেই আলাদা নয়।

ভিক্টোরীয় জমানায় এবং পরবর্তী এডওয়ার্ডীয় যুগে কোনান ডয়েল ছিলেন ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের একজন উৎসাহী প্রচারক। ডাক্তার, রাজনীতিক এবং একজন জনপ্রিয় লেখক হিসাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের নির্মাণ ও প্রচারকার্যে সক্রিয় ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনাদলের সাথে। পরে এ যুদ্ধের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে লিখেছিলেন *দ্য গ্রেট বোয়ের ওয়ার* (১৯০০) নামের বই। ব্যাপকভাবে অনূদিত ও প্রচারিত এ বইয়ের জন্যই মুখ্যত তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বস্তুত, ইংল্যান্ডের সমকালীন জাতীয়তাবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গিপনাই তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁকে যথার্থই 'one of the great Victorian apologists of empire' বলা হয়েছে, যাঁর 'fiction was shaped by imperial values' (Thompson 1993: 68; Reitz 2019: 130)। লেখকের ব্যক্তিগত ভাবাদর্শের এ পরিচয় থেকে বলা যায়, তাঁর লেখা ও সৃষ্ট-চরিত্রে সমধর্মী ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। তবে আধুনিক ভাষ্যকারেরা মোটামুটি একমত, হোমস সিরিজের

অন্তস্থ সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শিক নির্মাণ এরচেয়ে অনেক গভীর, কার্যকর ও দূরসঞ্চারী (Favor 1995: 8)।

হোমসের জনপ্রিয়তার অসংখ্য কারণ ছিল। শুধু আকর্ষণীয় কাহিনি আর রচনাশৈলীর জন্যই এ সিরিজ বিপুল জনপ্রিয়তা পেতে পারত। উনিশ শতকের নতুন নাগরিক-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে জনপ্রিয় বই আর চরিত্রের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও লোক-সংশ্লিষ্টতার যে-ধরন হোমস সিরিজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তার কোনো দোসরা নজির সম্ভবত নাই। গোয়েন্দা গল্প লিখতে অনিচ্ছুক কোনান ডয়েল সম্পাদকের কাছে বারবার গল্পপিছু অনেক বেশি টাকা দাবি করেছিলেন; আর সম্পাদক প্রত্যেকবারই তাঁর সেই প্রায়-অসম্ভব দাবি পূরণ করে লিখিয়ে নিয়েছেন নতুন নতুন গল্প। শুরু থেকেই পাঠক, সম্পাদক, বিজ্ঞাপনদাতাসহ সকল পক্ষ হোমসকে দেখেছে এক বাস্তব চরিত্র হিসাবে। ডয়েলের জীবনীকারেরা জানিয়েছেন, অন্তত ১৯৫০ সাল অবধি ব্রিটিশ ডাক-বিভাগ হোমসের ঠিকানায় চিঠি পেত। হোমসের মৃত্যুর কাহিনি প্রচারিত হওয়ার পরে প্রভাবশালী *দ্য স্ট্র্যান্ড* পত্রিকার গ্রাহক রাতারাতি অন্তত ২০,০০০ কমে গিয়েছিল।

২০১৪ সালে লন্ডন মিউজিয়াম খুব বড় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যার শিরোনাম ছিল : *Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die* (Allan and Pittard, 2019: xix)। সামষ্টিক বাস্তবতার কোনসব গভীর মাত্রার সাথে একাকার হয়ে গেলে কোনো কাহিনি বিপুল পাঠকের কাছে বাস্তবের অধিক বাস্তব হয়ে ওঠে, তা হুবহু বলা হয়ত সম্ভব নয়; তবে কিছু জোরালো অনুমান করা যেতে পারে। বলা যায়, জনসমাজের সামষ্টিক ভাবাদর্শ ও মনস্তত্ত্ব নিপুণভাবে অনূদিত হয়েছিল বলেই হোমস সিরিজ এমন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেক্ষেত্রে জনসমাজে বিদ্যমান প্রভাবশালী ডিসকোর্সগুলো জনপ্রিয় সাহিত্যে তুলনামূলক স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। বিপরীতক্রমে এও সত্য, পত্রপত্রিকা এবং বিশেষত জনপ্রিয় সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই আদতে 'প্রভাবশালী ডিসকোর্সগুলো' প্রভাবশালী– বা বলা যায়, অধিকতর প্রভাবশালী– হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ যে সচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদের পোষকতা করত, তা নয়। তবে সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শ তাদের ঘরে এসে পৌঁছাত লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে; গল্প-উপন্যাসে বাহিত হয়ে। ১৮৮৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলির কালে, ব্রিটিশ সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ – এ দুয়ের মধ্যে আদতে ফারাক করা সম্ভব ছিল না (Favor 1995: 51)। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল হোমস সিরিজ লেখা শুরু করেছিলেন ওই বছর। একই সালে *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের শেষাংশে যখন জাতীয় আর আন্তর্জাতিক একাকার হয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের নানামুখী তৎপরতায়, তখন জনগণের জন্য সবচেয়ে জরুরি

ছিল এক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বোধ। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই বহিরাগতদের দেশে ঢোকার অনুমোদন দিতে হচ্ছিল; এবং নানা কারণে অপরাধপ্রবণতাও বাড়ছিল। এমতাবস্থায় পুলিশ বাহিনী আর নিরাপত্তা রক্ষার অন্যসব আয়োজন-যে যাবতীয় অপরাধী ও বহিরাগতের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, মধ্যবিত্তের সুস্থিতির জন্য এ ধরনের আশ্বাস খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল। হোমস সিরিজ একদিকে দেখাচ্ছিল, ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা সাম্রাজ্যের প্রান্তীয় 'অপর' এবং ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী – উভয় প্রকার বহিরাগতের আক্রমণে হুমকির সম্মুখীন (Berberich 2019: 57-58); অন্যদিকে অনবরত হাজির রাখছিল এমন এক নায়ককে, যে কিনা বহিঃশত্রু ও লিবারেল যাপনের জন্য ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে সফল লড়াই চালিয়ে আর্থিক ও সামরিক কর্তৃত্বে বলীয়ান 'carefree Victorians'-এর জন্য নিশ্চয়তার আবহ তৈরি করবে (Gillespie & Harpham 2011:464)। বস্তুত, 'For middle-class readers of *The Strand*, Holmes represented a fantasy hero who Could slay the demons of globalization' (Gillespie & Harpham 2011:464)।

উপনিবেশিত বিপুল ভূমি ও মানুষের বিপরীতে ভদ্র, উদারনীতিবাদী ও স্বস্তিপ্রিয় ইংরেজ জনগোষ্ঠীর এ অবস্থান সিরিজে একবারের জন্যও গোপন করা হয় নাই। দাবিটি অত্যন্ত পরিষ্কার। উন্নত চরিত্র ও নৈতিকবলই সাম্রাজ্য পরিচালনায় ইংল্যান্ডের সাফল্যের ভিত্তি। আর এর পেছনে বস্তুগত উন্নতিও গুরুতর ভূমিকা পালন করেছে। তার কমপক্ষে দুটি দিক। শিক্ষা, প্রযুক্তিগত উন্নতি আর নৈতিক-মানসিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিপুল উপনিবেশিত প্রান্তের তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞান জমা হচ্ছিল কেন্দ্রে। সাম্রাজ্য-পরিচালনার আবশ্যিক উপরি হিসাবে নৃবৈজ্ঞানিক ও জাতিতাত্ত্বিক যে জ্ঞানভান্ডার গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্য-পরিচালনাকারীদের ভাঁড়ারে, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে যেসব জ্ঞান অনবরত উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হচ্ছিল লন্ডনের বুদ্ধিবৃত্তিক আবহে, কোনান ডয়েল তার নিপুণ ব্যবহারের ভিত্তিতেই খাড়া করছিলেন নিজের মনোমুগ্ধকর কথামালা (Jasnowska 2015 : 250)। অন্যদিকে, সমকালীন অপরাধবিজ্ঞান, বিচার, আইন, চিকিৎসাপদ্ধতি, ফরেনসিক ব্যবস্থাপনা হোমস সিরিজে ধারণা ও পদ্ধতির দিক থেকে নিখুঁতভাবে অনুসৃত হয়েছে (Karschay 2019 : 96)।

অর্থাৎ হোমস সিরিজ শুধু সরাসরি ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকেই হাজির করে না, বরং এর বহু কাহিনি পরিকল্পিতই হয়েছে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশকে কেন্দ্রে রেখে। এডওয়ার্ড সাইদ, সঙ্গতভাবেই, *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* গ্রন্থে কিপলিঙ এবং কনরাডের পাশাপাশি কোনান ডয়েলকেও সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, যদিও তিনি এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেননি (Favor 1995: 4)। অবশ্য যদি এরকম উপকরণগত প্রত্যক্ষতা নাও থাকত, তবু উপনিবেশ-শাস্ত্রের নিরিখে এ সিরিজের অধিকাংশ লেখা খুব কার্যকরভাবে পড়া যেত। উনিশশ আশির দশকের

মধ্যেই সাহিত্যের একাডেমিক আলোচনার জগতে রহস্য-উপন্যাস এবং গোয়েন্দা-উপন্যাসের প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটে (Favor 1995: 4)। এ বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকের প্রকাশনা নিয়মিত হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা-কাহিনিতে অপরাধ ও শাস্তির মতো স্পর্শকাতর বিষয়ের মীমাংসা হয়, আর বিশেষভাবে ন্যায় তথা ভালো-মন্দের ধারণা পরীক্ষিত হয় – কাজেই অন্তত সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব আর ভাবাদর্শিক পক্ষপাত সাব্যস্ত করার জন্য এ ধরনের রচনার উপযোগিতা খুবই বেশি। রহস্য-উপন্যাস ও সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের নিবিড় সংযোগ বিষয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

ফলে বহুবিচিত্র দিক থেকে হোমস সিরিজ 'উপনিবেশ'-পাঠের জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ টেক্সট হিসাবে গণ্য হতে পারে।

৩ উপনিবেশের রকমফের ও উপনিবেশিত মানুষ

হোমস সিরিজের অনেকগুলো কাহিনিতে ইংল্যান্ডের বাইরের এমনসব অঞ্চলের উল্লেখ আছে, যেগুলো উপনিবেশ-সূত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। আমেরিকার মতো সাবেক উপনিবেশ যেমন উপস্থিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে, ঠিক তেমনি হাজির হয়েছে ভারতের মতো চলতি উপনিবেশও। উপনিবেশের ধরনভেদে সংশ্লিষ্টতার মাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন ভিন্ন। সেসব ধরন সম্পর্কে আলোকপাতের আগে বিভিন্ন কাহিনিতে ব্যবহৃত কিছু প্রসঙ্গ তথ্য-আকারে উপস্থাপন করা যাক।

আগেই বলেছি, ওয়াটসন-সূত্রে হোমসের কাহিনি শুরুর আগেই আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ইংল্যান্ডের সম্পর্কের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। তবে *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসের পটভূমি ভারত নয়, আমেরিকা। স্থানীয় মর্মোন জনগোষ্ঠীর অনেকটা বিপরীতে জন ফেরিয়ার, লুসি ফেরিয়ার আর জেফারসন হোপকে স্থাপন করে কোনান ডয়েল মনোজ্ঞ অপরাধ-কাহিনি ফেঁদেছেন, যার নিষ্পত্তি হয়েছে সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডনে।[১]

দ্বিতীয় উপন্যাস *সাইন অব ফোরে*ও মূল ঘটনা, বিশেষত আদি-অপরাধ, সংঘটিত হয়েছে কলোনিতে। এবারের পটভূমি ভারতবর্ষ। মিস মর্সটানের বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন রেজিমেন্টের সিনিয়র ক্যাপ্টেন ও দ্বীপান্তর কয়েদীরক্ষীদের সর্বপ্রধান। ১৮৭৮ সালে বারো মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফেরেন। তার বন্ধু মেজর শোল্টো একই রেজিমেন্টে অর্থাৎ 'থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি'তে কাজ করত। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মেজর শোল্টোর লন্ডনস্থ বাড়ির নাম 'পণ্ডিচেরী লজ'। তদন্তের কাজে সেখানে গেলে ওয়াটসনদের দরজা খুলে দেয় 'একজন ভারতীয় হিন্দু চাকর'। ভারতবর্ষ থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন প্রচুর ধনসম্পদ আর একদল চাকর-বাকর। বিলাসবহুল জীবন ছিল তার। তার পরিবারের, এমনকি ছেলেরও ছিল ভারতীয় চাল – হুকাসেবন, আতর ও খুশবুর ব্যবহার; ঘরে ভারতীয়

সজ্জা। হোমস ও ওয়াটসন দেখতে পান, ভারত থেকে আসা নানারকম দুষ্প্রাপ্য জিনিসে ঘর বোঝাই। এ উপন্যাসে এর বাইরে ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ এবং আন্দামান দীপপুঞ্জের বন্দিশালার বিবরণ আছে।

'ফাইভ অরেঞ্জ পিপ্‌স্‌' গল্পে হোমসের মক্কেল জন ওপেনশর চাচা আমেরিকার সৈন্যবিভাগের কর্নেল ছিলেন। সেখানেই টাকা কামিয়েছেন। পরে ১৮৭০ নাগাদ ইংল্যান্ডে ফিরে জমিজমা কিনে বসতি শুরু করেন। ১৮৮৩ সালে এ চাচার কাছে মৃত্যু-পরোয়ানা নিয়ে চিঠিটি এসেছিল ভারতের পণ্ডিচেরি থেকে। দলটি ছিল আমেরিকাভিত্তিক এক গুপ্তঘাতকের দল। বোঝা যায়, তাদের গতিবিধি ইংল্যান্ডের বর্তমান ও প্রাক্তন কলোনিগুলোতে ব্যাপ্ত ছিল।

'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকল ব্যান্ড' গল্পে হেলেন স্টোনারের সৎ-বাবা ভাগ্য ফেরানোর জন্য গিয়েছিলেন কলকাতায়। ডাক্তারি করে ভালো রোজগারও করেছিলেন। একসময় বনেদি পরিবার ছিল। কিন্তু এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার নিজের বাবাও ভারতবর্ষে ছিল। বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টোনার। এ ব্যক্তি মৃত্যুর আগে স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট টাকা রেখে গেছে, যা থেকে 'হাজার পাউন্ড' আয় হয়। কলোনি থেকে পর্যাপ্ত উপার্জনের এরকম উদাহরণ আরো বহু কাহিনিতে আছে।

'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কপার বীচেস' গল্পের মি. ফাউলার 'সরকারী চাকরি নিয়ে' মরিসাসে ছিলেন। শার্লক হোমসের প্রথম মামলা হিসাবে পরিচয়-দেয়া কাহিনি 'গ্লোরিয়া স্কট'-এ ট্রেভর সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'বইপড়া বিদ্যে বিশেষ নেই – ভাগ্যের সন্ধানে সারা পৃথিবী টহল দিয়েছেন।' ইনি খনি অঞ্চলে কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরে জমিজমা কিনে থিতু হন। এর আগে মাত্র তেইশ বছর বয়সে সাঁইত্রিশ জন দাগি কয়েদির সঙ্গে তাকে চালান করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। 'এম্পটি হাউস' গল্পে নিহত রোনাল্ড অ্যাডেয়ার ছিলেন আর্ল অব মেনুথের দ্বিতীয় পুত্র। আর্ল সেই সময় অস্ট্রেলিয়ায় একটা কলোনির গভর্নর ছিলেন। 'সলিটারী সাইক্লিস্ট' গল্পে ভায়োলেট স্মিথের কাকা রালফ স্মিথ 'পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় অভিযানে গিয়ে আর ফেরেননি।' কিন্তু টাকা কামিয়েছেন দেদার। সে টাকার উত্তরাধিকারী হওয়াতেই ভায়োলেট স্মিথ দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন, আর হোমসের দ্বারস্থ হন। *ভ্যালি অব ফিয়ার* উপন্যাসের ডগলাস টাকা রোজগার করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি থেকে। জীবনের বেশ কতকটা সময় কাটিয়েছে আমেরিকায়। লন্ডনের শহরতলিতে অবস্থিত বির্লস্টোনের ম্যানর হাউজে অনেকদিন কেউ বাস করেনি। বলতে গেলে পরিত্যক্ত ছিল। আমেরিকার সোনার খনি থেকে কামানো টাকায় ডগলাস সেটা নতুনভাবে নির্মাণ করে বসতি শুরু করে। 'অ্যাডভেঞ্চার অব ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট' গল্পের মক্কেল জেনারেল মারভিল 'খাইবার পাস-বিখ্যাত' জেনারেল; এমনই মশহুর ইংল্যান্ডে যে, এক নামে তাকে সকলেই চেনে। গল্পের ভিলেন ব্যারন মহাশয় থাকেন এক বিশাল

প্রাসাদে। সাবেক আমলের প্রাসাদ। 'আফ্রিকায় সোনা খুঁজে পেয়ে' রাতারাতি ধনকুবের হওয়া এক ভদ্রলোক তৈরি করিয়েছিলেন বাড়িটি।

আরো অনেকগুলো কাহিনিতে এমন ঘটেছে যে, ইংল্যান্ডের সমাজে কোনো কারণে নাস্তানাবুদ হয়ে, বা আর্থিক গরিবির কারণে, বা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার কারণে চরিত্রগুলো কলোনিতে পাড়ি জমিয়েছে। 'প্রায়রি স্কুল' গল্পে অপকর্মের হোতা জেমস 'শিগগিরই ভাগ্যান্বেষণে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছে।' 'থ্রি স্টুডেন্টস' গল্পে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরির অপরাধে অপরাধী গিলক্রাইস্ট সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। বর্তমানে গরিব। চুরি করে অন্তর্জ্বালায় সে জেরবার হয়েছে। ঠিক করেছে: 'রোডেশিয়ান পুলিশে একটা চাকরি নিয়ে শিগগিরই দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হয়ে যাবে।' *ভ্যালি অব ফিয়ার* উপন্যাসে স্যার চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোজার বাস্কারভিল অল্প বয়সেই খুব কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। পরে মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যায়, আর সেখানেই হলুদ জ্বরে মারা যায় ১৮৭৬ সালে।

'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লাঞ্চড্ সোলজার' গল্পের মক্কেল জেমস এম ডড দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজকীয় অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে কাজ করত। উপনিবেশ থেকে কেবল সোনাদানা নয়, রোগও নিয়ে আসত উপনিবেশক-পক্ষ। এ গল্পে যেমন নিয়ে এসেছিল কুষ্ঠ রোগ – খুব ভয়ংকর ধরনের নয় যদিও।

উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়; কিন্তু এ থেকেই হোমস সিরিজে উপনিবেশিত অঞ্চল ও মানুষের উপস্থিতি এবং অপরাধ সংঘটনে উপনিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমেরিকার মতো প্রাক্তন 'বসতি' উপনিবেশ, আর অস্ট্রেলিয়ার মতো চলমান 'বসতি' উপনিবেশের সাথে মূল ভূমির সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'আদিবাসী'দের ভূমিকা খুবই গৌণ, বা নাই বললেই চলে। *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* এক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব উপনিবেশে প্রধান হয়ে উঠেছে ভূমি – প্রধানত খনির ব্যবসাসূত্রে বিপুল রোজগার করে ইংল্যান্ডে থিতু হওয়া মানুষদের গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। বিপরীতে ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ, যেখানে 'বসতি' গড়ার পরিবর্তে উপনিবেশক-পক্ষ 'সুশাসন ও সভ্যতা' বিতরণে নিয়োজিত ছিল, সেখানে উপনিবেশিত মানুষের সামষ্টিক উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি, যদিও তা একদিকে 'নেতিবাচক', অন্যদিকে খুবই আবছা। তৃতীয় ধরনটা দেখি আফ্রিকার ক্ষেত্রে। আফ্রিকায় তখন আবার উপনিবেশ স্থাপিত হচ্ছিল নতুন করে; সোনা-হীরার খনিও ছিল দেদার। আফ্রিকার উল্লেখের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভূমি আর সম্পদই সেখানকার প্রধান উপাদান, যা কাহিনিগুলোতে স্রেফ উল্লেখসূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা যায়, কাহিনিগুলোতে আফ্রিকা তুলনামূলক অচেনা এলাকা।

সিরিজে উপনিবেশ আর উপনিবেশিত উপাদানের বহুল ব্যবহারের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, অপরাধী বা ন্যায়-বিরোধী মানুষদের একটা বড় অংশ এখানে

'বিদেশি'। এর একাংশ সরাসরি উপনিবেশিত 'অপর', অপরাংশ ইউরোপীয় 'অপর' – অনেক ক্ষেত্রেই জর্মন, কিন্তু ইতালীয়, ফরাসি বা রুশরাও আবির্ভূত হচ্ছিল প্রায়শই, যাদের প্রত্যেকেই বস্তুত 'imperial competitors' (Berberich 2019: 65)। আবার, বিপুল সংখ্যক অপরাধী আছে এমন, যারা কোনো-না-কোনো পর্বে উপনিবেশের সাথে সম্পর্কিত ছিল, অথবা অপরাধ-সংঘটনের পরে চালান হয়েছে উপনিবেশে। কিন্তু অপরাধী যেই হোক, আর অপরাধ যেখানেই সংঘটিত হোক, তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ইংল্যান্ডে। *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* বা *সাইন অব ফোর* উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। আমেরিকা বা ভারতে সংঘটিত ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি-সংস্কৃতি-অর্থনীতির কার্যকারণেই পাড়ি জমিয়েছে মূল ভূখণ্ডে– 'from the first pages, are woven into investigations of crime on English soil' (Reitz 2019: 128)।

কাহিনিগুলোর এ গড়নের কারণেই হোমস সিরিজে মুখ্য হয়ে উঠেছে উপনিবেশকের মুখ। কেবল এ পক্ষই জনজীবনের বিপুল আয়োজনসহ যাবতীয় আলো শুষে নিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে। যে জীবনের কোণাকাঞ্চিতে অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদান হিসাবে সংঘটিত হয়েছে অপরাধ, আর সে অপরাধের উৎস তালাশে ত্বরিত সাফল্যের মধ্য দিয়ে শার্লক হোমস হয়েছেন নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অতুলনীয় প্রতীক, সিরিজের কাহিনিগুলোতে সে জীবনেরই জয়জয়কার। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ওই জীবন সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ড আর সংশ্লিষ্ট উপনিবেশগুলোর যৌথ বাস্তবতায় গড়া। আমরা এখন সিরিজের সংশ্লিষ্ট কাহিনি অবলম্বনে সেই জনজীবনের হদিশ নেব।

৪ উপনিবেশকের মুখ

একজন মানুষের আঙুলের নখ, কোট বা শার্টের হাতা, বুটজুতা, প্যান্টের হাঁটু, তর্জনী বা বুড়ো আঙুলের কড়া, চোখ-মুখের চাউনি ইত্যাদি দেখেই অভ্রান্তভাবে তার জীবিকা বলে দেয়া যায়; তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও একটা কেজো ধারণা হয় – শার্লক হোমসের বিখ্যাত অবরোহী-পদ্ধতি দাঁড়িয়ে আছে যেসব মূল ভিত্তির উপর, তার মধ্যে এটা একটা। এ বাস্তবতা খুবই পেশাভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, পেশা ও শ্রেণিবিভক্ত এক সমাজের কথা বলে। ওই সমাজের ওপরতলা থেকে শুরু করে একেবারে তলানি পর্যন্ত হোমসের নখদর্পণে ছিল। তদন্ত ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে হোমস প্রত্যয়ী হয়েছেন অভিজ্ঞতার এ নিশ্চয়তা থেকে; আর এর উপজাত হিসাবে হোমস সিরিজে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন ইংল্যান্ডের জনজীবন।

হোমস শহরজুড়ে রাস্তার ও বস্তির বালকদের মধ্য থেকে সংবাদদাতা নিয়োগ করে রেখেছিল, যারা দৈনিক মাত্র এক শিলিংয়ের বিনিময়ে ৫০ লক্ষ মানুষের ওই শেষ-ভিক্টোরীয় জমানার লন্ডন শহরে তার চোখ-কান হিসাবে কাজ করত (Brunsdale 2010: 464)। এই নিচের সারির মানুষ থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চমহলেও তার ছিল অবাধ গতিবিধি, মুখ্যত বড়ভাই মাইক্রফট-সূত্রে। মাইক্রফট তার বিরল ধরনের

গোয়েন্দা-প্রতিভার কারণে, এবং উচ্চ পর্যায়ের চাকরির কারণে, সম্পর্কিত ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রের সবচেয়ে উঁচু জায়গাগুলোর সাথে। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের পাশাপাশি এ যোগাযোগের উপর ভিত্তি করেই হোমসের পক্ষে ইংল্যান্ডের সামগ্রিক বাস্তবতা ও জনজীবন সম্পর্কে প্রত্যয়ী মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে।

এর মধ্যে হতদরিদ্র অংশটির প্রতি শার্লক হোমস বা ওয়াটসনের কোনো মমতা দেখা যায়নি। যেসব জায়গায় গরিবির বিবরণ দিয়েছে ওয়াটসন, তার সবটাই ভয়াবহ। পড়লে মনে হয় যেন নাক-মুখ কুঁচকে জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই বাঁচোয়া। লক্ষণীয়, হোমস সিরিজে যা কিছু মানসম্মত নয়, যা কিছু রুচিশীল নয়, তার বিবরণে বীভৎসরসের সুস্পষ্ট অতিশায়ন আছে। গরিবির বিবরণ ছাড়াও নিহত কিংবা রোগাক্রান্ত মানুষের অগোছালো-বিকৃত চেহারার বিবরণেও সে একই প্রবণতা দেখা যায়। এ ভাষাভঙ্গি ও বর্গীকরণ স্পষ্টতই ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ ও রুচির গভীর চিহ্ন বহন করে।

ওই মূল্যবোধ ও রুচি মুখ্যত মধ্যবিত্তের ব্যাপার। শার্লক হোমস নিজেও এ গোত্রভুক্ত, এবং ওয়াটসনও– যারা স্রেফ টাকায় কুলাতে না পেরে থাকার জায়গা ভাগাভাগি করে। হোমসের মধ্যে একবিন্দু আবেগ নাই, কিন্তু সহানুভূতি ষোল আনা আছে। পূর্ণমাত্রার পেশাদারিসহ 'যৌক্তিক' সহানুভূতি– এই হল শার্লক হোমস। এ হোমসের সাথে ইংল্যান্ডের ভদ্রলোকসমাজের বড় ফারাক যা দেখা যায়, তার প্রায় সবটাই পেশাগত কারণে। মক্কেলদের বা অপরাধীদের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য হোমস নিজে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সে পদ্ধতি ব্যবহার করে তার সম্পর্কে বলা সম্ভব যে, ভদ্র-আচরণের সাপেক্ষে 'অস্বাভাবিক' সমস্ত আচরণ, যেমন আফিম সেবন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝিম মেরে থাকা, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের প্রকাশ– সবই তার পেশার সাথে সম্পর্কিত। সেটুকু বাদ দিলে হোমসকে সাধারণভাবে ভদ্রলোকি আদব লঙ্ঘন করতে দেখা যায়নি। গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে এ বিপুল মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষ থেকে, এবং তাদের নিয়েই, মূলত এ সিরিজের কাহিনিগুলো লেখা হয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উচ্চবিত্তকে চিত্রিত-চিহ্নিত করা হয়েছে– একটু দূরবর্তী অবস্থান থেকে। কিন্তু সাধারণভাবে জন্মগত ও শ্রেণিগত উচ্চবিত্তের চরিত্রায়ণে ভদ্রজনোচিত আদবের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। 'রেড হেডেড লীগ' গল্পে ব্যাংক-ডাকাতির পরিকল্পনাকারী জন ক্লে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সে রাজবংশের ছেলে। বয়স বেশি নয়। উচ্চশিক্ষা পেয়েছে। তাহলে বখে গেল কেন? কোনান ডয়েল কারণ হিসাবে বলেছেন, 'সঙ্গ দোষে অন্ধকারের পেশা নিয়ে রয়েছে।' 'প্রায়রি স্কুল' গল্পের ডিউক একজন রাজনীতিবিদ। দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারা, সরু মুখ, দীর্ঘ নাক। রাজপুরুষের মতোই রুচিসম্মত পরিপাটি পোশাক। হোমস সিরিজে একবারের জন্যও এ অবস্থানের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এখানকার অভিজাতরা সব অর্থেই মার্জিত আর রুচিশীল।

এমনকি কোনো অন্যায় করলেও তা সাময়িক, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অন্য কোনো 'মহৎ' দুর্বলতার প্রকাশ। যেমন, এ গল্পে স্নেহবশত ডিউক কিছু অন্যায় মেনে নিয়েছে, বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার মর্মযাতনাও কম হয়নি।

এ ধরনের ভদ্রসমাজে– উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে– কেউ যখন ভুলবশত বা সাময়িক বিচ্যুতিবশত বেআইনি কাজে লিপ্ত হয়, তার প্রতিবিধান ঘটে কিভাবে? হোমস সিরিজ বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে, অপরাধীকে কলোনিতে চালান করে দেয়া পুরো সময়জুড়েই ইংল্যান্ডের সামাজিক সুস্থিতি রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে চর্চিত হয়েছে।

কলোনি উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের সমাজ-কাঠামোয়-যে আবশ্যিক এক বাস্তবতা হয়ে উঠেছিল, তার এক প্রমাণ অপরাধীদের স্বদেশ-ত্যাগ ও কলোনিতে আশ্রয়-গ্রহণ। দুরাচারী যেসব তরুণ ওই সমাজের জন্য বোঝা হয়ে উঠত, তারা নানান কায়দায় পাড়ি জমাত ওইসব দূরদেশে। ফলে দেশীয় সমাজ স্বস্তি পেত। আবার, দেশের জন্য দুরাচারী বলে গণ্য হওয়া ওই তরুণরা কলোনিতে ভালো ক্যারিয়ার গড়ে হয়ে উঠত কল্যাণকর। *সাইন অব ফোর* উপন্যাসের জোনাথন স্মলের ইতিহাস এর অন্যতম জুতসই নজির। সে তার পরিবার ও সমাজের জন্য ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। আঠার বছর বয়সে 'নারীঘটিত এক ব্যাপারে' জড়িয়ে পড়ে শেষে তাকে পালাতে হয় দেশ ছেড়ে। 'হার্ড চাফস সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে' চলে যায় ভারতবর্ষে। এভাবে, তার ভাষায়, ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করলেন। 'প্রায়রি স্কুল' গল্পে অপকর্মের হোতা জেমস ভাগ্যান্বেষণে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। *ভ্যালি অব ফিয়ার* উপন্যাসে ব্যারিমুরের শ্যালক দাগি আসামি। জেল পলাতক। ব্যাপারটা স্যার হেনরি আর ওয়াটসনের কানে গেলে তারা উদ্বিগ্ন হয় এই ভেবে যে, এ লোক জলার যে কোনো বাড়িতে হামলা করতে পারে। জবাবে ব্যারিমুর বলে, কদিনের মধ্যেই সে দক্ষিণ আমেরিকা রওয়ানা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে স্যার হেনরি ওয়াটসনের মত জানতে চাইলে তার নিশ্চিন্ত জবাব: দেশ ছেড়ে গেলে অবশ্য আর কোনো কথা থাকে না।

অপরাধীকে কলোনিতে পার করে অপরাধ 'সামাল' দেয়ার এই যে সর্বসম্মত কেতা, হোমস সিরিজে এটা এত বেশিবার ঘটেছে যে, একে ওই সময় ও সমাজের সাধারণ নৈতিকতা হিসাবেই বিবেচনা করা চলে। অবশ্য বাস্তবতার এ এক পিঠ মাত্র। উল্টা পিঠে আছে উপনিবেশক পক্ষের ওইসব শাদা পুরুষ, যারা কলোনিতে নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত বা আসক্ত হয়ে ইংল্যান্ডে ফিরেছে, আর অভ্যস্ত নৃশংসতার প্রকাশ ঘটিয়েছে কেন্দ্রের 'ভদ্রসমাজে'। উপনিবেশ-অধ্যয়ন শাস্ত্রে উপনিবেশ-ফেরত নিপীড়ক পুরুষদের অপরাধ-প্রবণতা, নৃশংসতা ও গার্হস্থ্য-সন্ত্রাসের কথা বহুবার বলা হয়েছে। হোমস সিরিজের অনেকগুলো কাহিনিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে।

এ ধরনের চরিত্রের মধ্যে ভাষ্যকারেরা নানা কারণে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেন 'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকলড ব্যান্ড' গল্পের রয়লটের নাম (Thomas 1994a; Favor 1995; Favor 2000)। ভারত-ফেরত চরিত্রটি কেবল নানা উদ্ভট আচরণই রপ্ত করেনি, নিজের সৎ মেয়েকে খুন করার মতো জঘন্য ঘটনাও ঘটিয়েছে। 'এম্পটি হাউস' গল্পের কর্নেল সিবাসটিয়ান মোর‍্যান সম্পর্কে শার্লক হোমস মনে করত, মরিয়ার্টি মারা যাওয়ার পরে, মোর‍্যানের মতো অপরাধ-বিষয়ে কামেল ব্যক্তি ইংল্যন্ডে দ্বিতীয়টি নেই। এই মোর‍্যানের পরিচয় কী? সে 'হার-ম্যাজেস্টির ইন্ডিয়ান আর্মিতে' কাজ করত– 'আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যে সেরা বন্দুকবাজ'। ইন্ডিয়াতে এমন বন্দুকবাজ দ্বিতীয়টি ছিল না। দেশে ফিরে সে হয়ে ওঠে অপরাধ-জগতের ওস্তাদ। তার মানেই হল, কলোনির জন্য জরুরি কুশলতা আর অভ্যস্ততা ইংল্যান্ডে সঞ্চারিত হয়েছে অপরাধের ভাষায়। 'সলিটারী সাইক্লিস্ট' গল্পের উডলি একটা পিশাচ ও খুনে গুণ্ডা হিসাবে বিকশিত হয়েছে আফ্রিকায়। দেশে ফিরে শান্ত-সমাহিত গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস ছড়িয়েছে।

শার্লক হোমসের ইংল্যান্ডে সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস এই কলোনি-ফেরত মানুষেরা। কিন্তু তাতে গভীরভাবে শিক্ষিত এবং কাঠামোগতভাবে সুশৃঙ্খল ইংল্যান্ডের বিকশিত সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো মোটেই বিস্রস্ত হয় না। পত্রিকা ও বই এ সমাজের ভিত্তি। সুবিন্যস্ত বসতি আর পর্যাপ্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা নগরজীবনের অবলম্বন। ঘড়ির কাঁটা ধরে রেল চলে; ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিঠি আর টেলিগ্রাম বিলি হয়। এমনকি বহিঃদুনিয়ার সাথে যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল কাঠামোর অঙ্গীভূত। বৃহৎ সাম্রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি ও গুণ এ সমাজের মজ্জাগত। হোমসের সামগ্রিক তদন্ত সম্পূর্ণভাবে এ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে। হোমসের কর্মপদ্ধতি ইংল্যান্ডের কাঠামোগত প্রগতির এক অন্যতর প্রদর্শনী বৈ নয়।

এ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে সমস্যা-সমাধানের খুব মোক্ষম এক ফন্দি এঁটেছিল হোমস। আংটি-প্রাপ্তির সংবাদ জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল 'হারানো-প্রাপ্তি' কলামে। এটা ছিল একটা টোপ। টোপ হিসাবে আংটিকে ব্যবহার করার বুদ্ধি হোমস পেয়েছিল তার অসামান্য অবরোহী যুক্তি থেকে। কিন্তু কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে-যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে খুনীর, সে কথাটা তার মনে এসেছে কতগুলো সামাজিক নীতি-নৈতিকতা, অভ্যাস ও রেওয়াজে ভর করে। প্রথমত, একটা আংটি কেউ খুঁজে পেলে সে ফেরত দিতে মরিয়া হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে। কারণ, সম্ভবত যার আংটি হারিয়েছে সে কাগজে এ ধরনের বিজ্ঞাপন খুঁজবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে ওই নাগরিক সমাজের, যার উপর ভিত্তি করে হোমস আসামি ধরার মতলব করেছিল। সেবার লোকটা পালাতে পেরেছিল বটে, কিন্তু পরে চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ার সময়েও প্রায় একই ধরনের অন্য কিছু উপকরণে ভর দিয়ে হোমস পরিকল্পনা সাজিয়েছিল।

সাইন অব ফোর উপন্যাসে দেখি ১৮৮২ সালের ৪মে *টাইমস* পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে মিস মর্স্টানের ঠিকানা চেয়ে। মিস মর্স্টান ঠিকানা দিয়েছেন আবার সেই বিজ্ঞাপন স্তম্ভেই। পরে ঠিকানা-মোতাবেক সে ফি বছর পেয়ে আসছিল একটা করে খাঁটি ও দামি মুক্তা। *অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কারবাঙ্কল* গল্পে সান্ধ্যকাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে হেনরি বেকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। হোমস বলেছে, সে নিজে যদি নাও দেখে, বন্ধু-বান্ধবের চোখে পড়লেও সে জানতে পারবে। এসব ঘটনা পত্রিকানির্ভর তথা অক্ষর-নির্ভর একটা গুছানো সমাজের পরিচয় দেয়।

যাতায়াতের খুবই নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে ট্রেনের বিকাশ ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। তার সময়ানুবর্তিতা এতটাই নিখুঁত যে, বেশ কয়েকটি কাহিনিতে হোমস ট্রেন-চলাচলের হিসাবটা মিনিটের কাঁটায় মিলিয়ে রহস্যের কিনারা করেছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে অসামান্য ডাকব্যবস্থা– চিঠি আর টেলিগ্রাম জনজীবনকে এক আশ্চর্য নিশ্চয়তা আর কুশলতায় গতিশীল করেছিল। *সাইন অব ফোরে* মিস মর্স্টানকে অজ্ঞাতনামা কেউ একজন চিঠি লিখেছে। চিঠিটা সে পেয়েছে ওইদিনই। আর যেজন্য চিঠি লিখেছে সে কাজটাও একই দিনের। 'ম্যান উইথ দ্য টুইসটেড লিপ' গল্পে দেখি, মিসেস সিনক্লেয়ার দিনের চিঠি দিনেই পেয়ে গেছেন। সব ধরনের যোগাযোগকে এক কার্যকর দ্রুততা দিয়েছিল টেলিগ্রাম। ঠিকানা নিশ্চিত হলেই টেলিগ্রাম করা যাচ্ছে, আর তা চটজলদি পৌঁছেও যাচ্ছে। সরকারি পুলিশ অ্যাথেনলি জোন্সকে হোমস পাপলার ডাকঘর থেকে তার করেছিল দুপুর বারটায়। তার পেয়ে জোন্স বেকার স্ট্রিটে উপস্থিত হয় বেলা তিনটায়।

যোগাযোগের এ অসামান্য শৃঙ্খলার সাথে সমানতালে বিকশিত হয়েছিল আর্থিক ব্যবস্থাপনা আর আইনি কাঠামো। শার্লক হোমস বহুবার বিদ্যমান আইনের সমালোচনা করেছে; এর যথার্থতা ও যথেষ্টতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু যে আইন বিদ্যমান আছে, তা অনুসৃত না হওয়ার বা কার্যকর না হওয়ার কোনো উদাহরণ কাহিনিগুলোতে পাওয়া যায় না। অপরাধের বাইরে আইনের সবচেয়ে বড় প্রয়োগ দেখা গেছে সম্পত্তি ও অর্থ-ব্যবস্থাপনায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটানো আর উইলের মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উত্তরাধিকার নির্ধারণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার খুব উল্লেখযোগ্য খাত। যে কোনো সমাজেই কাঠামোগত শৃঙ্খলার জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তবে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশক ইংল্যান্ডে এর অন্যরকম গুরুত্ব দেখা দিয়েছিল বলে হোমস সিরিজের অনেকগুলো কাহিনিতে আভাস পাওয়া যায়।

অনেকগুলো কাহিনিতে দেখা গেছে, উইলের টাকা ব্যাংকে জমা রেখে বেশ আকর্ষণীয় লভ্যাংশ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, এটা সেকালের খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বাস্তবতা। ব্যবস্থাপনাগত ও আইনি দিকগুলো খুব নিখুঁত বলেই বেআইনি ও অপরাধমূলক পন্থায় তা আত্মসাৎ করার দরকার পড়ে। আর তাতে ডাক পড়ে পুলিশ ও গোয়েন্দার। এ

ধরনের অনেকগুলো ঘটনা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত সহজেই নেয়া যেতে পারে। প্রথমত, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও টাকা খাটানোর ব্যবস্থাপনা খুবই নিখুঁত। আইন খুবই পোক্ত। সে কারণেই কাউকে মেরে না ফেললে, বা আটকে না রাখলে, বা আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে মালিকানা লাভ না করলে টাকা মেরে দেয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা আইন দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। বেআইনিভাবে যেসব ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছিল, হোমস তাদের অনেককে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কলোনি থেকে আহৃত সম্পদের সাথে এ আর্থিক ব্যবস্থাপনার গভীর সম্পর্ক ছিল। হোমসের বহু চরিত্র উপনিবেশ থেকে টাকা কামিয়ে দেশে ফিরেছে। বিয়ে-থা করে সংসারি হয়েছে। তাদের জীবিকার প্রধান উপায় জমানো সম্পদের লভ্যাংশ। রাষ্ট্র, আইন ও সার্বিক অর্থব্যবস্থা এ টাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু লন্ডন শহর ক্রমে বড় হচ্ছিল। জনসংখ্যা বাড়ছিল। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল অপরাধ। ১৮০০ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লন্ডনের জনসংখ্যা নয় লক্ষ থেকে বেড়ে একাত্তর লক্ষ হয়েছে (Gillespie & Harpham 2011:462)। ইউরোপের অন্য অঞ্চল থেকে এবং ইউরোপের বাইরে থেকেও ব্যাপকভাবে লোক জড়ো হয় লন্ডনে। তাছাড়া কলোনিতে বসবাস করে ফিরে আসা লোকদেরও একটা বড় দল এ সময়ের লন্ডনিদের মধ্যে ছিল। শার্লক হোমসের ইংল্যান্ডে কলোনিতে কর্মরত ব্রিটিশদের সাথে ব্রিটেনে সারাজীবন-কাটানো মধ্য ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষদের একটা ফারাক তৈরি হয়েছিল। নানা বিচারে এদের আলাদা করে দেখাটাই ছিল তখনকার সামাজিক রেওয়াজ। আর এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও মনোবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় তখনকার পত্রপত্রিকায় (Fluet 1998: 130-33)। হোমস সিরিজের বহু কাহিনিতে এ বাস্তবতার দেখা মিলেছে।

উপনিবেশিত অঞ্চল থেকে ফিরে আসা তুলনামূলক সচ্ছল এবং খানিকটা মারদাঙ্গা স্বভাবের এসব মানুষ, এ সিরিজের ভাষ্য মোতাবেক, জনমিতিতে অন্তত দুটি বড় বদল ঘটাচ্ছিল। প্রথমত, পুরনো অভিজাত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার কালে কলোনি থেকে নগদ টাকা নিয়ে আসা ব্যক্তিরা নতুন অভিজাত শ্রেণির একটা স্তর গঠন করছিল। 'রেইগেট স্কয়ার' গল্পে দেখি, রেইগেট গ্রামে পুরনো জমিদার দুজন। এর পরের ধাপেই পড়ে কর্নেল হেটারদের মতো মানুষেরা, যারা নগদ টাকায় সম্পত্তি কিনে তৈরি করছিল নতুন ক্ষমতাবান শ্রেণি। এরকম চরিত্র অনেক পাওয়া যায়, যারা মুখ্যত আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার খনি-অঞ্চলে টাকা কামিয়ে দেশে ফিরেছে। আফ্রিকা ও ভারত থেকে প্রত্যাগত চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের মানুষদের কল্যাণেই গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর বদল ঘটছিল, এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিস্তরঙ্গ কাঠামো বদলে যাচ্ছিল। তাতে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ সমাজে অপরাধ-প্রবণতা বেড়েছে। হোমস সিরিজের অনেকগুলো গল্পে গ্রামদেশীয় এই 'নিরাপদ ইংরেজ-বসতি'র মধ্যে রহস্য ও

খুনের মতো ঘটনা ঘটিয়ে পাঠকদের জন্য বাড়তি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা হয়েছে (Berberich 2019: 59)। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তিত জনমিতি এ ধরনের কাহিনি-পরিকল্পনার অন্যতম ভিত্তি।

এসব ব্যতিক্রমের ফলে অবশ্য ইংল্যান্ডীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্ত বনিয়াদে কোনো ফাটল তো দেখা দেয়ইনি, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের তরফে এ ধরনের দুর্বৃত্তরা যে খুবই ঠুনকো, সে বোধই পোক্ত হয়েছে। ১৮৮০ ও ৯০-এর দশকে লন্ডনে পুলিশ-ব্যবস্থা ও তদন্তে দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল (Gillespie & Harpham 2011: 463)। বিশেষত ফরেনসিক প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির ফলে অপরাধ শনাক্তকরণ নতুন মাত্রা অর্জন করে। ফটোগ্রাফির ব্যবহারও এক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক কার্যকরভাবে অপরাধ দমন সম্ভব হচ্ছিল। শার্লক হোমস কনসালটেন্ট গোয়েন্দা হিসাবে পুরো প্রক্রিয়াকে একটা উচ্চমার্গীয় মহিমা দিয়েছিল বটে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো লঙ্ঘন করার কথা একবারের জন্যও তাকে ভাবতে হয় নাই। এ ধরনের একটা 'মহিমান্বিত' জনসমাজের পক্ষ থেকেই হোমস সিরিজ তাকিয়েছে উপনিবেশিত 'অপরে'র দিকে। কাজেই অপরায়ণের মাত্রা তীব্রতর হয়েছে।

৫ উপনিবেশিতের উপস্থাপন : রিপ্রেজেন্টেশনজনিত বিবেচনা

এ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসের শেষাংশে জেফারসন বলেছে, 'আমার উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার। দণ্ড পাবার আগে আমার শত্রু নিজের পাপকর্মের চেহারাটা চোখের সামনে দেখতে পাবে– এই সুযোগ আমি তাকে দেব।' জরুরি প্রশ্ন হল, জেফারসন এরকম একটা সূক্ষ্ম নৈতিক-বোধে পৌছাল কিভাবে? কী তার পরিচয়? তার বিদ্যা-বুদ্ধির কোনো পরিচয় দেয়া হয় নাই। সোহবতের কথাও আমরা জানি না। শুধু জানি, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সে সোনা-রূপা আহরণ করে ভাগ্যান্বেষণে লিপ্ত ছিল। আর জানি, সে খ্রিস্টান। দুটোই ইউরোপীয় উপনিবেশকের মোক্ষম পরিচয়। অন্যদিকে, ড্রেবার ও স্ট্যানজারসন গোত্রপতি হওয়ার পরেও, এবং বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর পরেও, তাদের স্বভাব বা আচরণে তার বিন্দুমাত্র ছাপ পড়ে নাই। যাবতীয় বদ-খাসিলত তাদের মজ্জাগত। সে কি তাদের ধর্ম ও নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়ের ভিন্নতার কারণে?

বস্তুত, অপরিচয়জনিত এ ভিন্নতা কাটিয়ে ওঠার কোনো আলামতই হোমস সিরিজে পাওয়া যায় না; বরং বলা যায়, বেশিরভাগ কাহিনিতে 'অপরতা' টিকিয়ে রাখা বা অপরতায় জোরারোপ করা অপরাধমূলক ঘটনার বনিয়াদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন বিশ্লেষক লেখকের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে–

> Conan Doyle's attitude regarding non-Anglo-Saxons is typically imperialist. He assumes that people not of Anglo-Saxon origin necessarily require "the sword of justice" to be "swung" over them; they cannot effect

> justice, or at least an adequate justice, in their countries autonomously. (Favor 1995 : 97)

কোনো সন্দেহ নাই, উপনিবেশক পক্ষের জন্য অত্যন্ত জরুরি এ দৃষ্টিভঙ্গিই কোনান ডয়েলের জনপ্রিয়তম সিরিজটিতে অনবরত পুনরুৎপাদিত হয়েছে। অপরাধী বা নিরপরাধ নির্বিশেষে অ-ইউরোপীয়রা স্থাপিত হয়েছে ইংরেজিয়ানার বিপরীতে। *সাইন অব ফোর* উপন্যাসে আন্দামানি আদিবাসী লোকটিকে সবসময় বর্ণনা করা হয়েছে 'বর্বর' বলে; চেহারার বর্ণনায় বলা হয়েছে 'বিকট'; আর লঞ্চে তার বর্ণনায় প্রথমবার বলা হয়েছে 'নিউজিল্যান্ড কুকুরের মতো কালো কি একটা পড়ে রয়েছে।' কিন্তু 'সোজা হয়ে যখন দাঁড়ালো, দেখা গেল একটা ক্ষুদে মানুষ– অবিশ্বাস্য তার বামনাকৃতি মাথাটা প্রকাণ্ড– কোঁকড়ানো কালো চুলের স্তূপ যেন একটা। ক্ষুদে চোখ দুটি জ্বলছে নরকের স্ফুলিঙ্গের মত। শ্বাপদের মত দাঁত খিঁচোচ্ছে আমাদের।' অন্যদিকে জোনাথন স্মলের উপস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার চেহারায়ও ভীতির কথা আছে। জানালায় তার ভীতিকর মুখ একাধিক মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। অথচ তার ধরা-পড়ার পরের বিবরণ এরকম : 'মুখখানা এমনিতে শান্ত, কিন্তু চোয়াড়ে থুৎনি আর ভারী ভুরু দেখলেই অনুমান করা যায়, রেগে গেলে এ মুখই পিশাচের মত ভয়ংকর হয়ে ওঠে।' কাজেই পৈশাচিকতা তার মর্মগত বৈশিষ্ট্য নয়– অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

'থ্রি স্টুডেন্টস' গল্পে বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতা করেছে যে তিনজন ছাত্র, তার একজন ভারতীয়। নাম দৌলতরাম। তার পরিচয়ে বলা হয়েছে: 'এমনিতে শান্ত-শিষ্ট। কিন্তু চলাফেরা দেখে ঠিক বোঝা যায় না। সব ভারতীয়ের মতোই কেমন রহস্যময়।' এ গল্পে 'রহস্যময়তা'র সাথে 'অপরাধ' যুক্ত হয়নি। কিন্তু সব ভারতীয়ের বৈশিষ্ট্যকে যেভাবে সাধারণীকরণ করা হয়েছে, অ-ইউরোপিদের সামগ্রিক উপস্থাপনায় এরকম সাধারণীকরণ হোমস সিরিজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'ডাইং ডিটেকটিভ' গল্পের কথাই ধরা যাক। পুরো গল্পটা দাঁড়িয়ে আছে প্রাচ্যদেশের অপরায়ণের ভিত্তিতে। ভয়াবহ ও উদ্ভট রোগ প্রাচ্যদেশের সাথেই যুক্ত। ভিলেন কালভার্টন স্মিথ সুমাত্রায় চাষাবাদের কাজ করে। কাজেই ইংল্যান্ডের মানুষ হলেও তার যাবতীয় দুরাচারের সাথে প্রাচ্যদেশের যোগ আছে। শার্লক হোমস নিজে যে-ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হবার ভান করেছিল, কালভার্টন স্মিথ ডাক-মারফত যে-রোগের জীবাণু পাঠিয়ে হোমসকে জানে মেরে ফেলার ফন্দি এঁটেছিল, সে রোগের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রাচ্যদেশে। সেখানেই এ ব্যাপারে দীক্ষা নিয়ে রীতিমতো ওস্তাদ হয়ে ওঠে কালভার্টন। রোগটা এমন, যা কেবল প্রাচ্যদেশীয়দের হওয়াই স্বাভাবিক। সে কারণেই হোমস যখন ওয়াটসনকে দিয়ে স্মিথের কাছে খবর পাঠায়, তখন হোমসের রোগাক্রান্ত হওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য হোমস ওয়াটসনকে বলতে বলে, 'জাহাজঘাটায় প্রাচ্যদেশীয় কুলিদের মধ্যে একটা তদন্ত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রোগটা বাঁধিয়েছে।'

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ অনুষঙ্গ হিসাবে যেসব কাহিনিতে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও এরকম নির্ভেজাল সাধারণীকরণ দেখা যায়। *সাইন অব ফোরে* সিপাহি বিদ্রোহের বর্ণনা এরকম: 'আচমকা একদিন শুরু হয়ে গেল সিপাহী বিদ্রোহ। শান্ত নিরীহ দেশটা হয়ে উঠল উত্তাল। দুলক্ষ কালো পিশাচ যেন রক্তের খেলায় মেতে উঠল।' 'ক্রুকেড ম্যান' গল্পের কর্নেল বার্কলে সিপাহি যুদ্ধের পর অফিসার হন। পরে রেজিমেন্টের সর্বময় কর্তা। দেশে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু পরে সিপাহী যুদ্ধকালীন ভারতে তার বড় কুকর্ম ফাঁস হয়। তাতেই আখেরে তার মৃত্যু হয়। প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরি উডকে সে কৌশলে ধরিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহী সেনাদের হাতে। 'কালা মানুষদের সঙ্গে' তাকে সহ্য করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন। এর ফলে '১১৭ নং পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে স্মার্ট মানুষ' উড পরিণত হয় এক ভয়ালদর্শন কুৎসিৎ মানুষে।

লক্ষণীয়, ১৮৫৭-র ওই মহাবিদ্রোহ অঙ্কিত হয়েছে নিরঙ্কুশভাবে ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং বর্ণনাগুলো ইংল্যান্ডের সংখ্যাতীত পত্রিকা-রিপোর্ট, বিবরণী, গবেষণা, গল্প-উপন্যাস, চিত্রকলা ইত্যাদির হুবহু অনুরণন বৈ নয়। বস্তুত, মিউটিনির সংবাদ আর ভাষ্য ইংল্যান্ডে যে পরিমাণে পুনরুৎপাদিত হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সম্ভবত তার সাথে তুলনীয় আর কোনো ঘটনা নাই (Jasnowska 2015 : 207-29)। হোমস সিরিজ অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে সেই প্রভাবশালী উপস্থাপনারই পুনরুৎপাদন করেছে। এ উপস্থাপনার আরেক বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইংরেজ চরিত্রগুলো ব্যক্তি-স্বরূপে উপস্থাপিত হলেও 'কালা আদমি'রা এসেছে সামষ্টিকভাবে– নামহীন মানুষগুলো কেবল কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে, যা ওই মানুষদের গোত্রগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইতোমধ্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সে কারণেই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো পরিচয় বা কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

বরং কোনান ডয়েল মানিয়ে নেয়ার মতো করে কৈফিয়ত দেবার দরকার বোধ করেছেন ওই ইংরেজ চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে উপনিবেশের মানুষ-মাটি-সংস্কৃতি কোনো চরিত্রের ইংরেজিয়ানা ধ্বংস করে তাকে অপরাধপ্রবণ করে তুলেছে। এ ধরনের কাহিনিগুলোর মধ্যে 'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকল ব্যান্ড' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটিকে উপনিবেশ-অধ্যয়নের জন্য ভাষ্যকারেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন এই কারণে যে, এখানে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক ব্রিটিশ পুরুষকে অপরাধী হিসাবে দেখানো হয়েছে, যার অপরাধ-প্রবণতার মধ্যে ভারতে বসবাসের অভিজ্ঞতা খুব গভীর প্রভাব ফেলেছে। রয়লট ইংল্যান্ডের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের সন্তান। ডাক্তার হিসাবে উপনিবেশিত ভারতে কাজ করার মধ্য দিয়ে সে তার পতনশীল আভিজাত্য উদ্ধার করতে পারত, যেমনটি সিরিজের আরো বহু চরিত্র করেছে। কিন্তু ভারতের মতো একটি 'অসভ্য' অঞ্চলে বসতি তাকে কেবল শরীরে-মনে 'প্রাচ্যায়িত'ই করেনি, ভয়ঙ্করভাবে

অপরাধ-প্রবণ করেছে, এবং এমনভাবে ব্যক্তিত্বহীন করেছে যে সে এখন স্ত্রীর অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য সৎ-মেয়েদের হত্যার বন্দোবস্ত করেছে। রয়লটের অপরাধের ধরনও খুবই ভারতীয় চিহ্নবাহী; তদুপরি এর সাথে যুক্ত আছে জিপসিদের দল, যারা ব্রিটিশ ভূখণ্ডে স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যেই জেঁকে-বসা নানান ধরনের 'অপরে'র নিখুঁত প্রতিনিধি (Thomas 1994a : 135)।

অপরাধপ্রবণ রয়লটের স্নায়বিক বদলটাও ঘটেছে ভারতে (Favor 2000), এবং এভাবে মূল ভূখণ্ডে সে পরিণত হয়েছে 'আগন্তুক না হয়েও আগন্তুকে', যাকে ব্রিটিশ ভদ্রলোকদের সাথে আর কিছুতেই মেলানো যায় না। উনিশ শতকের শেষভাবে ইউরোপে অপরাধ-নৃবিদ্যার দৌলতে অপরাধ ও অপরাধীর সাথে কলোনির সংশ্লিষ্টতা যেভাবে বিজ্ঞানের বেশে বিকশিত হয়েছিল, তার বরাত দিয়ে বলা যায়, রয়লট চরিত্রটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। *এলিস দ্য ক্রিমিনাল* (১৮৯০) বইতে হ্যাভলক 'মোরাল সেনসিভিলিটি' নামের একটা অধ্যায় যোগ করেছেন, যেখানে তিনি উপনিবেশিত ভারতে উদ্দেশ্যহীন, অকারণ ও যুক্তিহীন খুনের বেশকিছু উদাহরণ জড়ো করেছেন। (উদ্ধৃত, Thomas 1994a: 143)। অনায়াসেই এর সাথে মেলানো যায় এ তথ্য যে, রয়লট ভারতে স্রেফ সন্দেহবশত তার বাটলারকে পিটিয়ে মেরেছিল। বস্তুত, 'India brought out the worst in Roylott and propelled him back to England tc wreak havoc there' (Favor 1995 : 91)। আর এভাবে রয়লটের মধ্যেও এক টুকরা ভারতকেই শেষ পর্যন্ত আমরা মঞ্চস্থ হতে দেখি।

হোমস সিরিজে আর্থার কোনান ডয়েলের জগৎদৃষ্টি অনেকাংশেই প্রকৃতিবাদী ব ন্যাচারালিস্ট। মানুষকে তার প্রতিবেশের সাপেক্ষে নিঃশেষে ব্যাখ্যা করা যায়; এবং যে পেশা বা প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ জীবনযাপন করে, তার নিয়ন্ত্রণেই মানুষের শারীরিব বৈশিষ্ট্য ও মানসিক গড়ন রূপলাভ করে– এটাই হোমস সিরিজের অন্যতম নিয়ামব মানব-ভাবনা। সাহিত্যজগতে এরকম প্রকৃতিবাদী ভাবনার উত্তুঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল ১৮৭০-এর দশকে– এ কথা মনে রাখলে হোমস-কাহিনিগুলোর প্রাগুক্ত জীবনদৃষ্টির ব্যাখ্যা খুব সহজেই পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে জরুরি কথাটা হল, এ জীবনদৃষ্টির মধ্যে বড় ধরনের যান্ত্রিকতা আছে এবং মানুষের যে বর্ণাঢ্যতা ও রহস্যময়তা, তা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ জীবনদৃষ্টির বিস্তর সীমাবদ্ধতাও আছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা কলোনিয়াল শাসনের জন্য খুবই উপযোগী একদিকে এ দৃষ্টিভঙ্গি 'অপরায়ণে'র বিরাট সুযোগ করে দেয় – ভিন্ন শিক্ষা ও প্রতিবেশের কারণে মানুষকে খুব সহজেই ভিন্ন হিসাবে চিত্রিত-চিহ্নিত করা সম্ভব হয় অন্যদিকে কিছু মানুষের তুলনায় অন্য কিছু মানুষকে সংশয়াতীতভাবে 'উন্নত' ও 'কর্তৃস্থানীয়' ভাববার যাবতীয় নৈতিক-যৌক্তিক ভিত্তি গড়ে দেয় এ জীবনদৃষ্টি। হোমস-কাহিনিমালার এত এত 'সত্য' আর 'নৈতিকতা'র ভিড়ে সাম্রাজ্যভুক্ত মানুষদের শাসন

ও শোষণজনিত কোনোপ্রকার হাহাকার যে উচ্চারিত হয় নাই, তার মূলে আছে আসলে মানুষ সম্পর্কে ওই একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গি। উল্টা দিক থেকে হয়ত এও বলা যাবে, ইউরোপে ওই দশকগুলোতে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যে খুব জোরালোভাবে বিকশিত হয়েছিল, তার পেছনে কলোনি-প্রধান এক দুনিয়ার অভিজ্ঞতা গভীরভাবে কাজ করে গেছে। যে 'সত্য', যে 'নৈতিকতা', আর যে 'মূল্যবোধ' পুরো সিরিজের অন্তর্নিহিত গতি ও প্রকৃতি চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার উৎসও ওই উপনিবেশক-উপনিবেশিতে বিভাজিত দুনিয়া।

৬ উপনিবেশকের যুক্তি : নৈতিক-দার্শনিক দিক

শার্লক হোমসকে আমরা প্রথম আবিষ্কার করি হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে। পরেও কর্মতৎপরতায় বা পেশা-সম্পর্কিত গবেষণায় তাকে পুরো সিরিজে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যক্ষবাদী, উপযোগবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী প্রবণতার সমন্বয় ঘটেছে। তার জগৎ বিশুদ্ধ বিশেষজ্ঞতার এবং পেশাদারির জগৎ। হোমস পাওনাদারকে 'গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই' পাই-পয়সা বুঝিয়ে দেন; আর নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতেও বিলম্ব করেন না। কিন্তু এসব অতি-নিরাবেগ কর্মকাণ্ডের মধ্যে উচ্চমার্গীয় নীতি ও নৈতিকতার এক জোরালো নিয়ন্ত্রণ তার সমস্ত গতিবিধি ও সিদ্ধান্তে সক্রিয় থাকে।

এ নীতি-নৈতিকতার প্রাথমিক রূপটি নিতান্তই কেজো– তদন্তের সহায়ক হওয়া কিংবা 'উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ে কিছু অসাধুতা করা যায়' ধরনের। 'এ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া' গল্পে যেমন। রাজার ছবি উদ্ধার করার জন্য আইরিন অ্যাডলারের ঘরে ঢুকতে হবে হোমসকে। কিন্তু অভিযানে ঝুঁকি আছে। কাজটা বেআইনি এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বিস্তর। ওয়াটসন বলে, 'উদ্দেশ্য যখন মহৎ, তখন আর চিন্তার কি।' খেতে খেতে শার্লক হোমসও সায় দেয়, 'উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ'। এরকম ঘটেছে বেশকিছু কাহিনিতে। তবে ন্যায়ের প্রশ্নে নিখিল বিধির বরাত দেয়া হয়েছে আরো ঢের বেশি গল্পে। 'রেসিডেন্ট পেসেন্ট' গল্পে ন্যায়-বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ওপরওয়ালার বিচার মানুষের তৈরি কানুনের চেয়েও অমোঘ।' 'গ্রীক ইনটারপ্রিটার' গল্পে হোমসের হাত গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অপরাধী সম্পর্কে ওয়াটসনের মন্তব্য : 'আমাদের হাত ফসকালেও এই মামলার দুই কুচক্রীর হিসেব কিন্তু মিলেছিল অন্যভাবে।'

হোমস সিরিজের প্রায় সিকি-ভাগ কাহিনি অপরাধ ও শাস্তির প্রচলিত ধারার পরিবর্তে অন্য ধরনের ন্যায়ের বরাতে সমাপ্ত হয়েছে, যাকে ভাষ্যকারেরা 'হোমসিয়ান জাস্টিস' বলে উল্লেখ করেছেন। এর একাংশ নিঃসন্দেহে কাহিনিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য এবং বিকল্পের সম্ভাবনা তৈরির জন্য পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ন্যায়ের বাইরে যেসব প্রস্তাবনা এ সিরিজে পাওয়া যায়, তার বেশিরভাগ প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সহোদর। বা বলা যায়, খ্রিস্টীয়

নৈতিকতার বরাতেই তা সম্পন্ন হয়েছে। আসামি-ফরিয়াদি ও বিচারক– সর্বমহলেই এ নৈতিকতার প্রাঞ্জল স্বীকৃতি দেখা যায়। কিন্তু এটুকু বললে আসলে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। জরুরি তথ্যটি হল, হোমস সিরিজে ব্যতিক্রমহীনভাবে ওই নীতি ও ন্যায়বিচার কেবল খ্রিস্টান ইউরোপীয় তথা ইংরেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত হয়েছে। এমন এক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ বর্গের বহিস্থরা এ বিবেচনার আওতায় আসারই যোগ্য নয়।

এ স্টাডি ইন স্কারলেট কাহিনির আমেরিকা-খণ্ডে জন ফেরিয়ার, লুসি ফেরিয়ার ও জেফারসন হোপের একটা ত্রিবেণী তৈরি হয়েছিল স্রেফ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হিসাবে। মর্মোনরা ফেরিয়ার ও লুসিকে মরুপ্রায় ভূমিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। নিজেদের সমপরিমাণ ভূমি দিয়েছিল চাষাবাদের জন্য। ফেরিয়ার মর্মোনদের ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃতও হয়েছিল। কিন্তু নিজের খ্রিস্টধর্মীয় 'উঁচু' জীবনধারার তুলনায় মর্মোনদের 'বর্বর' রেওয়াজকে সে কখনোই মন থেকে মেনে নেয়নি। বিশেষত লুসির বিয়ের সময় হলে সে সিদ্ধান্ত নেয়, মর্মোনদের কোনো ঘরে লুসিকে দেবে না। ব্যক্তিত্বহীন অনেকগুলো সপত্নীর সাথে লুসি ঘর করবে– এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বস্তুত, নিজের অস্তিত্বের জন্য মর্মোনদের কাছে কোনো ঋণ স্বীকার করার দরকার ফেরিয়ার বোধ করে নাই। লুসি পাঁচ বছর বয়স থেকে বার বছর ধরে এ মুলুকে এদেরই বাস্তবতা ও সংস্কৃতিতে বড় হয়ে কিভাবে এদের থেকে এত আলাদা থেকে গেল, তাও কোথাও বলা হয় নাই। স্পষ্টতই মর্মোনদের 'বর্বরতা'র বিপরীতে খ্রিস্টধর্মীয় 'সভ্যতা'র চিত্রই এখানে একরোখাভাবে ফুটে উঠেছে। পুরো গল্পে 'অপরাধ ও শাস্তি'র ধরনও নির্ধারিত হয়েছে ওই ধারণার আলোকে। মর্মোন চরিত্র দুটি শুধু অতীতে নয়, মৃত্যুকালীন আচরণেও যথেষ্ট অসংযত। অন্যদিকে প্রতিশোধকামী দৃঢ়চেতা জেফারসন যেন 'ঈশ্বরের ডাক পেয়ে' জাগতিক শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

ড্রেবার ও স্ট্যানজারসনের জন্য জেফারসন যে-বিচারপদ্ধতি স্থির করেছিল, তার ভাষাটাও কৌতূহল-উদ্দীপক। কৌটায় দুরকম বড়ি রাখা ছিল– বিষাক্ত ও নির্বিষ। কৌটা খুলে সে ড্রেবারকে বড়ি বেছে নিতে বলে। পরে বড়ি গিলতে বাধ্য করে। সে নিজেও খেয়েছিল একটা। দেখা গেল, তারটা ছিল নির্বিষ, কিন্তু ড্রেবরের বড়িটা বিষাক্ত। তার ভাষায় : 'ভগবানের বিচার আছে কিনা একবার দেখ। দেরিতে হলেও ন্যায়বিচার তিনি করবেন।' স্ট্যানজারসনের ক্ষেত্রে তার এ প্রক্রিয়া খাটে নাই। তাকে ছুরির আঘাতে মারতে হয়েছে। কিন্তু হোমসসহ পুলিশদলের কাছে তার প্রতিক্রিয়া : 'আমি জানি– বড়ি খেলেও ও বাঁচত না। ভগবানের বিচারে কখনো ভুল হয় না।'

পুরো সিরিজে ন্যায়বিচারের ধারণার এরকম একটা গভীর খ্রিস্টীয় আবহ আছে। জাগতিক বিচারব্যবস্থা ও আইন-যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে না, এ কথা

বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কিছুতেই আইনের বা বিচারকাঠামোর সমালোচনা নয়। মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, তাতো ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রকাঠামোয় হচ্ছেই। তাহলে অনিশ্চয়তার অংশটুকু তুলনামূলক বৃহত্তর ও মহত্তর ন্যায়ের দিকে নির্দেশ করে, যে ন্যায়ের এখতিয়ার কেবল 'সভ্য' মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ধারণা খোদ শার্লক হোমসের চরিত্রায়ণ এবং তার মহত্ত্বেরও অংশ।

সাইন অব ফোরে জোনাথন স্মল বলেছে, তার জন্য ন্যায়বিচারের বন্দোবস্ত করা আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা শেষ পর্যন্ত সুবিধাভোগীদের জিতই নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে, শার্লক হোমসের ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজেই তার নজর কাড়ে। তাকে তার 'ভালো মানুষ' বলে মনে হয়। কারণ, ন্যায়কে তুলনামূলক বড় আবহে দেখবার এক সহজাত ক্ষমতা সে হোমসের মধ্যে দেখতে পায়। হোমসকে আমরা অনবরত দেখব, প্রচলিত বিচারব্যবস্থার বাইরে গিয়ে নিজের কল্পিত বা কাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করছে। বিদ্যমান আইনে 'অপরাধী' হিসাবে গণ্য হয়, এমন অনেককে ছেড়ে দিচ্ছে। বহুক্ষেত্রে অপরাধীর অপমৃত্যু বা চূড়ান্ত নাকাল হওয়াকে বর্ণনা করছে ঈশ্বরের বিচার বলে।

উপনিবেশিত দেশীয়দের সাপেক্ষে ভদ্রলোক-ইংরেজ তো বটেই, এমনকি জোনাথন স্মলের মতো দাগি তরুণের যে-নির্মল চরিত্র কোনান ডয়েল রচনা করেছেন, তা বেশ কৌতুককর। ধনদৌলত চুরির এবং নরহত্যার যাবতীয় পরিকল্পনা করেছে ভারতীয়রা। ভারতীয়দের তালিকায় হিন্দু ও মুসলমান নাম রেখে লেখক এক ধরনের সাম্যের বন্দোবস্ত করেছেন। জোনাথন কেবল অপারগ হয়ে এবং জান-বাঁচানোর জন্য পরিকল্পনায় সায় দিয়েছে। শার্লক হোমস ও অন্যদের সামনে তার কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিটাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার সক্রিয় অংশগ্রহণ যতটা, তার সবটারই সে কোনো না কোনো কৈফিয়ত জড়ো করেছে। এবং তাতে লেখক, হোমস ও অন্য শ্রোতাদের বিলক্ষণ সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে।

পুরো ব্যাপারটি উপনিবেশকের নৈতিকতার সাথে খুব গভীরভাবে সম্পর্কিত, উপনিবেশিতের চৌহদ্দিতে যার ছায়া কস্মিনকালেও পড়েনি। *সাইন অব ফোর* থেকেই উদাহরণ দেয়া যাক। আন্দামানে বন্দি অবস্থায় মেজর শোল্টোকে লুকিয়ে রাখা ধনরত্নের হদিস দিচ্ছিল জোনাথন স্মল। তার বর্ণনার একাংশ এরকম : 'আসল মালিককে দেশছাড়া করেছে সরকার। কাজেই যে আগে যেতে পারবে সম্পদটা তারই হবে।' 'আসল মালিক' বলতে যে-দেশীয় রাজার সম্পদ জোনাথন স্মলসহ চারজন কুক্ষিগত করেছিল, তাকেই বোঝানো হয়েছে। বিদ্রোহের জেরে তাকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাসন দেয়ার কারণে সম্পদের উপর তার মালিকানা রদ হয়েছে কি না, সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন। জোনাথন কিন্তু সিদ্ধান্তটা নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতেই নিচ্ছে। দেশছাড়া হওয়ার কারণে, তার মতে, মূল মালিকের মালিকানা আর অটুট নাই। এ

সম্পদের অবস্থা এখন দুর্গম প্রান্তরে মালিকানাহীনভাবে পড়ে থাকা হীরা-জহরতের মতো। যে বিপদ ঠেলে সংগ্রহ করতে পারবে সেই তার মালিক হবে। সহজেই বোঝা যায়, নীতি ও নৈতিকতার এ গড়নই কলোনিয়াল অভিযান ও সম্পদ-সংগ্রহের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। লেখক, শ্রোতা, শার্লক হোমস নির্বিশেষে সকলেই এ নীতি ও নৈতিকতায় সমর্থন জুগিয়েছে।

হোমস সিরিজের এ নীতি-নৈতিকতা কী ভয়ঙ্কর পক্ষপাতদুষ্ট, একই উপন্যাস থেকে আরেকটা উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। জোনাথন স্মল আন্দামান থেকে পালানোর ব্যবস্থা করছিল। তার জন্য 'বর্বর-জংলি' টোঙ্গো নৌকা নিয়ে ঘাটে প্রস্তুত। ওই ঘাটে সাধারণত কোনো পাহারা থাকে না; কিন্তু সেদিন ছিল। আর কেউ নয়, জোনাথন স্মলের পুরনো শত্রু। তাকে মেরে নৌকায় উঠতে হল। মেরে ফেলার কথা বলার আগে বলা হল, 'লোকটা পাঠান, পাজির পা-ঝাড়া। আমাকে দুচক্ষে দেখতে পেত না। সুযোগ পেলেই অপমান করত।' বাস। শুধু এ কথার ভিত্তিতে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন উঠল না।

নীতি ও নৈতিকতা এবং এমনকি আইন-কানুনের ক্ষেত্রেও উপনিবেশক-উপনিবেশিতের পরিষ্কার ফারাক রক্ষিত হয়েছে হোমস সিরিজে। তবে তার আগে বলতে হয়েছে, এরা বর্বর, বা অন্তত লোক সুবিধার নয়। তাতেই পরবর্তী আয়োজনগুলো বৈধ হয়েছে। বলা যায়, হোমস সিরিজে কোনান ডয়েল কাজ করেছেন এমন এক নৈতিকতার ভিত্তিতে, দেশপ্রেম, জাতীয়তা, আচরিত ধর্ম কিংবা প্রত্যক্ষ নানা বাস্তবতার চেয়েও যা অনেক বড় ব্যাপার। আইনের মধ্য দিয়ে যে ন্যায়-প্রতিষ্ঠা হয়, বা যে নৈতিকতার চর্চা হয়, তার অধীনে 'অপর'কে নেয়া চলে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিতে হয়। কিন্তু এ 'বড়' নৈতিকতা কেবল সংস্কৃত, সভ্য আর আলোকিত মানুষদেরই এখতিয়ার। চূড়ান্ত অপরায়ণের জন্য এরচেয়ে বড় মওকা আর হতে পারে না।

কেবল মানুষ নয়, উপনিবেশিত ভূমিও সবসময় থেকে গেছে স্বীকৃত নৈতিক বিবেচনার বাইরে। হোমস সিরিজে উপনিবেশিত ভূমিতে উপনিবেশক পক্ষের কোনো অন্যায়ই অন্যায় বলে সাব্যস্ত হয়নি। 'বসকোম ভ্যালী মিস্ট্রী' গল্প থেকে উদাহরণ দেয়া যাক। এ গল্পের অস্ট্রেলিয়া-ফেরত জন টার্নার 'বসকোম ভ্যালীর সবচেয়ে বড় জায়গীরদার'। পরে তার অনুগ্রহে প্রতিবেশী হয়ে থাকতে আসা চার্লস ম্যাকার্থিও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী ছিল। জন টার্নার টাকা কামিয়েছে লুটতরাজ করে। পরে সাধু হয়ে ফেরে ইংল্যান্ডে। জায়গা-জমি কিনে বনেদি জীবনযাপন শুরু করে। তার ডাকাতি ও খুনের কথা জানত ম্যাকার্থি। সে টার্নারকে ভয় দেখিয়ে নিজের আখের গোছায়, আর পরিণতিতে খুন হয়। জরুরি বিবেচ্য হল, ম্যাকার্থিকে খুন করার দায় থেকে হোমস টার্নারকে রেয়াত দেয় এ যুক্তিতে যে, তার বিচারের ভার উপরওয়ালাই নেবেন। কিন্তু সে যে অস্ট্রেলিয়ায় চার-

চারটি খুনের স্বীকারোক্তি দিল, আর বনেদি জীবনের উৎস হিসাবে সোনা-লুটের কথা জানাল, হোমস বা ওয়াটসন তা নিয়ে একটা কথাও বলে নাই।

দুটি সিদ্ধান্ত– বিপুল নীতি-নৈতিকতা আর আইনি সওয়ালের মাঝ থেকে– আমরা সহজেই নিতে পারি। এক. কলোনিতে সংঘটিত যেসব অপরাধ কোনোভাবেই মূল ভূখণ্ডে সঞ্চারিত হয়নি, সেগুলো ওই নীতি-নৈতিকতা ও আইনের আওতায় বিবেচ্য হয়নি। দুই. ইংল্যান্ডের আইন ও নৈতিকতা-রক্ষক শার্লক হোমসের কাছে টার্নারই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে-ই আসলে ভবিষ্যৎ ইংল্যান্ডের নির্মাতা। ম্যাকার্থির মৃত্যুর শাস্তিবিধানটা এখানে হোমসের কাছে একেবারেই কল্কে পায় নাই। বরং আগ বাড়িয়ে তিনি, প্রায় কোনোরকম কাকুতি-মিনতি করার আগেই, টার্নারের রেয়াতের বন্দোবস্ত করে রাখলেন।

নীতি ও নৈতিকতার এরকম নির্বাচনে হোমস সিরিজ কখনোই ভুল করে নাই। উনিশ শতকের শেষাংশের আরো কোনো কোনো রচনার মতো এ সিরিজও একদিকে 'বর্ণবাদী, জাতিবাদী ও লিঙ্গীয় বহু সংস্কারকে বৈজ্ঞানিক ন্যায্যতার ছদ্মবেশে জায়েজ করেছে, আর এভাবে নব্য সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ন্যায্যতা প্রশস্ত করেছে' (Thomas 1994b: 659); অন্যদিকে, এক দেশ-কাল-অতিক্রমী ন্যায় ও নৈতিকতার বোধ উচ্চকিত করে, এবং সেই বোধের সমস্ত হিস্যা সম্পূর্ণরূপে উপনিবেশকের কব্জায় রেখে উপনিবেশায়নের গভীরতর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

৭ উপসংহার

উপনিবেশ বা প্রাচ্যের উপকরণ-যে হোমস সিরিজে কেবল অপরায়ণ বা বিরোধ-সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তা নয়। বস্তুত বিরোধ-সূত্রে বা সচেতন অপরায়ণের নিমিত্তে ব্যবহৃত না-হওয়াটাই আরো বেশি করে প্রমাণ করে, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণভাবে ওই সমাজে ও সময়ে স্বাভাবিক বলে গণ্য হত। 'অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডেভিলস্ ফুট' গল্পে আমরা 'শয়তানের পা' নামের আফ্রিকান বিষের খবর পাই। এই বিশেষ ধরনের বিষ গল্পটিতে ব্যবহৃত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। গল্পে নতুনত্ব সঞ্চার করা এবং অচেনা-অজানার রোমাঞ্চ আনয়ন করার বাইরে আইনি মারপ্যাঁচ তৈরি করাও অন্যতম গুরুতর কারণ। এ বিষ ইংল্যান্ডের সমাজে পরিচিত নয়। কাজেই এর ডাক্তারি বা আইনি পরীক্ষার দিকও উন্মোচিত নয়। এ অবস্থায় চতুর অপরাধীরা তাদের উদ্দেশ্য-হাসিলের প্রয়োজনে এ বিষের প্রয়োগ করবে, এটাই স্বাভাবিক। গল্পের দিক থেকে এতে রহস্য-বৃদ্ধি ছাড়াও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। বিদ্যমান পুলিশি বা আইনি বা ডাক্তারি শাস্ত্রের আওতায় পড়ে না, এমন এক রহস্যের মুখোমুখি হয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দার তেলেসমাতি প্রদর্শনের সুযোগ বাড়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইগজোটিক', পুরো ব্যাপারটি তার সাথে সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য, এ সিরিজে এটা বারবার ঘটেছে।

তাছাড়া, যা কিছু ইংরেজিয়ানা বা পশ্চিমা মানের সাথে খাপ খায় না, তার সবকিছুর ব্যাপারেও হোমস সিরিজের স্পষ্ট আপত্তি বা অস্বস্তি দেখা গেছে। লন্ডনের গরিব মানুষ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুরো সিরিজে গরিব মানুষের বর্ণনা খুবই যাচ্ছেতাই ধরনের। তারা গরিব মানুষ, খারাপভাবে থাকে, নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়– এটুকুই বর্ণনা। তাদের অল্প কিছু বখশিশ দিয়ে বশ করা যায়– এটাও বারবার বলা হয়েছে। 'এ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া' গল্পে সহিসের যে বর্ণনা আছে, তা নিঃসন্দেহে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রকট প্রকাশ। 'ম্যান উইথ দ্য টুইসটেড লিপ' গল্পের শুরুতে গরিব মানুষের নেশার আড্ডা এবং ভিখিরি-স্থানীয়দের আখড়ার এক দীর্ঘ বিবরণ আছে। এ বর্ণনাও রীতিমতো ভয়াবহ।

এ দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত ভিক্টোরীয় জমানার সমাজ-নৈতিকতা এবং জগৎদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাস্তবতার যে বহুমাত্রিক প্রতিফলন এ কাহিনিমালায় পাওয়া যায়, তাকে এই 'স্বাভাবিক' জীবন ও জগৎদৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঔপনিবেশিক সম্পর্ক সবসময়ই মানব-সম্পর্ক ও ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশেষ রূপ। হোমস সিরিজে নানা কারণে সেই রূপের প্রকাশ সমকালীন অন্য বেশিরভাগ টেক্সটের চেয়ে গভীর। এসব কাহিনি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়, উনিশ শতকের শেষাংশের ইংরেজ মধ্যবিত্তের বাস্তবতা বিশেষভাবে উপনিবেশময়– তার ভূগোল-কল্পনা, তার জনমিতি, তার আপন-পর ইত্যাদি সবকিছু গঠিত-নির্ণীত-সক্রিয় হয়েছে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার ভিত্তিতে। বসতি-কলোনি, অ-বসতি কলোনি, প্রাক্তন ও বর্তমান কলোনি কিংবা পুরোপুরি চেনা হয়ে ওঠেনি এমন কলোনির সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক এবং কলোনিভেদে কেন্দ্রের বিচিত্র মনোভাব কাহিনিগুলোতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নানা ব্যঞ্জনা তৈরি করেছে। খোদ ইংল্যান্ডের নগর আর গ্রামজীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে কলোনি-ফেরত মানুষেরা, এবং তাদের বেশুমার টাকা-পয়সা। শার্লক হোমস রচনাবলি সাক্ষ্য দেয়, উপনিবেশ ছিল ইংল্যান্ডের জন্য এমন এক বাস্তবতা যাকে বশ ও পোষ মানিয়ে, যার সাথে ক্ষমতা-সম্পর্কের দুস্তর ব্যবধান রচনা করে, যার ছোঁয়াচ যথাসম্ভব এড়িয়ে এক দূরবর্তী অস্তিত্ব হিসাবে তার সাথে মেলামেশা করতে হয়। তাকে বানাতে হয় অনিবার্য 'অপর'। কাহিনিগুলোতে ইংল্যান্ডের তাবত অস্তিত্বের জন্য উপনিবেশের আবশ্যিক উপস্থিতির প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, কিন্তু একবারের জন্যও তার স্বীকৃতি নেই।

হোমস সিরিজ কাজ করেছে প্রধানত অপরাধ নিয়ে। অপরাধের সাথে অপরাধী চিহ্নিতকরণের মতো অপরায়ণ যুক্ত, আর শাস্তি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাও এর সাথে সম্পর্কিত। প্রধানত এ কারণেই উপনিবেশ-অধ্যয়নের জন্য এ সিরিজ খুব জুতসই হয়ে উঠেছে। কাহিনিগুলোতে অপরাধ ও অপরাধপ্রবণতার সাথে উপনিবেশ সরাসরি সম্পর্কিত– যদি মানুষ-সূত্রে নাও হয়, উপনিবেশিত ভূমি কিংবা সংস্কৃতি এবং এমনকি প্রকৃতিও অপরাধের অঙ্গ হয়েছে। অন্য অনেক গোয়েন্দাকাহিনির

তুলনায় হোমস সিরিজে ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতার তুলনামূলক প্রগাঢ়তা আছে। তাতে অপরায়ণের সুযোগ আরো গভীর হয়েছে। কারণ, এসব বিবেচনার ক্ষেত্রে কোনান ডয়েল উপনিবেশক আর উপনিবেশিতে রাখঢাকহীন ফারাক করেছেন। ভালো-মন্দের প্রায় সুস্পষ্ট বিভাজনের মধ্যে উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের অবস্থানে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয়নি।

শার্লক হোমসের নজিরবিহীন জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামষ্টিক অচেতনকে চরিত্রটি অসামান্য সাফল্যের সাথে ধারণ করতে পেরেছে। একই প্রক্রিয়ায় সিরিজটির মধ্য দিয়ে ওই শ্রেণির সামষ্টিক মনোজগতে সমধর্মী ভাবাদর্শের পুনরুৎপাদনও ঘটেছে। সমসাময়িক 'বিজ্ঞানে'র জ্ঞান নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারায় জনগ্রাহ্য হওয়ার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক সম্পর্ক রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সিরিজটি অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। হোমস সিরিজ তার প্রকাশিত স্তরে এক প্রস্তুত ও সামর্থ্যবান উপনিবেশককে হাজির করে; গোপন স্তরগুলোতে পাওয়া যায় একদিকে উপনিবেশিতের অপরতাময় উপস্থাপন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিক প্রকাশ।

টীকা

এ লেখায় মূল রচনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নচিকেতা ঘোষ অনূদিত *স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের শার্লক হোমস রচনা সমগ্র* (২য় সংস্করণ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৯২)। অনুবাদকের মতো বর্তমান প্রবন্ধেও ইংরেজি নামগুলো অপরিবর্তিত রাখা হল, যেন ইংরেজি মূল সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হয়। তাছাড়া হোমস সিরিজের অসংখ্য ইংরেজি সংস্করণ এবং এমনকি বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়– এ আন্দাজ থেকে প্রাসঙ্গিক সব ক্ষেত্রে উপন্যাস বা গল্পের নাম উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়নি।

সহায়কপঞ্জি

Allan, Janice M. and Pittard, Christopher, (eds.), 2019. *The Cambridge Companion to Sherlock Holmes*, University of Portsmouth, Cambridge University Press, Cambridge.

Berberich, Christine 2019. 'Englishness and Rural England'. In *The Cambridge Companion to Sherlock Holmes*, Edited by Janice M. Allan and Christopher Pittard, University of Portsmouth, Cambridge University Press, Cambridge.

Brunsdale, Mitzi M. 2010. *Icons of Mystery and Crime Detection: From Sleuths to Superheroes*, volume 1. Greenwood, California.

Favor, Lesli J. 1995. *Interactions between texts, illustrations, and readers: the empiricist, imperialist narratives and polemics of Sir Arthur Conan Doyle*. Doctor of Philosophy (English), University of North Texas, USA.

Favor, Lesli J. 2000. 'The Foreign and the Female in Arthur Conan Doyle: Beneath the Candy Coating', *English Literature in Transition 1880-1920*. 43(4): 398-409, DOI:10.1353/elt.2010.0828

Fluet, Lisa J. 1998. '"Distinct Vocations" and the Anglo-Indian in Sherlock Holmes' England'.

Victorian Review, Volume 24, Number 2, Johns Hopkins University Press, *DOI: For additional information about this article* [Access provided at 11 Nov 2021 17:09 GMT from University of Dhaka] *https://doi.org/10.1353/vcr.1998.0020.* pp. 130-162.

Gillespie, Michael Allen & Harpham, John Samuel, 2011. 'Sherlock Holmes, Crime, and The Anxieties of Globalization, *Critical Review: A Journal of Politics and Society*, 23:4, pp. 449-474.

Jasnowska, Agnieszka 2015. 'Make Yourself at Holmes: Victorian Culture, Sherlock Holmes and the Vicissitudes of Identity'. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Leeds, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies.

Karschay, Stephan 2019. 'Doyle and the Criminal Body', in *The Cambridge Companion to Sherlock Holmes*, Edited by Janice M. Allan and Christopher Pittard, University of Portsmouth, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 96-110.

Reitz, Caroline, 2019. 'The Empires of A Study in Scarlet and The Sign of Four', in *The Cambridge Companion to Sherlock Holmes*, Edited by Janice M. Allan and Christopher Pittard, University of Portsmouth, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 127-139.

Thomas, Ronald R. 1994a. 'Reevaluating Identity in the 189Os: The Rise of the New Imperialism and the Eyes of the New Detective.' *Transforming Genres: New Approaches to British Fiction of the 1890s*. Eds. Nikki Lee Manos and Meri-Jane Rochelson. St Martin's P, New York, pp. 193-214.

Thomas, Ronald R. 1994b. 'The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology', ELH 61:3, pp. 655–80.

Thompson, Jon, 1993. *Fiction, Crime, and Empire: Clues to Modernity and Postmodernism* University of Illinois Press, Urbana.

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ : উপনিবেশায়ন ও উপনিবেশিকতা

মো. মনিরুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণার্থে প্রতিষ্ঠা করা হলেও কলেজটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন ও বাংলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপান্তরে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলা অঞ্চলে জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন ঘটায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির জটিল ভূমিকা ও ভারতবর্ষের ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের কারণে এর ক্ষমতা-প্রকরণ নির্ণয় করা সহজ ছিল না। যে-কারণে, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকবৃন্দ কলেজটিকে কেন্দ্র করে যে-ধরনের জ্ঞানোৎপাদন করেছেন তা চিন্তার ঔপনিবেশিক কাঠামোকে ছেদ করতে পারেনি। ফলে, বরাবর তা ইউরোকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তেই পর্যবসিত হয়েছে, অথবা তার সরল নেতিকরণ হয়েছে মাত্র। যার দরুন প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক সৃষ্ট উপনিবেশিকতা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। উপনিবেশিকতা রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশবাদের পতনের পরেও জ্ঞানতত্ত্বে তাকে টিকিয়ে রাখে। চিন্তা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ধরন ও ভাষা-প্রকৌশল উপনিবেশিতই থেকে যাবার কারণে ক্ষমতার ঔপনিবেশিক মাতৃকাটি উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তির পরেও অক্ষতই রয়ে যায়। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক চোরাবালি থেকে বেরোবার জন্য প্রয়োজন চিন্তার নতুন কাঠামোর প্রবর্তন, আলোচনার নতুন মাপকাঠি ও পরিভাষা নির্মাণ যা– উপনিবেশায়নের ফলস্বরূপ সৃষ্ট উপনিবেশিকতা নস্যাৎ করে– নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্ব সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখবে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিউপনিবেশয়ান ও লাতিন আমেরিকার বিউপনিবেশিকতার জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পর্কিত চিন্তার কাঠামো পরিবর্তনই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকবৃন্দ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বাংলা গদ্যের উদ্ভবেতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কথা তাঁদের যা দিয়েই শুরু হোক না কেন, মূল কৃতিত্ব আরোপ করেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ওপর। কেরির হাতে ভার দিয়ে ১৮০১ সালের মে মাসে কলেজটিতে খোলা হয় বাংলা বিভাগ, কথা এগিয়েছে এভাবে, নতুন বিভাগের জন্যে চাই পাঠ্যপুস্তক, আর বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব, শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল ও

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

খ্রিষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা রচনার নেতৃত্ব এবং সাধারণভাবে বাংলা গ্রন্থমুদ্রণের কাজ গিয়ে পড়েছে– মুখ্যত : কেরি, ও গৌণত : তাঁর সহকারীদের ওপর। বিবরণ এই কাঠামোতেই নির্মিতি লাভ করেছে। অর্থাৎ, এই পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়েই যেন বাংলা গদ্যের নির্মাণ যুগের আরম্ভ। আর তাই, গদ্যের এই প্রথম পর্বকে 'ফোর্ট উইলিয়মের পর্ব বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-শ্রীরামপুর মিশনের পর্ব' নামেই নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে 'কেরির পর্ব' বললেও নাকি এতে কোনো ভুল ছিল না। (হালদার, ২০১৭ : ২৯০) বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপর্যুক্ত কাঠামোতেই বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ কেউ যোগ করেছেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ 'বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে বাংলা গদ্যের প্রয়োগ করলেও, দুরূহ জটিল বিষয়ের আলোচনাও তাঁরাই করেছিলেন' এবং 'বহু কিছুর চর্চায় এবং কর্ষণে' তাঁদেরই হাতে বাংলা গদ্য যেমন অনেকটা নিশ্চিত পথ ধরতে পেরেছিল, 'তেমনি ভাষার বিকাশপথে বাংলা সাহিত্যের পথও' যে পাকা হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ২০০৬ : ৫৬)

অনেকে আবার শূন্যপুরাণ থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন বাংলা গদ্যের ইতিহাস। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, চণ্ডীদাসের *চৈত্যরূপ প্রাপ্তি* নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার কথা, যেখানে গদ্য-রচনার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বলেছেন, চৈতন্যের প্রিয় পার্শ্বচর রূপগোস্বামীর *কারিকা* ছিলো একটি ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক। উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সেই সময়ের বাংলা গদ্য কতো প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল। কেবল এসবই নয়, তাঁরা দাখিল করেছিলেন বাংলা গদ্যের নমুনাসমূহের এক লম্বা তালিকা। (সেন, ১৩৬৭ [১৯৬০-১৯৬১] : ৬৬১-৬৬৬) বাংলা সাহিত্যে গদ্যের খামতির কথা তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি। তাই, ইংরেজ কর্তৃক বাংলা গদ্যের অনুপস্থিতির যে অভিযোগ ছিল, জাতীয়তাবাদী আবেগে, তার প্রতিবাদস্বরূপ তাঁরা মেলে ধরেছিলেন বাংলা গদ্যের নমুনার অজস্র ভাণ্ডার। ইংরেজদের বাংলাচর্চার সুবাদে, তাদেরই মতামতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, এভাবেই বাংলা গদ্য আলোচনার কয়েকটি ধারার উদ্ভব ঘটে। একটি পক্ষ ইংরেজদের ভূমিকাকেই অগ্রগণ্য বলে দাবি করেছেন, তো অপর পক্ষ জোর দিয়েছেন দেশীয় গদ্যের নিদর্শনসমূহের ওপর; তৃতীয় পক্ষের কাছে আবার বাংলা গদ্যের নির্মাণে ইংরেজদের ভূমিকাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। (ইসলাম, ২০২২ : ১-১১)

হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'এক সময় বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বাঙলা গদ্য সৃষ্টির প্রায় সমস্ত কৃতিত্ব দিতেন তাঁদের [ইংরেজদের]। এখন চলছে তাঁদের কৃতিত্ব অস্বীকারের সময়। বাঙালি সম্ভবত কখনো সত্যের মুখোমুখি হবে না'। (আজাদ, ২০১১ : ৮৪) তবে, সত্যটা যে আসলে কী কিংবা সেই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সড়ক কিন্তু তিনি বাতলে দেননি। তাই কোন পথে গেলে ইতিহাস বোঝাপড়ায় সত্যের দেখা মিলবে– বাংলা গদ্যের ইতিহাস চর্চায়– এই প্রশ্নটি থেকেই গেল। বাড়তি হাজির হলে

আরেকটি প্রশ্ন– ভাষার ইতিহাস কি সেই ভাষা-বলা মানুষের ইতিহাস থেকে আলাদা? অর্থাৎ, কোনো ভাষার ইতিহাসকে কি সেই ভাষা-বলা মানুষের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করা সম্ভব? বাংলা গদ্যচর্চায় ইংরেজদের ভূমিকার পর্যালোচনা কি শুধুমাত্র স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্য দিয়েই ফুরিয়ে যায় কিংবা বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কৃতিত্ব কি কেবল গদ্যালোচনার জমিনেই অন্বেষণ করা যথেষ্ট? এই প্রেক্ষিতে সুমন সাজ্জাদ যুক্ত করেছেন আরও কয়েকটি প্রশ্ন : 'এই কলেজের বিদ্যাচর্চাকে ইতিহাসের ইতিবাচক যোগফল হিসেবে ভাবাই কি চূড়ান্ত? নাকি প্রশ্ন তোলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের যে আধিপত্যবাদী মতাদর্শ সক্রিয় ছিল রাজনৈতিকভাবে, তার সাংস্কৃতিক ও ভাষিক যোজনা ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানে?'। (সাজ্জাদ, ২০১৬ : ২৭৯)

সুমন সাজ্জাদের প্রশ্নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নিয়ে নতুন বোঝাপড়া তৈরির সূত্র নিহিত রয়েছে। সেই সুতা ধরে, এই প্রবন্ধে, অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা থাকবে। উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে গড়া একটি প্রতিষ্ঠানকে সহজেই ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করা গেলেও, আলোচ্য কলেজটির ক্ষেত্রে কিন্তু, বেশকিছু জটিলতাও রয়েছে। যেমন, ভারতীয় কিংবা বাঙালিদের জন্য নয়, কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল শিক্ষানবিশ ইংরেজ কর্মকর্তাদের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাষা-পরিস্থিতি আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অননুরূপ ছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষাসমূহ বিলুপ্ত হওয়ার বদলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা চর্চার পথ আরও সুগম হয়েছে। ফলে, ইংরেজদের গড়া প্রতিষ্ঠান বলেই যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান, আর তার যাবতীয় ভূমিকাই নিন্দনীয়, বিবেচনাটি এতো সরল হওয়া অনুচিত। বাংলা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা শনাক্তকরণের জন্য ভারতবর্ষের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় ও এর ফলস্বরূপ উপনিবেশিকতা[১] সৃষ্টির কর্মযজ্ঞে তা কীভাবে অংশ নিয়েছিল তার বিশ্লেষণ জরুরি। এক্ষেত্রে, সৈয়দ নিজারের ভারতবর্ষের উপনিবেশায়ন পর্যালোচনা ও পেরুর সমাজতাত্ত্বিক আনিবাল কিহানোর উপনিবেশিকতার ধারণাটি পথ নির্দেশক হয়েছে; উপর্যুপরি শরণ নেওয়া হয়েছে আর্জেন্টাইন তাত্ত্বিক ওয়াল্টার দে মিগনোলোর। ফলে, বাংলা গদ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নয়, বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার প্রেক্ষিত, প্রাচ্যচর্চা ও সাম্রাজ্য সংস্থাপনে এর ভূমিকা এবং কলেজটি কীভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলো ও এই অঞ্চলে উপনিবেশিকতা গড়ে তুলেছিল– তা-ই খতিয়ে দেখা হবে।

বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য

ইউরোপীয় অন্যান্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে,

শুরুতে ইংরেজরাও চেষ্টা করত ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে এক-ধরনের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে; কোনো প্রকার বিবাদে না-জড়াতে; কিন্তু, ১৭৪০ সাল নাগাদ পরিস্থিতি ক্রমশ বদলাতে থাকে। ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আচরণ হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক। হরহামেশাই তাদের যুদ্ধ করতে দেখা যায়– প্রতিপক্ষ পর্তুগিজ ও ডাচদের বিরুদ্ধে। এমনকি মোগলদের সঙ্গেও তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য, এই সকল যুদ্ধের পরিসর এতো বিস্তৃত ছিল না। ইংরেজদের সৈন্য সমাহারের বিস্তৃতিও ছিল অল্প। এক জায়গায় শতাধিক সৈন্য সমাহারের মতো ঘটনাও ছিল বিরল; যেহেতু, সৈন্য-সজ্জার মূল শর্তটিই ছিল– দুর্গ-নির্মাণ, ফ্যাক্টরি ও বাণিজ্যপথ রক্ষা। কিন্তু, স্থানীয় বিবাদে অংশগ্রহণ করা ক্রমেই কোম্পানির জন্য লাভজনক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কোনো এক লড়াইয়ে ফরাসিদের ও কিছু সংখ্যক স্থানীয় সৈন্যকে পরাজিত করার পর ইংরেজদের সাহস যায় বেড়ে; এছাড়া, সামরিক খাতকে আরও শক্তিশালী করার পেছনে তারা বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত দুই ধরনের সুবিধারই হাতছানি দেখতে পাচ্ছিল। ফলে, তাদের জন্য রাজ-রাজড়াদের মৃত্যু ছিল একইসঙ্গে বিপজ্জনক ও আকাঙ্ক্ষিত দুটিই। কেননা, সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে তখন বেঁধে যেত লড়াই; লড়াইয়ের জন্য সৃষ্টি হতো সৈন্য-সহায়তার চাহিদা। কোম্পানি এক্ষেত্রে পরিস্থিতি নির্ণয়পূর্বক সৈন্য-সহায়তার মাধ্যমে বিবাদে অংশ নিত। এই সময়েই ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি লড়াইয়ে জড়ায় ও তাতে জয়লাভ করে; এতে তার ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়; ১৭৪০ সালের আগে যে পরিমাণ ক্ষমতা কল্পনাই করা যেত না। এই দশকেই কোম্পানির কাঠামো ক্রমশ একটি শাসনতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের (state) রূপ নেয়; অধীনস্ত ভূখণ্ডবাসীর ওপর যার ছিল বিচারিক ক্ষমতা; ছিল নিজ নামে মুদ্রা ছাপার অধিকার। (Barrow, 2017 : 68-69) রইল বাকি এক– কোম্পানি কর্তৃক ভারতবর্ষ সম্পর্কিত জ্ঞানকাণ্ডের নির্মাণ।

১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির বিজয়ের পর থেকে কোম্পানি-শাসকদের হাতের তর্জনী সংকেতেই চলছিল সব। আগের আমলের নবাববৃন্দও প্রজাদের শোষণ করতেন, কিন্তু প্রজাদের প্রতি তাদের কমবেশি দায়িত্বও ছিল। কিন্তু কোম্পানি আমলে শাসকদের শোষণ তো বাড়লই, উল্টা দিকে প্রজাদের মঙ্গলার্থে তাদের করণীয় ছিল শূন্য। ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলায় আগমনের (দ্বিতীয় বার) ঘটনা ডেভিড কফ বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

> When Warren Hastings returned to Bengal for the second time in 1772, he found himself confronted with what a parliamentary committee spokesman once reffered to as "the most atrocious abuses that ever stained the name of civil government." A generation of rapacious Company servants in search of quick profits had unabashedly ravaged Bengal and left the once fertile province "a confused heap as wild as the chaos itself." (Kopf, 1969 : 13)

আসলে, ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। ইংল্যান্ডে বিকাশমান শিল্প-বুর্জোয়ারা এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কেননা, ভারতীয় উন্নত মানের সূক্ষ্ম রেশমি ও পশমি বস্ত্রের সঙ্গে ইংল্যান্ডের– রুক্ষ চরকায় কাটা সুতা দিয়ে বয়ন করা– বস্ত্রের প্রতিযোগিতা করা ছিল অসম্ভব। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারত থেকে আমদানি করা বিভিন্ন বস্ত্রাদির বিরুদ্ধে সেখানে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। (আলাভী, ২০১৮ : ৫১-৫২) কোম্পানির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিকাশমান এই বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বন্দ্ব সহজেই মিটে যাওয়ার মতো কিছু ছিল না। যে-কারণে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোম্পানির লুটপাট ও নৃশংসতার বিরোধিতা করার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তারা তাদের অবস্থানের জানান দিয়েছে। এরই ভেতর ঘটে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম ঘটনা। কোম্পানি শাসকদের জঘন্য অর্থলিপ্সার তীব্রতায় ভারতবর্ষে ঘটে মনুষ্যসৃষ্ট সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। এক-সময়ের সমৃদ্ধ প্রদেশ বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক এতে প্রাণ হারায়। এটি ঘটে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে। অ্যাডাম স্মিথ তার *Wealth of Nations* (1776) গ্রন্থেও ভারতবর্ষে কোম্পানির একেচেটিয়া বাণিজ্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। স্মিথ-পরবর্তী সময়েও, তার উদ্ধৃতি দিয়ে, কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যকে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। এই সকল সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় ও কোম্পানির কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ বাজারে কোম্পানির শেয়ারের দাম পর্যন্ত ওঠানামা করতে থাকে যা কোম্পানির জন্য ভালো পরিণতি বয়ে আনেনি। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির অবস্থা ভালো ছিল না। প্রথমত– পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপার, দ্বিতীয়ত– শিল্পবিপ্লবের কারণে ইংল্যান্ডের লোকেরাও আর ভারতীয় বস্ত্রের আমদানি চায়নি এবং ভারতীয় তাঁতিরাও কলে বোনা বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটেছিল। ফলে, পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকে। গুরুচরণ দাস লিখেছেন : Its commercial importance declined in India after the 1820s where it essentially became a political administrator until the British government officially took over India after 1857। (Das, 2015 : xxi) বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য– হেস্টিংস ছিলেন এই রূপান্তরের একজন গুরুত্বপূর্ণ কারিগর। তার আমলেই কোম্পানির তৎপরতায়, বাণিজ্য-বিস্তারের পরিবর্তে, ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। তিনি তার পূর্বসূরিদের থেকে গুণগতভাবে নিজেকে পৃথক প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসকদের আদর্শ।

হেস্টিংসের প্রশাসনিক সংস্কার-কার্যক্রম

১৭৭৩ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং অ্যাক্টস' পাস হয়; ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল; তাকে সহযোগিতার জন্যে গঠিত হলো কাউন্সিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতে একটি নির্ঝঞ্ঝাট প্রশাসন চালাতে গেলে ভারতকে আগে

ভালোবাসতে হবে: ভারতকে ভালোবাসতে হলে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে হবে; আর ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে হলে জানতে হবে তাদের ভাষা। ফলে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষার একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির তাগাদা দিয়ে ১৭৭৩ সালেই তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব দাখিল করেছিলেন। তার মতে, সিভিল সার্ভেন্টদের উর্দু- ফারসি জেনেই ভারতে আসা উচিত। যেহেতু, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি ফারসিই ছিল তখনকার প্রশাসন-আইন-আদালত আর কূটনীতির ভাষা। আর হিন্দুস্থানি (উর্দু ছিল সেই সময়কার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তিকে এশীয় সংস্কৃতি-চর্চার প্রতি উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ভাষা শেখার বিষয়টিকে হেস্টিংস সামনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এদের দ্বারাই প্রাচ্যচর্চাকারীদের প্রথম প্রজন্মটি গড়ে ওঠে হেস্টিংস ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে ইংরেজদের এদেশীয়দের মতে করে ভাবতে ও কাজ করতে জানতে হবে; নয়তো ব্রিটিশদের মনে করা হবে আগন্তক এতে করে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার সৌহার্দ্য ভেঙে পড়বে, সবশেষে ভেঙে পড়ে সাম্রাজ্যই। (Kopf, 1969 : 16-21) ১৭৮৪ সালে, একটি এশিয়াটিক সোসাইটির কথ মাথায় রেখে তিনি লিখেছিলেন–

> Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service. Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise dominion founded on the right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the hearts of our countrymen the sense and obligation of benevolence. (দাস, ২০০৭ : ৫৭)

এই ধারাবাহিকতাতেই ১৭৮৪ সালে, কোম্পানির অর্থ সহায়তায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। প্রতিষ্ঠানটি আসলে কারও একার মাথার কাজ ছি না– তা হেস্টিংসই হোক, আর জোনস– এটি ছিল সামষ্টিক চাহিদার ফসল। উনি শতক অবধি এটি ছিল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরই প্রতিষ্ঠান। সুপ্রিম কো বিল্ডিং-এ অথবা কারও ব্যক্তিগত বাসায় অনিয়মিতভাবে চলমান ছিল এর তৎপরতা আসলে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি দশকব্যাপী কাঁটাছেঁড়া করার প হেস্টিংস-প্রজন্মের দরকার হয়ে পড়েছিল একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের– কারণ, ভারতব সম্পর্কে ততদিনে ব্রিটিশদের মধ্যেও ছিল উপচে পড়া কৌতূহল। (Kopf, 1969 : 3 ঔপনিবেশিক যুগে প্রাচ্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করতে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূ ভূমিকা রাখে। আঠারো শতকে এটি প্রকাশ করে বিপুল পরিমাণ গবেষণা পুস্তক; প্রকা করে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি গ্রন্থসমূহের ইংরেজি অনুবাদ। ফোর্ট উইলিয় কলেজের ওপরও এর ব্যাপক প্রভাব ছিল।

ওয়েলেসলির 'অক্সফোর্ড অফ দি ইস্ট'

হেস্টিংসের পর গভর্নর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন তার যোগ্য উত্তরসূরি লর্ড ওয়েলেসলি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের দশ তারিখ ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা ঘোষণা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করতে আসা কর্মকর্তাদের এটি গড়ে তুলবে দক্ষ ও নিবেদিত-প্রাণ হিসেবে যারা জোরদার করবে ভারতবর্ষে চলমান ব্রিটিশ শাসন। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও আরও ছয়টি দেশি ভাষা। ইংরেজি আইন ও আইনশাস্ত্রের পাশাপাশি সেখানে চর্চিত হবে হিন্দু ও মুসলিম আইন। পাঠ্য হবে লাতিন, গ্রিক, ইংলিশ ক্লাসিক। ইউরোপের অতীত ও আধুনিক ইতিহাস তো থাকবেই, থাকবে এশিয়াটিক সোসাইটির সহায়তায় হিন্দুস্থানের ইতিহাস ও পুরাকীর্তি সম্পর্কিত কোর্স। শেষ পর্যন্ত যোগ হয় বিজ্ঞান– প্রাকৃতিক ইতিহাস, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বলা হতো ওয়েলেসলির কলেজ। ওয়েলেসলির 'অক্সফোর্ড অফ দি ইস্ট'। অবশ্য কলেজটির জন্যে কোম্পানির 'বোর্ড অব ডিরেক্টর'দের সঙ্গে তাকে দরবারও কম করতে হয়নি। এটিকে তিনি তার প্রশাসনের একটি সেরা কীর্তি বলে মনে করতেন, এবং সেই অনুপাতে কলেজটি ব্রিটিশ প্রশাসনে ইতিবাচক ভূমিকাও রাখছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতবর্ষে ওয়েলেসলি ছিলেন একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হোতা, রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে যার তাৎপর্য কোনো অংশেই কম ছিল না। এই বিপ্লব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। (Kopf, 1969 : 46-48) ওয়েলেসলির বিশ্বাস ছিল– 'The College must stand, or the Empire must fall.' (Pearce, 1846 : 212)

ওয়েলেসলি আসলে হেস্টিংসের কর্মসূচিরই বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভাগ সাজাতে গিয়ে তাকে নজর ফেরাতে হয়েছে আগের আমলের প্রাচ্যবিদদের দিকে। বিভাগগুলো সাজানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিবর্গদের নিয়েই– ইতোমধ্যেই যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ফারসি বিভাগকে, যেহেতু, ফারসি ছিল মুঘল রাজতন্ত্রের ভাষা। এই বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন নিল বি. এডমুনস্টোন : তিনি ভারতবর্ষে আসেন ১৭৮৩ সালে; ১৭৯১ সালে কর্নওয়ালিস বাংলা ভাষায় বিদ্যমান 'ক্রিমিনাল ল' অনুবাদের জন্যে তাকে মনোনীত করেছিলেন। ওয়েলেসলির মতো তিনিও ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান, পরে কাজ করেন গভর্নমেন্টের ফারসি অনুবাদক হিসেবে, হয়ে ওঠেন কূটনৈতিক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী। কলেজের ফারসি বিভাগে তাকে সহায়তা করতেন : জন এইচ হ্যারিংটন ও ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন। হ্যারিংটন ছিলেন হাইকোর্টের জজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সক্রিয় সদস্য। আর গ্ল্যাডউইন ছিলেন ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী সেনা-কূটনৈতিক– হেস্টিংস যাকে ১৭৮৩ সালে তিব্বত পাঠিয়েছিলেন। ১৭৮৫ সালে গ্লাডউইন ইংরেজি-ফারসি শব্দভাণ্ডার সংগ্রহ মারফত নিজের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আরবি বিভাগের জন্যে ওয়েলেসলি ঠিক করেছিলেন লে. জন বেইলিকে। ফারসির

পরেই স্থান দেওয়া হয়েছিল আরবিকে– একে তো মুসলিম দুনিয়ার ভাষা, তার ওপর মুঘল আমলের অনেক আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলি ছিল আরবি ভাষায় রচিত। হিন্দুস্থানি ভাষা ও সাহিত্যের ভার পেয়েছিলেন জন বি. গিলক্রিস্ট। গিলক্রিস্ট ১৭৯০ সালের দিকে তার চিকিৎসক ও বণিক জীবন ফেলে কলকাতায় এসে মনোনিবেশ করেছিলেন ভারতীয় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা চর্চায়। এই চর্চাই প্রাচ্যবিদ হিসেবে তাকে পরিচিতি এনে দেয়। তিনি উর্দু ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, আর সংকলন করেছিলেন একটি অভিধান। এতে তার প্রতি গভর্নর জেনারেলের নজর পড়ে। ১৭৯৮ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাইলট প্রোজেক্টের ডিরেক্টর হিসেবে তিনি নিয়োগ পেয়েছিলেন। সংস্কৃত বিভাগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো এইচ. টি. কোলব্রুককে। কোলব্রুক ভারতে এসেছিলেন তার আঠারো বছর বয়সে– ১৭৮৩ সালে; মাদ্রাজে রাইটার পদে কাজ করতেন তিনি। প্রাচ্যচর্চায় যিনি পরবর্তী সময়ে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন উইলিয়াম জোনসের। প্রাচ্যবিদ হিসেবে জোনসের চেয়ে, ম্যাকসমুলার কোলব্রুককেই এগিয়ে রাখতেন। (Kopf, 1969 : 51-52)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলাচর্চা

কোম্পানির রাইটারদের আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি ভাষা শেখানোর কাজ যখন কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছে, তখন পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষা শেখানোর কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। বাংলা-বিভাগের ভার গ্রহণ করতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে, ১৮০১ সালের শুরুর দিকে, শ্রীরামপুর মিশন থেকে নিউ টেস্টামেন্ট-এর বাংলা অনুবাদ বেরোয়। অনুবাদকর্মটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম কেরির ওপর লর্ড ওয়েলেসলির নজর পড়ে। তারই নির্দেশ মোতাবেক কলেজের প্রাধ্যক্ষ ডেভিড ব্রাউন বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কেরিকে চিঠি লেখেন। ১৮০১ সালের ১ মে থেকে কেরি নিযুক্ত হন এবং ৪ মে থেকে কলেজে যোগদান করেন। (দাস, ১৯৮২ : ২৪-২৫)

ভারতবর্ষে আসার পর প্রথম দিকে কেরিকে নিদারুণ আর্থিক কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। অর্থাভাবে শহরে টিকতে না-পেরে, কলকাতায় পৌঁছার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, চলে গিয়েছিলেন হুগলির ধারে পর্তুগিজ উপনিবেশ ব্যান্ডেলে। ব্যান্ডেলেও সুবিধা করে ওঠতে পারেননি। ব্যান্ডেল থেকে নবদ্বীপে, নবদ্বীপ থেকে আবারও কলকাতায় ফেরেন কেরি। পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ ছিল যে তার স্ত্রী, ডরোথি অর্ধোন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। (ঘোষ, ১৯৬০ : ২১-২৫) কেরি ছিলেন একজন মিশনারি, তার কাজ ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রচার ও প্রসার। বাংলা ভাষার প্রতি তার দরদের উৎসও এটিই। ডেভিড কফ লিখেছেন, 'Carey chose Bengali not for its inherent beauty but for its potential usefulness as the most effective medium for reaching the masses of Bengal'। (Kopf, 1969 : 92) অর্থাৎ, বেশি বেশি

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ছিল বেশি বেশি যিশুর বাণীর প্রচার। যদিও বাংলা ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক, উপর্যুক্ত রেখা বরাবর, একমাত্রিকভাবে নিরূপণ করা যাবে না, কিন্তু মাত্রাটি বিস্মরিত হওয়াও অনুচিৎ। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে যিশুর বাণীর প্রচারের সঙ্গে যেখানে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ সংস্থাপন সম্পর্কহীন ছিল না। চার্লস গ্রান্টের বরাত দিলেই প্রসঙ্গটি সহজে বোঝা যায়। গ্রান্ট ছিলেন কোম্পানির প্রভাবশালী ডিরেক্টরদের একজন, যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন : ভারতবর্ষের মাথা মাথা লোকগুলো খ্রিস্টান না হয়ে গেলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখা মুশকিল। কারণ, গ্রান্টের চিন্তায়, দুটো জাতির মধ্যে তখন এক অভেদাত্মা পরিস্থিতি তৈরি হবে না। এছাড়া, তিনি বিশ্বাস করতেন ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় ধর্মের দীক্ষা মানুষগুলোকে আরও পরিশ্রমী করে তুলবে, দেখা দেবে দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি হয়ে; আর সব কথার আসল কথা– incidentally, creat a market for British manufacturers। (Kopf, 1969 : 142-143)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরি পেলেন সবই। তার নিয়ন্ত্রণে তখন গোটা একটি বিভাগ। অর্থের সমস্যা নেই, লোকবলের অভাব নেই, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অন্তর্নিহিত প্রণোদনা তো আছেই। তখন তিনি কাজে লেগে যান। অভাব কেবল পাঠ্যপুস্তকের। নিজে লিখলেন, লিখিয়ে নিলেন পণ্ডিতদের দিয়ে। পণ্ডিতগণের নাম ও কর্মের তালিকাটায় চোখ বুলালে এক নজরে তাদের কর্মতৎপরতার পরিচয়টি ফুটে ওঠে। তালিকাটা নিম্নরূপ–

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণের নাম, গ্রন্থের নাম ও প্রকাশ সাল : (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৬ [১৯৫৯-১৯৬০] : ৬-৭)

পণ্ডিতদের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ সাল
১. রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮০২ ১৮৩৩
৩. গোলোকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২
৪. তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
৫. চণ্ডীচরণ মুন্শী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
৬. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
৭. রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	হিতোপদেশ	১৮০৮
৮. মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান	১৮১০ ১৮১১
৯. হরপ্রসাদ রায়	পুরুষপরীক্ষা	১৮১৫
১০. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	পদার্থকৌমুদী	১৮২১

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংঘটিত এই কর্মযজ্ঞের ফলে বাংলা গদ্য বিকাশের এক ভিন্ন পথ ধরল। ইংরেজরা তাদের প্রয়োজনোপযোগী করে নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে নিল এক নতুন বাংলা গদ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যালোচনাটি সরস। তিনি লেখেন–

> বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন এক পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন। (ঠাকুর, ২০১৬ : ২৮৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নির্ণয়কে অন্যত্রও প্রয়োগ করা চলে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেই এ-ঘটনা ঘটেনি, ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা গড়ে তুলেছিলেন অচল, অসাড়, প্রাণহীন এক 'সোনার ভারতবর্ষ' এবং নির্মিত সেই জ্ঞানকাণ্ডে সত্যের চেয়ে সত্যভ্রম ছিল বেশি, যা বাংলা অঞ্চলে জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন ঘটিয়েছে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, যে-কারণে, ভারতবর্ষ বিষয়ক তথ্যসংগ্রহ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। আর তা কেবল মানচিত্র তৈরি এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রয়োজন ছিল এ-অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নেরও। এ-কারণেই এই অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ধর্মের অধ্যয়ন শুরু হয়। প্রধানত এর লক্ষ্য ছিল দুইটি : এক– শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাঙালিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ; দুই– আঠারো এবং উনিশ শতক থেকে প্রত্ননিদর্শনের বাজারমূল্য বৃদ্ধি। ফলে, শুরু হলো ভারতবর্ষের শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা যা 'ভারতবিদ্যা' বা 'প্রাচ্যবিদ্যা' নামে পরিচিত। এই প্রাচ্যবিদ্যার প্রভাবেই ভারতীয় চিন্তা প্রাচ্যবাদী অপব্যাখ্যার কবলে পড়ে। সৈয়দ নিজার এই আলোচনাটি করেছেন ভারতীয় শিল্পকলা প্রসঙ্গে যা ভাষা, সংস্কৃতি ও দর্শনচর্চার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। তার মতে, ভারতবর্ষে শিল্পচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাসের ওপর কোনো গ্রন্থ না-থাকায় প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নের দ্বারাই ভারতীয় শিল্পকলার প্রথম ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এবং সেই ইতিহাস প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশের রাজনীতি ও পুঁজির প্রভাবের বাইরে ছিল না। তিনি উইলিয়াম জোন্সকৃত ভারতশিল্প মূল্যায়নের বরাত দেন। যেমন, জোন্স মনে করতেন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প নয়; বরং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র; চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবে। (নিজার, ২০১৭ : ৪৭-৪৯)

অপর পক্ষে, জেমস ফার্গুসন ও আলেকজান্ডার কানিংহামের ভারতশিল্পকলার পাঠ ধারাবাহিক শিল্পচর্চার যে ঐতিহ্য ভারতে ছিল সেই পরম্পরায় বিযুক্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছে। নিজারের বিবেচনায়, সেই পাঠ ছিল একদম অপরিপক্ব; স্থানীয় তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে যার কোনো যোগ ছিল না। তার মতে, তাদের কাজের মধ্য দিয়েই ভারতশিল্প প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশায়নের শিকার হয়। কেননা, কানিংহাম হাজির করেছিলেন ভারতীয় শিল্পের ধর্মনির্ভর ব্যাখ্যা; ফলে তারও সুর ছিল অনেকটা জোন্সের মতোই। আরেকদিকে– জোন্স ও কানিংহামের থেকে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিলেও, ফার্গুসন বললেন, ভারতশিল্পে রিয়ালিজমের ঘাটতি আছে; এই কারণে তা অনুন্নত; তার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা নেই; আর উন্নত শিল্পকর্ম তাই, ফার্গুসনের মতে, যার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা আছে। তার দাবি– আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা রেনেসাঁ-উত্তরকালে অনুকরণ প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গেছে; আর সে কারণেই তা ভারতসহ অন্যান্য প্রাচীন শিল্পকলা থেকে উন্নত। (নিজার, ২০১৭ : ৫০-৫১)

ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখতে গিয়ে হ্যালহেডও ঠিক একই কাজ করেছিলেন– আবিষ্কার করলেন বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 'পড়তি দশা'র তত্ত্ব। কেননা, ইউরোপীয় ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করা তার জন্য কঠিন হচ্ছিল। তিনি এর দায় চাপালেন বাংলা ভাষার ওপর। কারণ হিসেবে দাখিল করলেন : এক– ভাষা খুইয়ে বসেছে তার অন্তর্নিহিত সামান্য বিধি; দুই– বচন ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মধ্যেও নেই কোনো স্পষ্ট ভেদরেখা। অবিধিবদ্ধ বানান ও শব্দ-প্রকরণও তাকে চটিয়েছিল বেশ। তাছাড়া, তিনি নাকি জানতেন বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারের কথা, অথচ খুঁজে পেতে দেখলেন আধা ডজনের একটি বেশিও প্রাচীন গ্রন্থ নেই কোথাও। (Kopf, 1969 : 57-58) হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থের (১৭৭৭-১৭৭৮ খ্রি.) জন্য হুগলিতে ছেনি কেটে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন চার্লস উইলকিনস। গ্রন্থটির উদাহরণ ও উদ্ধৃতিতে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলা ছাপার হরফ। ছাপার এই হরফের জন্য কোম্পানির তাড়াহুড়ার অন্ত ছিল না। এর অবশ্য অন্যতম কারণ ছিল– জালিয়াতি থেকে নিস্তার পাওয়া। (সেন, ১৩৮৬ [১৯৮০] : ৫-৬) কোম্পানির কাজে বাংলা ছাপার হরফের গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক হ্যালহেড তার গ্রন্থের ভূমিকাতেও উইলকিনসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। (Halhed, 1778 : xxiv) কোম্পানির বাণিজ্যিক ও শাসনতান্ত্রিক লাভালাভের প্রসঙ্গ তো আছেই, উপরন্তু, তার বক্তব্যে এদেশীয়দের প্রতি কোম্পানির কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় মেলে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার চিন্তায় উপনিবেশক প্রভু ও উপনিবেশিত ভৃত্যের দ্বৈতবাদী সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ঔপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে, এভাবে প্রতিটি তৎপরতার মধ্য দিয়েই, ঔপনিবেশিক বিষয়ী ও উপনিবেশিত বিষয়ের নির্মাণ ঘটতে থাকে। ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিত 'অপর' নির্ণীত হয়েছে 'বর্বর ও অসভ্য' রূপে; আর নিজেদের

'আত্ম'কে ইউরোপীয়রা প্রতিষ্ঠা করেছে 'সভ্য' চেহারায়। ইউরোপীয় গবেষকদের দৃষ্টিতে তাই অ-ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য হয়ে ওঠে আদিম, অশ্লীল বর্বর, উন্নয়নশীল কিংবা পতনোন্মুখ। ইউরোপীয়রা 'যুক্তিবাদী', আর অ-ইউরোপীয়- 'অযুক্তিবাদী'। ভারতের ক্ষেত্রে এই 'অযুক্তি'র জায়গা নিয়েছিল 'অধ্যাত্মবাদ'। ভারত তাই চিহ্নিত হয়েছিল 'অধ্যাত্মবাদী' হিসেবে। এই ধরনের নির্মাণ উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে সত্যভ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে; যার দ্বারা উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে উপনিবেশিতের মনোজগৎ। ফানো, নগুগিসহ অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ এই মনোজাগতিক উপনিবেশায়নের কথাই বলেছেন। ভারতের ক্ষেত্রেও যার ব্যত্যয় ঘটেনি। (নিজার, ২০১৭ : ২৪)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে স্থানীয় ভাষাসমূহের চর্চার মাধ্যমে একইসঙ্গে স্থানীয় ভাষায় চিন্তার নতুন ধরনেরও বিকাশ ঘটেছিল যা সেই ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের আত্ম উপলব্ধি ও কল্পলোককে প্রভাবিত করেছে। ইউরোপীয় চিন্তার কাঠামোতে বিরাজমান বিষয়ী ও বিষয়ের যে স্পষ্ট ভেদরেখা, নিজ ও অপর সম্পর্কিত বৈষম্যপূর্ণ যে জ্ঞান তা স্থানীয় ভাষায় আত্মস্থ হয় এবং সেই ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের স্বীয় অবস্থান সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়। ভাষাচর্চা যে সাদাসিধা ভাষানুশীলন নয়, তা হতেও পারে না, তার একটি স্পষ্ট নমুনা হাজির করা যাক। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় যে গ্রন্থটি লিখে সেই কালে ১০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন তার নাম– মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। রাজীবলোচন তার গ্রন্থে লিখেছিলেন–

> ... অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না... তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুণ।
>
> এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই২ সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৬ [১৯৫৯-১৯৬০] : ৩২-৩৩)

অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শাসনের যে আধিপত্যবাদী মতাদর্শ রাজনৈতিকভাবে সমাজে সক্রিয় ছিল, উদ্ধৃত অংশের মতো করেই জ্ঞানকাণ্ডে তার সাংস্কৃতিক ও ভাষিক যোজন ঘটেছে। রাজীবলোচন যে-সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'জবন-ইঙ্গরাজ' ভেদ বিস্তা

করলেন, আর তাতে ভারতবর্ষীয় মহিমা লেপন করলেন, তার অন্যথা হওয়ার সুযোগও আসলে রাজনৈতিকভাবে সমাজে তখন গরহাজির ছিল। তিনি তার বাক্যগ্রন্থনে যে-ধরনের অলঙ্কারের সমাবেশই ঘটাতেন না কেন, তার গন্তব্য একই রয়ে যেত, কেননা তা এক-প্রকার নির্ধারিতই ছিল। ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে ঔপনিবেশিক 'অপর'-এর নির্মাণ সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে। তারই নমুনা পরিলক্ষিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কে। নিখিল সুর লিখেছেন–

> একেবারে প্রথম থেকেই কলেজের মুনশিদের প্রতি অধিকাংশ ছাত্র শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তার অনেক নজির রয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইতিহাসে। ১৮০৬-এর এপ্রিলে জনৈক ছাত্র মুনশি নজরউল্লাহ-এর সামনে একটা ছবি ধরে তাঁকে মাথা নত করতে বলে। সে সময় মুনশি বসে ছিলেন এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াননি। তিনি ছাত্রটির নির্দেশ অমান্য করায় তাঁর কাছ থেকে ছাত্রটি চেয়ারটা কেড়ে নেয়। মুনশি এই আচরণের প্রতিবাদ করলে ছাত্রটি তাঁকে গালাগালি দিয়ে ঘোড়ায় চাবুক দিয়ে প্রহার করতে উদ্যত হয়। মুনশি অভিযোগ জানান কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু গভর্নর জেনারেল শুধুমাত্র তার কড়া নিন্দা করে কর্তব্য সারেন।... ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এমন আর একটি ঘটনা ঘটে যেখানে কেনেডি নামে এক ছাত্র আক্ষরিক অর্থে প্রহার করে শিক্ষক আনন্দ শর্মাকে। পরের বছর প্রহৃত হন গোলাম হোসেন।... এটা ঘটনা যে, যেহেতু অধিকাংশ নেটিভ মুনশি ভাল ইংরেজি জানতেন না, তাই তাদের হেয় জ্ঞান করত অধিকাংশ তরুণ ইংরেজ ছাত্র। দিন যত গড়িয়েছিল, তারা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল যে, তারা শাসকের জাতি, মুনশিরা শাসিত। ১৮৪০-এর দশকের পর থেকে এই ধারণা ক্রমশ শেকড় চালিয়ে দিয়েছিল অধিকাংশ তরুণ সিভিলিয়ানের মনে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে, তাদের এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল খোদ কলেজের কর্তৃপক্ষ। (সুর, ২০২১ : ৫৯-৬০)

ইউরোপ যে কাঠামোয় উপনিবেশিত বাদবাকি-দুনিয়ার সাপেক্ষে তার 'আত্ম'কে নির্মাণ করেছে, জ্ঞানকাণ্ডে সংরক্ষণ করেছে সেই 'আত্ম'-এর কেন্দ্রীয় ভূমিকা, সেই সাপেক্ষেই নির্মাণ করেছে 'অপর'-এর চরিত্র। 'অপর'-এর সঙ্গে 'আত্ম'-এর এই সম্পর্ক ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে সংরক্ষিত হয়েছে বিষয়ী ও বিষয়ের সম্পর্কসূত্রে। তাই, উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের রাজনৈতিক কারণের বাইরেও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তিবোধ উপনিবেশিত সমাজে অবশিষ্ট থেকেই গেছে। ফলে, ঘটনাসমূহের কারণ তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকেনি, নিজেকে তা লুকিয়ে ফেলেছে ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে–ইউরোপীয় যৌক্তিকতায়– গড়ে তুলেছে উপনিবেশিকতা। এই উপনিবেশিকতাই উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক পরিসমাপ্তির পরেও সংশ্লিষ্ট সমাজে তাকে টিকিয়ে রাখে।

উপনিবেশিকতা

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো কর্তৃক অ-ইউরোপীয় অঞ্চলসমূহে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জারি রাখার আনুষ্ঠানিক কায়দাস্বরূপ যে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ, বলতে গেলে, তা এখন অতীত প্রসঙ্গ। অর্থাৎ, রাজনৈতিকভাবে, বিশেষত আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য

চেহারায়, উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (কিহানো, ২০২২ : ২০৫-২২৯) ফলে, বর্তমান সময়ে যে উপনিবেশবাদের আলোচনা-পর্যালোচনা চলে তা রাজনৈতিক উপনিবেশবাদ নয়, যদি আমরা তর্কের খাতিরে 'রাজনীতি' বর্গটিকে সংস্কৃতি ও জ্ঞানতত্ত্ব থেকে আলাদা করে নিই। উপনিবেশবাদের পর্যালোচনায় তাই ভূমি অধিগ্রহণ, সম্পদের লুট ও শারীরিক পীড়ন ছাড়াও মনোজাগতিক নিয়ন্ত্রণ ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাবও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ও মেননি, মেমি ও ফানো তত্ত্বীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাদের মতে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রগুলোর উপর মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশবাদ এখনও জারি আছে। মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : এক– ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণপ্রকল্প, যেখানে উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতার বয়ান থাকে, যাতে সত্য থেকে সত্যভ্রম থাকে বেশি; দুই– সেই জ্ঞানকাণ্ড প্রচার ও প্রসারের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিতের চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তার; যার ফলে, উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী যেমন আত্মবিশ্বাস হারায় তেমনই হয়ে ওঠে অনুকরণপ্রবণ। (নিজার, ২০১৭ : ৪৫-৪৭)

কিহানোও উপনিবেশায়নের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকাটিকেই প্রধান বিবেচনা করেছেন। এর দ্বারা ইউরোপীয় আত্মতত্ত্ব ও প্রাদেশিক যুক্তিকাঠামোটি সর্বজনীনরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি তার উপনিবেশিকতার ধারণা দিয়ে উপনিবেশিত সমাজের উপনিবেশোত্তর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভাবনায়, উপনিবেশবাদ নির্দেশ করে এক-ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেখানে একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা অপর আরেকটি কর্তৃত্ববাদী দেশের উপর ন্যস্ত থাকে, কর্তৃত্বপরায়ণ দেশটিকে যা গড়ে তোলে একটি সাম্রাজ্য হিসেবে। অন্যদিকে, উপনিবেশিকতা উপনিবেশায়নের পরিণতি হিসেবে গড়ে ওঠা দীর্ঘস্থায়ী এক ক্ষমতা-সম্পর্ক যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতা-বহির্ভূত সংস্কৃতি, শ্রম, আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক ও জ্ঞানোৎপাদনকে সংজ্ঞায়িত করে। উপনিবেশিকতা উপনিবেশবাদ টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার এবং বই-পুস্তক, বিদ্যায়তনিক তৎপরতা, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, প্রাত্যহিক বোঝাপড়া, সাধারণের আত্ম-ভাবনা, আত্মবোধের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য আধুনিক যাপনাভিজ্ঞতায় এটি সুপ্তাবস্থায় রয়ে যায়। যে-কারণে, একজন আধুনিক বিষয়ী প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহূর্ত উপনিবেশিকতার মধ্যেই দম নেয়। (Maldonado-Torres, 2010 : 97)

ইউরোপীয় চিন্তা জ্ঞানের যে যৌক্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, কিহানোর বিবেচনায়, তার মৌলিক পূর্বানুমানটিই প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা, জ্ঞান সেখানে উপলব্ধ হয় বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কের উৎপাদন হিসেবে যা দার্শনিক দেকার্তের আত্মতত্ত্ব (cogito) দ্বারা প্রভাবিত। তাতে 'বিষয়ী' বর্গটি দ্বারা নির্দেশিত হয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, কারণ নিজেই তা নিজের মধ্যে ও নিজের জন্য, বয়ানের নিজস্ব পরিসীমায় এবং জাহির করার সাধ্যের ভেতর নিজেকে সংগঠিত করে; আর 'বিষয়' কেবল 'বিষয়ী'/ ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র

অস্তিত্ব-নির্দেশক বর্গই নয়, পরেরটি থেকে তা বৈশিষ্ট্যগতভাবেও পৃথক। সেখানে 'বিষয়' ও তার সত্তা অভিন্ন; যেহেতু, তা পরিগঠিত হয়েছে 'সম্পত্তি' দ্বারা– যা তার পরিচয় নির্মাণ করে ও তাকে সংজ্ঞায়িত করে। কিহানো ব্যক্তি ও 'বিষয়ী'র এই ব্যক্তিতান্ত্রিক চরিত্রকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন, কারণ, আন্তঃবিষয়ীতা ও সামাজিক অখণ্ডতাকে সকল প্রকার জ্ঞানের উৎপাদনক্ষেত্র হিসেবে অস্বীকার করার মাধ্যমে– যেকোনো অর্ধসত্যের মতো– এটি সমস্যাকে আরও ঘোলাটে করে। (কিহানো, ২০২২ : ২০৫-২২৯)

একইভাবে, সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোয় প্রয়োগ করা হয় অবয়ববাদী ধারণা, যেখানে গোটা সমাজটাকে কল্পনা করা হয় একটি দেহের আদলে। বিশেষত, মানবদেহের গঠনানুযায়ী, এবং প্রতিটি অঙ্গ সেখানে বিন্যাসিত হয় কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী। যে-কারণে, মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে এমন একটি অঙ্গ– বাদবাকি দেহটাকে যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে– বাদবাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যার প্রতি আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় না-রেখে টিকতেই পারে না। এই নকশানুযায়ী, কারখানার ক্ষেত্রে এই পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করে পুঁজিপতি, সমাজের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা নেয় বুর্জোয়া শ্রেণি, আর উপনিবেশগুলোতে উপনিবেশকেরা। এই সূত্রেই উপনিবেশিতেরা হয়ে ওঠেছিল 'সাদা মানুষদের বোঝা'। (কিহানো, ২০২২ : ২০৫-২২৯) সভ্যতার পথ ধরে তাদের বহন করার দায় ইউরোপীয়রা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। দায় নিয়েছিল আলো বিতরণের। গোটা দুনিয়া জুড়ে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের আরেক উছিলা ছিল আধুনিকতা। কিহানো ও মিগনোলো একে বিবেচনা করেন উপনিবেশিকতারই উল্টা পিঠ হিসেবে।

আধুনিকতা

উপনিবেশায়নে ইউরোপীয় প্রাদেশিক যৌক্তিকতাই হাজির হয়েছিল সর্বজনীন যৌক্তিকতা হিসেবে যার আলঙ্কারিক বয়ানের নামই আসলে আধুনিকতা। মিগনোলো আধুনিকতা ও উপনিবেশিকতাকে উপলব্ধি করেন পরস্পর বিজড়িত ধারণা হিসেবে– যার একটিকে ছাড়া আরেকটি টিকতে পারে না। তার তদন্তে উপনিবেশিকতা ধরা পড়ে আধুনিকতার না-বলা বয়ান হিসেবে, শর্তগতভাবে যা মূলত একই আলাপের অংশ, একে তা অপরের পরিপূরক। এই সূত্রেই, উপনিবেশিকতা আধুনিকতার চেপে যাওয়া দিক। ফলে, তার কাছে 'যাহাই আধুনিক, তাহাই ঔপনিবেশিক'। কেননা, এই দুইয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্ত যে একই। আধুনিকতার বয়ান দিয়ে, তার মতে, আড়াল করা হয়েছে উপনিবেশিকতাকে, আর যা ছিল এক বৈশ্বিক মিথ্যা। (Mignolo & Catherine E. Walsh, 2018 : 141) তিনি 'উপনিবেশিকতা' শব্দ দিয়ে নির্দেশ করেন– ক্ষমতার উপনিবেশিকতা। তার ভাষায় : 'The expression suggests that what is imprinted in colonial cultures is the effect of the imperiality of power. And the

imperiality of power in the modern/ colonial world ... is written not by guns and armies but by the words that justify the use of guns and armies...'। (Mignolo & Catherine E. Walsh, 2018: 140) অর্থাৎ, উপনিবেশিকতা ঔপনিবেশিক নৃশংসতাকে সত্যায়িত করেছিলো– জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে তাকে দিয়েছিল বৈধতা।

মিগনোলোর চিন্তায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র রয়েছে। তার মতে, আধুনিকতার জন্ম বিশ্বজনীন সময় ও ইতিহাসে; যে-সময় ও ইতিহাস একরৈখিক; আর, এ-কারণেই তার প্রয়োজন ইতিহাসের পূর্ব ও পরমূহূর্ত। প্রাক-আধুনিক ও তার পরবর্তী পর্যালোচনামূলক পর্ব উত্তরাধুনিক এ-সূত্রেই তার জন্য অপরিহার্য। (Mignolo & Catherine E. Walsh, 2018 : 117) উপনিবেশিকতা– ফলে– স্থান ও কালেরও উপনিবেশায়ন ঘটিয়েছে। মিগনোলো লেখেন : 'Colonization of space and time were not military, financial, or state-politics activities: they were conceptual, that is, epistemic.' (Mignolo & Catherine E. Walsh, 2018 : 140) এই কারণেই, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা যখন আধুনিক যুগের ইতিহাস লিখেছেন তাদের জন্য প্রাক-আধুনিক পর্বটি এত জরুরি ছিল। আধুনিকতার আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে যাদের অনেককেই একশত বছরের লম্বা 'অন্ধকার যুগের' কেচ্ছা ফাঁদতে হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা সুশীল কুমার দে দাবি করেছিলেন, ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে, অর্থাৎ, মধ্যযুগের শেষ দিকে বাংলা কাব্যের মান ছিলো পড়তির দিকে। তার মতে : একই রকম বিষয় নিয়ে, একই চালে ও একই আঙ্গিকে সস্তা গৎবাঁধা পদ্য রচিত হচ্ছিল তো হচ্ছিলই। আর, কবিদেরও ছিল নাকি একটাই উদ্দেশ্য– দেবস্তুতি। ফলে, ধর্মের লেবাস ছেড়ে তাঁদের বের হওয়ার সাধ্য আসলে ছিল না, আর যা ছিল তা-ও নাকি ছিল একঘেয়েমির চূড়ান্ত; তা-ই জানান দিচ্ছিল যে, সময় ফুরিয়ে আসছে। তিনি লিখেছেন–

> If a literature after producing great things in the past does nothing more for centuries, if it shows signs of decadence and practically limits itself to trifles, then the conclusion is irresistible that it badly wants a change. Long before the stability of British rule was beyond all questions a process of decadence or dissolution had already begun which indicated a change in its spirit. The British occupation and its accompanying evils only hastened this change, so that a new era of literary history began in Bengal with the firm establishment of British rule. (De, 1940 : 40)

সুশীল কুমার দে ভাষা ও সাহিত্যের যে পড়তি দশার বিবরণ দিয়েছিলেন, তা তাঁর নিজের কথা নয়। হ্যালহেডও কিন্তু এই বিন্যাসেই কথা সাজিয়েছিলেন। কথা হলো, পড়তি দশা না-থাকলে তো ব্রিটিশদের ধাক্কায় উঠতি দশাও সম্ভব নয়। তেমনি অন্ধকার যুগ না-থাকলে– ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে– আলোকময় যুগের পত্তন হওয়াটাও

অসম্ভব হয়। অর্থাৎ, এভাবে ইতিহাস ব্যাখ্যা না-করলে ব্রিটিশদের আগমনী বাদ্য জুৎসই বাজে না। আর এভাবে বাদ্য বাজানোর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, এতে সহজেই মনে হয়, ব্রিটিশ পুঁজি (কার্ল মার্কস যেমন বলেছিলেন) বা অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের জন্য বাংলা অঞ্চল (ভারতবর্ষ) যেন মুখিয়ে ছিল এবং বাংলার জন্যে, শেষ বিচারে, তা এক-প্রকার আশীর্বাদই বয়ে এনেছে।

সজনীকান্ত দাস *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে হেস্টিংস প্রসঙ্গে তার পর্যালোচনা ব্যক্ত করতে গিয়ে হেস্টিংসের গুণকীর্তনই করেছিলেন। হেস্টিংসের সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থেকে খুব সহজেই তিনি তার সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ফলে, হেস্টিংস তার চোখে ধরা দিয়েছিল ত্রাতার ভূমিকায়। এদেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি অনুভব করেছেন তার চিরস্মরণীয় অবদানের কথা। সজনীকান্ত লিখেছেন–

> ভারতবর্ষের তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেস্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব। তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্তৃক 'জেন্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়ে বাংলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান; কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে স্যর্ উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে এদেশের সংস্কৃতি-বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের। (দাস, ২০০৭ : ৫৪-৫৫)

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আজ অনেকেই একমত হবেন না, আর অতীতেও যে হননি তা তার বক্তব্য পেশ করার ধরন থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া, হেস্টিংসের 'রাষ্ট্র-জীবন' থেকে তার 'উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি'কে খুঁজে নেওয়ার শ্রমও আজ আর কেউ করতে চাইবেন না। এর কারণ, চিন্তার ধরনের পরিবর্তন। উপনিবেশের সমালোচনা এখন তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। আজ যা চোখ মেললেই দেখা যায়, পূর্বে তা-ই ছিল অন্বেষণের অতীত। কিন্তু আবারও বলা দরকার, এ-কেবল সজনীকান্তের সঙ্গে একমত বা ভিন্নমত হওয়ার প্রসঙ্গ নয় কিংবা হেস্টিংসের ভূমিকা চিহ্নিত করার প্রশ্নও নয় এটি। সজনীকান্ত বা সুশীল কুমারের চিন্তা তৈরির গোটা প্রক্রিয়াটিই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

মোটকথা, বাংলা অঞ্চলে ব্রিটিশ তৎপরতার সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক চরিত্র নির্ধারণই শেষ কথা নয়। ইউরোপীয় সংস্পর্শে, ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের প্রভাবে,

বাঙালিদের জীবনদৃষ্টি ও নিজেদের নিয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, উপনিবেশিকতা গড়ে উঠেছে, তাকে নস্যাৎ করতে হবে। কেননা, চিন্তার এই ধরনে যে-প্রেক্ষিত থেকেই বিচার করা হোক না কেন, তা ঔপনিবেশিক ফলই বয়ে আনে। সজনীকান্ত ও সুশীলকুমারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটিই ঘটেছে। একই ঘটনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ক্ষেত্রেও ঘটে। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা-বিচার ঔপনিবেশিক যুক্তিকাঠামোর কাঠামোর ভেতরে থেকেই করা হয়ে থাকে। গদ্য অন্বেষণের নকশাটিই ইউরোপীয়। আর বাংলা গদ্যের এই অভাব ইউরোপীয় অভাববোধ দ্বারা জারিত। আরও গভীরভাবে বলা যায়, উপনিবেশিকতা চিন্তার মৌলিক কাঠামোটিকেই সংক্রমিত করে। এতে উপনিবেশিত চিন্তার কাঠামোতে ঔপনিবেশিক আত্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়। যে-কারণে, চিন্তা করার ক্ষেত্রে ইউরোকেন্দ্রিক পরিভাষা দিয়ে যা-ই চিন্তা করা হোক না কেন, তা ইউরোকেন্দ্রিক ফলই বয়ে আনে। ইউরোপ হাজির হয় ত্রাতার ভূমিকায়, ইউরোপের প্রাদেশিক ইতিহাস হয়ে ওঠে গোটা দুনিয়ার ইতিহাস, ইউরোপের জ্ঞান হয়ে ওঠে সর্বজনীন জ্ঞান। সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোতে বাদবাকি দুনিয়া নিজেদের অবস্থান কেবল প্রান্তেই খুঁজে পাবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে বদলে ফেলতে হবে আলোচনার কাঠামোটিই, আর তার পরিভাষাসমূহ। কেননা, ঔপনিবেশিক পরিভাষায় উপনিবেশিতের অভিজ্ঞতা কখনও বর্ণনা করা যায় না। ফলে করণীয় এটিই: ঔপনিবেশিক তৎপরতার মাধ্যমে যে উপনিবেশিকতা সৃষ্টি হয়েছে, জ্ঞানকাণ্ডে রয়ে গেছে সুপ্তাবস্থায়, তাকে ধ্বংস করা। আর এটি যেমন সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের চেয়ে সক্রিয় থাকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে, তেমনই একে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেই অকেজো করতে হবে।

অবশ্য পশ্চিমা বা ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের পাল্টা এক জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণই এখানে মুখ্য কর্ম নয়। মিগনোলো যেমন বিউপনিবেশিকতার কথা বলেছেন এবং বিপশ্চিমাকরণ থেকে তার পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। তার ভাষায়, বিউপনিবেশিকতা আলাপের পরিভাষাসমূহকেই বদলে দেওয়ার জোর তাগিদ জানায়, যেখানে বিপশ্চিমাকরণ আলাপের প্রসঙ্গ নিয়ে বিবাদ করে ঠিকই কিন্তু পরিভাষাগুলোকে রেখে দেয় অক্ষত। ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতার ঔপনিবেশিক মাতৃকার কাঠামোটিকেই এটি অক্ষত রেখে দেয়। অর্থাৎ, বিপশ্চিমাকরণ শাসনকাঠামোর ধরন হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র, আর উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, অর্থসংস্থান ও বাজারের ধরন হিসেবে অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতাকে (পুঁজিবাদ) অক্ষতই রেখে দেয়, তার বিবাদ চলে ক্ষমতার ঔপনিবেশিক মাতৃকার দখল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য। (Mignolo & Catherine E. Walsh, 2018 : 130) তেমনি জ্ঞানোৎপাদনের যৌক্তিক কাঠামোটিকে না বদলে শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নিয়ে তর্ক করলে সিদ্ধান্ত হিসেবে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন বৈশিষ্ট্যগতভাবে তা ঔপনিবেশিক জ্ঞানই উৎপাদন করবে। আর তা উপনিবেশিতদের প্রান্তীয় রূপেই হাজির করবে।

অনুরূপভাবে, ইংরেজ কর্তৃক বাংলা গদ্য বিষয়ক প্রস্তাব ও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাতীয়তাবাদী বয়ান উভয়ই ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত প্রামাণ্যকেই স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে, তর্কটিও চলে সেই আদর্শের দখল-বেদখল নিয়ে। একই ঘটনা ঘটে বাংলা অঞ্চলে পুঁজির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও। সেক্ষেত্রেও ইউরোপীয় পরিভাষাসমূহকে অক্ষত রেখেই চলে প্রসঙ্গ নিয়ে বিবাদ। অনুরূপ, সুশীলকুমার ও সজনীকান্তের চিন্তাও ঝুঁকিতে পড়ার কারণ যথাক্রমে তাদের ইংরেজ ও হেস্টিংস প্রীতি নয়– চিন্তার পরিভাষাসমূহকে অক্ষত রেখে দেওয়া। অর্থাৎ, কোন কাঠামোতে একটি সমস্যা তৈরি হচ্ছে ও তার সমাধানের প্রয়াস করা হচ্ছে সেটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তা সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতেই কেবল অর্থপূর্ণভাবে কার্যকর হয় এবং তা প্রকাশের পরিভাষাসমূহও নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ, যেকোনো চিন্তার ক্ষেত্রে যুক্তির একটি নিজস্ব ছক থাকে যা দ্বারা নিরূপিত হয় তার সত্য। উপনিবেশিত জ্ঞানকাণ্ড উপনিবেশিকতার কারণে যুক্তির ঔপনিবেশিক ছক অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। ঠিক এই কারণেই, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পর্কিত চিন্তার কাঠামো ও পরিভাষাসমূহের পুনর্গঠন না-করলে উপনিবেশিকতা তৈরিতে এর ভূমিকা নির্ধারণ করার কাজটি সরল হবে না।

টীকা

১. *উপনিবেশিকতা* (coloniality) পরিভাষাটির প্রবর্তক পেরুর সমাজতাত্ত্বিক আনিবাল কিহানো। একে তিনি উপনিবেশবাদ থেকে আলাদা করে নেন। তার ভাবনায়, উপনিবেশবাদ নির্দেশ করে এক-ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক–যেখানে একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অপর আরেকটি কর্তৃত্ববাদী দেশের ওপর– যা কর্তৃত্বপরায়ণ দেশটিকে একটি সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলে। অন্যদিকে, উপনিবেশিকতা হলো উপনিবেশায়নের ফলে সৃষ্ট হওয়া দীর্ঘস্থায়ী এক ক্ষমতাবিন্যাস যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতা-বহির্ভূত সংস্কৃতি, শ্রম, আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক ও জ্ঞানোৎপাদনকে সংজ্ঞায়িত করে। এই দুইয়ের সম্পর্ক হলো– উপনিবেশিকতা রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত উপনিবেশবাদকে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখে। বই-পুস্তক, বিদ্যায়তনিক তৎপরতা, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, প্রাত্যহিক বোঝাপড়া, সাধারণের আত্ম-ভাবনা, আত্মবোধের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য আধুনিক যাপনাভিজ্ঞতায় এটি সুপ্তাবস্থায় রয়ে যায়। ফলে, একজন আধুনিক বিষয়ী হিসেবে ব্যক্তি মূলত উপনিবেশিকতার মধ্যেই দম নেয়। এ-কারণেই, উপনিবেশিকতা কোনো ঔপনিবেশিক সম্পর্কের সরল পরিণতি বা অবশিষ্ট নয়। 'কলোনিয়ালিটি' শব্দটিকে আরও অনেকেই ব্যবহার করেন। আমরা যার বাংলা করি– ঔপনিবেশিকতা। কিন্তু কিহানো একে বিশেষ অর্থে নির্মাণ করেছেন, এবং 'ঔপনিবেশিকতা' বানানে পরিভাষাটির সেই বিশেষ অর্থ খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় বলেই এর বানান লেখা হয়েছে 'উপনিবেশিকতা'। এই বানানে লাতিন আমেরিকীয় বিউপনিবেশিক চিন্তনে ব্যবহৃত 'কলোনিয়ালিটি' পরিভাষাটির বাংলা তর্জমা নির্দেশিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

আজাদ, হুমায়ুন (২০১১)। *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

আলাভী, হামজা (২০১৮)। *ভারতবর্ষ : সামন্তবাদ থেকে উপনিবেশিক পুঁজিবাদে উত্তরণ*। অনু. এনামুল হাবীব। ঢাকা : উৎস প্রকাশন।

ঘোষ, শক্তিব্রত (১৯৬০)। *উইলিয়ম কেরী : জীবন ও সাধনা*। পশ্চিম বঙ্গ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

দাস, সজনীকান্ত (১৯৮২)। *উইলিয়াম কেরি*। কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

—— (২০০৭)। *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

নিজার, সৈয়দ (২০১৭)। *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা*। সিলেট : চৈতন্য।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৬৬ [১৯৫৯-১৯৬০])। *ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত* [সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা–১৪]। কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সাজ্জাদ, সুমন (২০১৬)। *আধুনিকতা ও আত্মপরিচয় মতাদর্শিক নির্মিতি ও সাহিত্যিক বিস্তার*। সিলেট : চৈতন্য।

সুর, নিখিল (২০২১)। *ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, দীনেশচন্দ্র (১৩৬৭ [১৯৬০-১৯৬১])। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [দ্বিতীয় খণ্ড]*। কলকাতা : গ্রন্থপীঠ।

সেন, সুকুমার (১৩৮৬ [১৯৮০])। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও সৈয়দ আলী আহসান (২০০৬)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

হালদার, গোপাল (২০১৭)। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা অখণ্ড*। ঢাকা : মাটিগন্ধা।

Barrow, Ian (2017). *The East India Company, 1600–1858*. United States of America : Hackett Publishing Company.

De, Sushil Kumar (1940). *Bengali Literature In The Nineteenth Century (1757-1857*. Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay.

Halhed, Nathanial Brassey (1778). *A Grammar of the Bengal Language* Hoogly.

Kopf, David (1969). *British Orientalism and the Bengal Renaissance*. Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay.

Mignolo, Walter D. & Catherine E. Walsh (2018). *On Decoloniality*. United States of America : Duke University Press

Pearce, Robert Rouiere (1846). *Memoirs and Correspondence of the Most Noble Richard Marquess Wellesley*, Vol. 2. London.

সহায়ক প্রবন্ধ

ইসলাম, মো. মনিরুল (২০২২)। 'বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভাব'। *বিশ্ববাংলাবীক্ষণ* ২(১)।

কিহানো, আনিবাল (২০২২)। 'ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা/ যৌক্তিকতা'। অনু. মনিরুল ইসলাম। *রাষ্ট্রচিন্তা*। নবম সংখ্যা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৬)। 'ভাষার কথা', *রবীন্দ্র-রচনাবলি [পঞ্চবিংশ খণ্ড]*। ঢাকা : ঐতিহ্য।

Das, Gurcharan (2015). 'Introduction', *The East India Company*, By Tirthankar Roy. India : Portfolio.

Maldonado-Torres, Nelson (2010). 'On the Coloniality of Being'. *Globalization and the Decolonial Options*. Walter D. Mignolo & Arturo Escobar (ed.). London & New York : Routledge.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী : পূর্ববঙ্গের জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব

হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী*

সারসংক্ষেপ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১) বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। *জীবনরহস্য* (১৯৯২), *সময় বড় বলবান* (১৯৯২) এবং *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* (২০০৩) তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এছাড়া *বুকের ভেতরের রস* (২০০৬), *জীবনরেণুর কারিগর* (২০১৫) এবং *মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার* (২০১২) তাঁর জীবন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত গদ্যের সংকলন। এইসব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে দেশভাগ এবং তার পূর্বাপর বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের রেখাচিত্র। লেখকের বেড়ে ওঠা যেহেতু অবিভক্ত বাংলার খুলনা নগরীতে, সেহেতু স্মৃতিকথাগুলোর অনেক অংশেই উঠে এসেছে তাঁর বাল্যকাল থেকে যৌবনাবধি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন এবং সেইসূত্রে পূর্ববঙ্গের (খুলনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের) জনসংস্কৃতি ও জীবনানুষঙ্গের অনুপুঙ্খ বিবরণ। সময়টি দেশভাগের সমকালবর্তী বলে, গ্রন্থগুলোতে চিত্রার্পিত হয়েছে জনজীবন ও জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব। ফলে তাঁর আত্মজীবনীগুলি ব্যক্তিগত পরিসরকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে সামষ্টিক। এতদ্‌পরিসরে যার এষণা আবশ্যক। কেননা, দেশভাগের ইতিহাস উপমহাদেশে বহুচর্চিত হলেও তাতে এর রাজনৈতিক পটভূমি ও পরিণতি যতো গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে, ঠিক ততোটাই উপেক্ষিত হয়েছে জনসংস্কৃতিতে তার প্রভাবের দিকটি। উৎস ও উপকরণের অপ্রতুলতাই তার অন্যতম কারণ। এই সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী হতে পারে বাংলার জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাবের মাত্রা নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ আকর।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-২০০১) জন্ম অবিভক্ত পূর্ববঙ্গের খুলনায়। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সেখানেই। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের কারণে তিনি সপরিবারে কলকাতায় যান এবং পরবর্তী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। ফলে, দেশভাগপূর্ব ও দেশভাগকালীন পূর্ববঙ্গ এবং দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে দেশভাগের প্রভাব ও পরিণতি তাঁর স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর সেইসব স্মৃতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আত্মজীবনীমূলক রচনা, স্মৃতিকথা ও ব্যক্তিগত গদ্যসমূহে। *জীবনরহস্য* (১৯৯২), *সময় বড় বলবান* (১৯৯২) এবং *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* (২০০৩) তাঁর

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এছাড়া *কী খাবো, কী দেখে কিনব* (১৯৯৪), *মনে কি পড়ে* (১৯৯৫), *ঘুম* (১৯৯৭) এবং *নবীন থাকার উপায়* (১৯৯৬) তাঁর স্মৃতিকথামূলক পুস্তিকা ('মিনি বই'[১])। আর তাঁর জীবনীসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত বারোটি গদ্যের সংকলন *বুকের ভেতরের রস* (২০০৬), ত্রিশটি গদ্যের সংকলন *জীবনরেনুর কারিগর* (২০১৫) এবং বৈকুণ্ঠ পাঠক ছদ্মনামে একান্নটি গদ্যের সংকলন *মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার* (২০১২)। শেষোক্ত গ্রন্থগুলোতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ বিবিধ উপলক্ষ্যে এবং বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও বিষয়ে রচিত। ফলে লেখকের জীবনীভিত্তিক পাঠ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরম্পরাহীন। আর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ তিনটি আখ্যানাকারে বিধৃত এবং বিষয়, গঠন, বিন্যাস, প্রসঙ্গ ও পরম্পরা অনুসারে পরিপূর্ণ রচনা। তার মধ্যে *জীবনরহস্য* ও *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি*[২] গ্রন্থদুটিতে উল্লিখিত হয়েছে লেখকের বাল্যকাল থেকে যৌবনাবধি পারিবারিক জীবন এবং সেইসূত্রে খুলনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসংস্কৃতি[৩] ও জীবনানুষঙ্গের বিচিত্র দিক। তার মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা নগর ও তার জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব বিষয়ক তাঁর এষণাসম্ভূত পরিবীক্ষণকে আখরবদ্ধ করেছেন। সে কারণে গ্রন্থগুলি হয়ে উঠেছে দেশভাগের সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক-ইতিহাস পাঠেরও অনন্য দলিল।

দেশভাগের ইতিহাসচর্চার দালিলিক উৎস অনেক। এতদ্‌বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থের সংখ্যাও সুপ্রচুর। সেসবে দেশভাগের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও পরিণতি যতো গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে ঠিক ততোটাই উপেক্ষিত হয়েছে জনসংস্কৃতিতে তার প্রভাবের দিকটি। উৎস ও উপকরণের অপ্রতুলতাই তার অন্যতম কারণ। দেশভাগের ইতিহাসচর্চায় অনস্বীকার্য এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আত্মজীবনীগুলি* গুরুত্বপূর্ণ মূল্য-সংযোজন করে। কেননা, দেশভাগের সমকালবর্তী ঘটনাপুঞ্জের পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে গ্রন্থগুলিতে চিত্রার্পিত হয়েছে তাঁর পরিবীক্ষিত জনজীবনে দেশভাগের প্রভাব ও পরিণতির সানুপুঙ্খ বিবরণ। তার ফলে, ব্যক্তিগত পরিসরকে ছাপিয়ে লেখকের জীবনস্মৃতি হয়ে উঠেছে সামষ্টিক। আর পূর্ববঙ্গের জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব বিষয়ক সূক্ষ্মপাঠ নির্মাণের মাধ্যমে তা হয়ে উঠেছে সামাজিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ আকর।

০২.

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ১৯৪৭ এর দেশভাগ অন্যতম একটি নেতিবাচক ঘটনা। তার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় পাঞ্জাব, আসাম আর বাংলা। বাংলার প্রায় সব মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি একই হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের কবলে পড়ে দেশটা ভাগ হয়ে যায়। সেটা সম্ভব

করতে ১৯৪৬এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো হয় কলকাতা আর নোয়াখালিতে[৪]। খুলনা-যশোরেও দাঙ্গা সংঘটিত হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৮ : ৫৮) যার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে দেশভাগের কিছু বছর আগে গড়ে তোলা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। জনসমাজে যা সংক্রমিত হয় এবং জনমানসকে সন্দেহাতীতভাবে বিভাজিত করে। তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দানা বাঁধে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অস্থিরতা। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ফলে তা আরও পরিপুষ্ট হয়। খুলনা শহরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বেড়ে ওঠেন এমন প্রতিবেশের মধ্যেই। ফলে, দেশভাগের প্রসঙ্গ আসার আগেই তাঁর লেখায় উঠে আসে পুরো চারের দশকের বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক অনুষঙ্গ। মানুষের নিশ্চিন্ত জীবনগুলো তখন কিভাবে বদলে যাচ্ছে? জনসমাজের ভেতরে ক্রমশ কীভাবে তৈরি হচ্ছে দেশভাগের মনোভাব? তাঁর স্মৃতিকথাগুলিতে অনিবার্যভাবেই স্থান করে নেয় এইসব জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর উত্তরগুলো।

২ (ক)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যান দেশভাগের এক মাস চারদিন পর। আত্মজীবনীতে বলেন : '১৯৪৭ সালে ১৪ বছর কয়েক মাস বয়সে মা-বাবার হাত ধরে খুলনা শহর থেকে ট্রেনে শিয়ালদা এসে নামলাম। ১৯ সেপ্টেম্বর।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৯ : ১৩) তার আগের সময়ের কথা বিধৃত হয়েছে তাঁর *জীবনরহস্য* শীর্ষক গ্রন্থটিতে। সেখানে দেশভাগের প্রসঙ্গটি অবতারণা করার আগেই তিনি প্রণয়ন করেছেন খুলনা শহরের মনোরম এক আদিরূপ। সেইসূত্রেই জানা যায়, অবিভক্ত বাংলায় নগরীটি ছিলো তৎকালীন যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি বন্দর-নগর। ব্রিটিশ আমলে যাকে বলা হতো 'নয়াবাদ' বা 'নূতন আবাদ'। (মিত্র, ১৯১৪ : ৩৬) কালক্রমে তারই নাম হয় খুলনা[৫]। আনুমানিক ১৮৮২ সালে অঞ্চলটি যশোর থেকে পৃথক হয়ে জেলায় পরিণত হয়। আর তখন থেকেই হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গের অন্যতম একটি বাণিজ্যিক অঞ্চল। নগরীর সাথেই নৌবন্দর হওয়ার কারণে গড়ে ওঠে বিবিধ বাণিজ্যিক অবকাঠামো। ক্রমশ সেসবের প্রভাবেই বিবর্তিত হতে থাকে জনমানস ও জনরুচি। *জীবনরহস্যে* শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেই বিবর্তনের অভিগমন-রেখাটিকে আমলে নিয়েই অঙ্কন করেছেন জনজীবন-অনুবর্তী একটি জীবনালেখ্য। ফলে তাঁর আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে শহরের শরীর ঘেঁষে বয়ে চলা জোয়ার-ভাটার নদী ভৈরবের কথা এবং ভৈরবের জলে মিশে থাকা তাঁর ছেলেবেলার কথাও। লেখক বলেছেন–

> ভৈরবের বুকে তীর ঘেঁষে লগি ঠেলে তির তির করে এগোই। ডুব দিয়ে ভুস করে ঠেলে উঠতে গিয়ে দেখি, একদিন আর ওপরে ভেসে উঠতেই পারছি না। ... যতবার ভেসে উঠতে যাই কানের পাশে বিরাট বিরাট লোহার নোঙর। একটুর জন্য মাথায় লাগে না। বুঝলাম আমি তখন ভৈরবের জলের নিচে সেই জায়গাটায় আছি পরের পর পাটের বড় নৌকাগুলো সার দিয়ে মাঝনদী অব্দি নোঙর ফেলে ভাসছে। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৭ : ১৮)

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশবের এই নদীটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে খুলনার নাগরিক জীবনের হাজারো গল্প-গাথা। এই নগরে জনজীবনের অনুপূরক যতো 'মিথ' তার প্রায় সবটাই এই নদীকেন্দ্রিক। নদী-অনুবর্তী মিথজীবী মানুষ আর এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা বৃত্তি এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক বিবিধ প্রতিষ্ঠানই শহরটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে কৈশোরক আনন্দ আর উৎসুকতা নিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেসব আবিষ্কার করেছেন। *জীবনরহস্যের* প্রথম পর্বে আখ্যানাকারে বিধৃত হয়েছে তাঁর সেই আবিষ্কারের আনন্দ আর শিশুতোষ বিস্ময়। উদাহরণ–

> ক. এ শহরে দু'টো নদী, আটটা হাই স্কুল, দু'টো কলেজ, তিনটে পার্ক, রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট পাশাপাশি, পঁচিশ ত্রিশখানা দূর্গাপুজো, তিনটে সিনেমাহল–তাছাড়াও একটা নাট্যনিকেতন, গাদাগুচ্ছের লাইব্রেরি, উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, বাজার, বটতলা, রেলকলোনি–কত কি। কলকাতা মোটে শ'খানেক মাইল। ভদ্রলোক, ছোটলোক, বড়লোক, গরীবলোক, পাগল, বোকা, বোবা, হাবা–সবাই সবাইকে চেনে। কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, মসজিদ, কাজি, অরবিন্দ আশ্রম, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণমন্দির, শ্মশান, কবরখানা, গোরস্থান– কোনটারই অভাব নেই। উপরন্তু যাত্রাপার্টি, বেশ্যালয়, টাউন ক্লাব, সঙ্গীতভবন, পুলিশ-লাইন, চাঁদসী, কোর্ট-কাছারি, স্বপ্নাদ্য বিলির সাধু, কাঠগোলা, হেকিম, খেয়াঘাট, হোমিওপ্যাথ, অ্যালোপ্যাথ, কবিরাজ–মায় ওঝা, রোজা–সব সব– কী নেই! (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৭ : ২০-২১)
>
> খ. আমি আর টোটো যখন মেঠো শুকনো রাস্তা ধরে শহরের শেষে নতুন নতুন জায়গা–ময়লাপোতা, বেনেখামার, গোবরচাকা আবিষ্কার করি–তখন সন্দেহ হয় এসব জায়গা 'ভারত ও ভূমণ্ডলে' আছে তো? (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৭ : ৩১)

দৃষ্টান্ত 'ক'তে লেখক 'শহরে দু'টো' নদী' বলতে ভৈরব এবং রূপসাকে বুঝিয়েছেন এবং তুলে ধরেছেন সাংস্কৃতিকভাবে ঋদ্ধ এক শহরের পরিচয়। দেশভাগ পূর্ববর্তী এই শহরে আটটা হাই স্কুল, দুটো কলেজ, সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার পরিচায়ক। একটি শহরের মধ্যে বিদ্যমান তিনটি পার্ক নাগরিকদের রুচিশীল নাগরিক-জীবনের চিহ্ন। শহরের মধ্যকার রেলস্টেশন এবং স্টিমারঘাট ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রমাণ। আর পঁচিশ-ত্রিশখানা দুর্গাপুজোর উল্লেখ থেকে পাওয়া যায় এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় আচার-উৎসবে আড়ম্বরের পরিচয়। তিনটি সিনেমাহল, একটি নাট্যনিকেতন নাগরিকদের সুস্থ সাংস্কৃতিক মানসের পরিচয় বহন করে। 'গাদাগুচ্ছের মতো অসংখ্য লাইব্রেরি' এই নগরের অধিবাসীদের শিক্ষানুরাগ ও রুচিশীলতার পরিচায়ক। এছাড়া আছে আদালত, তার মানে সেখানে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, সকলেরই বাস। তাছাড়া 'ভদ্রলোক ছোটলোক বড়লোক গরীবলোক পাগল বোকা বোবা হাবা' এভাবে সকলের কথা উল্লিখনের মাধ্যমে লেখক বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান ও শ্রেণিভেদহীন সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। শহরে একই সাথে কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, মসজিদ, কাজি ও অরবিন্দ-আশ্রম, ভারত-সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ-মন্দির, শ্মশান, কবরখানা

আর গোরস্থানের অবস্থান চিত্রিত করে অসাম্প্রদায়িক এক জনপদের রূপ। এছাড়া লেখক আরও উল্লেখ করেন যাত্রাপার্টি, বেশ্যালয়, টাউনক্লাব, সঙ্গীতভবন, পুলিশলাইন, চাঁদসী, কোর্ট-কাছারি, 'স্বপ্নাদ্য বিলির সাধু', কাঠগোলা, হেকিম, খেয়াঘাট প্রভৃতির কথাও। যেগুলো বিচিত্রবিধ উপকরণে ঠাসা মুখর এক নাগরিক জীবনের পরিচায়ক। চিকিৎসা-ব্যবস্থাতেও এই শহর ছিলো অবিভক্ত বাংলার মধ্যে অন্যতম। সেখানে আছে হোমিওপ্যাথ, অ্যালোপ্যাথ, কবিরাজ-মায়, ওঝা, সকল ধরনের চিকিৎসাই। এই গ্রন্থেও প্রথম ভাগে লেখক দেশভাগ-পূর্ব নাগরিক জীবনের প্রায় সকল সুবিধা নিয়ে সজীব আর প্রাণবন্ত এক জনপদের বিবরণ দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত 'খ'তে তিনি বলেছেন শহরের বর্ধিত নতুন এলাকাগুলোর কথা। তাঁর স্মৃতিকথায় রূপকথার আবহে বলে যাওয়া 'ময়লাপোতা, বেনেখামার, গোবরচাকা' শীর্ষক সেদিনের বর্ধিত সেই এলাকাগুলো এখনও বর্তমান। এখন সেগুলো শহরের ব্যস্ততম অঞ্চল। এখানেই শহর এবং নগরের পার্থক্যও তিনি স্পষ্ট করেছেন। 'নগর মানে একজন লোক জমি কিনে শহরের গায়ে নিজের নামে নগর বসায়। বীরেন্দ্রনগর। ত্রিশ-চল্লিশখানা একতলা বাড়ি তাতে আমরা সবাই ১২-১৪ টাকার মাসকাবারি ভাড়াটে।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৭ : ২১) আর তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, বীরেন্দ্রনগরে। যাকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'জীবনরহস্যের হস্তিনাপুর' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০৭ : ২১) বলে।

২ (খ)

দেশভাগের অনেক পরে ফেলে যাওয়া 'বীরেন্দ্রনগর' বা 'জীবনরহস্যের হস্তিনাপুরের' স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে লেখক উদ্ধার করেছেন তাঁর শৈশব ও কৈশোরের প্রত্নসময়গুলো। তাতেই ধরা পড়েছে দেশভাগের ডামাডোলে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে আগের সময়ের পার্থক্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীতে আখ্যান আকারে বিধৃত হয়েছে সেই পার্থক্যের দিকচিহ্নগুলোও। যার একেকটা চিহ্ন ধরে ধরে তিনি বলে গেছেন দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বের ছোট্ট এক কিশোরের কথা, বহু-প্রযত্নে তুলে এনেছেন তার অসংখ্য স্মৃতি ও বেদনা। তারই অন্যতম সাক্ষ্য তাঁর 'দেশের বাড়ি' শীর্ষক রচনাটি। সেখানে তিনি বলেছেন–

> দেশের বাড়ি হলো শেকড়। সেখানকার উঠোনের বেলগাছটির বেল অন্য সব বেল থেকে আলাদা। সেখানকার শিউলিগাছের পাতা বেটে রস করে তাতে লোহাদাগ করে খেয়ে নিলে পুরনো কাশি সেরে যেতে বাধ্য। দেশের বাড়ির জিরেনকাটের খেজুরের রস, পুকুরের কালবাউস মাছ–সবই আলাদা, সবই স্বাদে বেশি মিষ্টি। দেশের বাড়ির হাতায় জন্মানো ধানিলঙ্কা অন্য যে-কোনও লঙ্কার চেয়ে বেশি ঝাল। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৫৯)

দেশভাগের বহুবছর পরে দেশের বাড়ির এই চিত্রাংকন মূলত আক্ষেপ থেকে। যাকে কেন্দ্রে রেখে তিনি গাঢ় করে তুলেছেন দেশ হানানোর বেদনা। আর দেশভাগ কতোটা

প্রভাব ফেলেছে বাংলার জনজীবনে তার মান ও মাত্রার নির্ণায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর ঘরের-কথা, পাড়ার-কথা, আটপৌরে জীবনের কথা। তার মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন তাঁর মা আর বাবা। কিশোরী মায়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন–

> অনেক পরে লায়েক হয়ে বুঝলাম, জীবনে অনেক কিছুই ফিরে শুরু করা যায় না। মা তো কাচের পুতুল নয় যে ভেলকিওয়ালার ম্যাজিক মলম দিয়ে ফিরে জুড়ে দেব–নয়তো মাকে বলতাম–মা, তুমি আবার ন'বছরের সেই খুকিটি হয়ে যাও তো–মনে করো আমরা তোমার ছেলেরা কেউ জন্মাইনি–তোমার জীবন আবার ফিরে শুরু হোক। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ১১)

বাল্যবিয়ের শিকার কিশোরী এই মায়ের দুঃখগাথার সাথে দেশভাগের সমীপ্যবর্তী ঘটনাপুঞ্জ এই গ্রন্থে একাকার হয়ে আছে। লেখক তো তখন ছোট, ফলে তাঁরই অনুভবের মাত্রায় তৎকালীন পরিস্থিতিকে তিনি অনেকখানি বিধৃত করেছেন। ফলে নিরেট বিবরণও অর্জন করেছে অনুভববেদ্য চারিত্র্য।

জীবনরহস্যে মায়ের কথা যতবার এসেছে ততোবারই তিনি বলেছেন পিতার কথাও। তাঁর পিতা মতিবাবু, যিনি কোর্টের পেশকার, ঘটি দিয়ে 'ইস্ত্রি করা' জামা পড়তেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন কিছু জায়গা-জমি—তিনটে নদী, দুটো জেলা পার করে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে। সেখানে ছিল কিছু প্রজা, যাদের থেকে তোলা আদায়ের পয়সায় সংসারের কয়েক মাসের খরচ চলতো। ঘুষও খেতেন তিনি। লেখক বলেছেন: 'ঘুষ খেতে হতো বলে বাবাকে বেশি কাজ করতে হত। দক্ষ লোক ছাড়া ঘুষ খেয়ে হজম করা যায় না। ঘুষ মানে ছ'কোনা সিকি, দুয়ানি, বড় তামার পয়সা।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ১২) 'ঘুষ খেতে হতো বলে বাবাকে বেশি কাজ করতে হত' কথাটি এখানে বিশেষ অর্থবহন করে। দেশভাগের সমীপ্যবর্তী জনমানসকে বুঝতে সহায়ক হতে পারে এটি। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে মানুষ তখন ঘুষ খেতে শিখে গেছে কিন্তু আজকের মতো এতোটা নীতিবিবর্জিত হয়নি। তাঁর বাবা ঘুষ খেতেন কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন তিনি। প্রতারণা করে অন্যের টাকা আত্মসাৎ করতেন না। দেশভাগের পরে মধ্যবিত্তের নৈতিকতায় পরিবর্তন ও নব্যমধ্যবিত্তের নৈতিকতার গড়ন বুঝতে কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সদ্য গড়ে ওঠা সেই মধ্যবিত্ত পরিবারে নানা সংকট আছে, আর আছে চিরায়ত জটিলতা। তার মধ্যে পরিবারের প্রধান কর্তাব্যক্তির ব্যক্তিত্বে নীতিও আছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেন–

> নদীর ঘাটে পাটের গদি ছিল মতিলাল ঘাষিরামের। বাবার নামও মতিলাল দিয়ে শুরু। নতুন পিয়ন একদিন একটা খাম ফেলে দিয়ে গেল বাড়িতে। বাবা খুলে দেখেন তার ভেতর চৌষট্টি হাজার টাকার চেক্ একখানা। বাবা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা, ঘাষিরামের গদিতে দিয়ে আয়। ভুল করে দিয়ে গেছে। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ১৩)

চৌষট্টি হাজার টাকার চেক পেয়েও আত্মসাৎ করেন না যে মানুষটি, তিনি আবার দুচার টাকা ঘুষ খান! মাস-মাইনে চৌষট্টি পেরোয়নি, অথচ তাঁর চরিত্রে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ

করবার মানসিকতা নেই। ফলে তাঁর চরিত্রে একই সঙ্গে দ্বৈতসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের মধ্যবিত্ত পরিবারের উদ্ভব হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলেই। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয় সাধারণ বেতনভুক্ত পেশাজীবীরাও। (Williams, 1976 : 51-59) তারা একদিকে যেমন পূর্বতন নীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারেন না, আবার পুরোপুরি ঔপনিবেশিক মননপুষ্টও হয়ে উঠতে পারেন না। অন্যদিকে, আর্থিক নানান সংকটের মধ্যেও বাড়িতে শোভা পায় সাহিত্য পত্রিকা। আখ্যানে দেখা যায় : মধ্যবিত্ত মতিবাবুর পরিবারে আদায়ের অর্থ-সামগ্রী ফুরিয়ে গেলে নিত্য-অনুষঙ্গ দারিদ্র্য। এই সময় মতিবাবুর আদায়ের অর্থ নিয়ে ফেরত আসতে বিলম্ব হলে ছেলেদের একমাত্র কাজ নদীর ঘাটে অপেক্ষা। অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলে পরিবারে অর্থ যোগানের উপাদান হয়ে ওঠে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) সম্পাদিত *প্রবাসী* (১৯০১) পত্রিকা। এই পত্রিকার পুরানো কপিগুলো বিক্রি করেই তাঁর মা সংসারটাকে কোনোমতে চালিয়ে নেন। এমনই পরিস্থিতিতে লেখক বলেন : 'অতএব, পাঁচআনা সেরে তিন বছরের বাঁধানো 'প্রবাসী' মুদিখানায় চলে গেল। নিয়ে এলাম হলুদ, সর্ষের তেল, মুসুরির ডাল।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৩১) বিদ্বান হওয়ার শ্লাঘা বিসর্জন দিয়ে উপনিবেশিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ততোদিনে শিক্ষাকে কাজের উপায় বানিয়ে তুলেছে। শিক্ষা হয়ে উঠেছে কেবলই উপার্জনের উপায়। ফলে, এই অনটন থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে লেখকের মাতা-পিতা সন্তানদের শিক্ষা শেষের প্রতীক্ষা করেন। লেখকের দাদাও মাকে সেরূপই সান্ত্বনা দেন। লেখকের বড় দাদা (ডাকনাম, তনু) চিঠিতে মাকে লেখেন : 'বারো তারিখের ভেতর ফি জমা দিয়ে পড়তে বসে যাবো। আর তো ক'মাস পরেই ফাইনাল–পাশ দিয়ে চাকরিতে বসলে তোমার আর কষ্ট থাকবে না মা।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৩৮) ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি ছেলের মধ্যে তৈরি হওয়া এই যে কেরানি-মানসিকতা, লেখক তাকে মৃদু শ্লেষও করেন এবং উল্লেখ করেন এই সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পূর্বপুরুষ পেশায় ছিল কৃষক অথবা নুনের গোলায় শ্রমিক। লেখক বলেন–

> আমাদের অনেক বন্ধুরই বাবা বংশে প্রথম চাকুরিজীবি। যে-কোন বাঙালীর গা একটু চুলকোলেই দেখা যাবে–খুব জোর চার কি পাঁচপুরুষ আগে তারা মনে হয় হেলে চাষা ছিল–না হয় নুনের গোলায় জল ছাকত। কিংবা ওরকম কিছু একটা করত। চাকরির ইতিহাসের বয়স তো বেশি নয়। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৬৮)

উদ্ধৃতিটিতে যে শ্রেণিটিকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্রুপ করলেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে সেই শ্রেণির বাঙালি সন্তানদের চলনেও এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি সন্তানেরা ব্রিটিশদের চলনের অনুকরণ করতে শেখে। সকাল-সন্ধ্যের পুজো-সন্ধ্যা আহ্নিক, কলেজ-কাছারির ভিড়েও সে পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়। তাদের স্নান করা, স্যান্ডেল পরা, মুখের ভাব সবকিছুর 'স্টাইলেই' এক নূতনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। লেখক বলেন–

> একেবারে সকালে পুজো আচ্চা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ভিড়। বেলা ন'টা দশটায় স্কুল কলেজ কাছারির ভিড়। বিশেষ করে যারা বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের চান করার স্টাইলই আলাদা। তারা চান করে পা ধুয়ে সাবধানে ঘাটে রাখা স্যাণ্ডেলে পা গলাত। পাছে ময়লা লাগে পায়ে। মুখের চেহারা অন্যমনস্ক। হাতে সোপকেস। ধুঁধুলের খোসা। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৪৪-৪৫)

দেশভাগের কিছুদিন পূর্বে, অনটনের মধ্যবিত্ত সংসারে পরিবর্তিত সময়ের এই বড়ো ছেলে, মায়ের থেকে যে মাত্র বারো বছরের ছোট, কলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। 'যেনো কোনো দিদিকে নিয়ে ছোট ভাই সিনেমায় যাচ্ছে।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ১২) বয়সে ছোট বলে অবধারিতভাবেই লেখকও জুড়ে যান তাঁদের সাথে। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের 'উল্লাসিনী' সিনেমা হল আর ছবি বিশ্বাস অভিনিত 'প্রতিশ্রুতি' সিনেমার কথা। লেখক বলেনঃ 'পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বড়দা মাকে নিয়ে উল্লাসিনী সিনেমায় 'প্রতিশ্রুতি' দেখতে গেল। সঙ্গী–আমি আর টোটো। চন্দ্রাবতীর ঘর থেকে ছবি বিশ্বাস বেরিয়ে এলেন'। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৩৮)

২ (গ)

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় উপেক্ষণীয়ভাবে চর্চিত হওয়ায় তাকে খুব দূরের জিনিস মনে হলেও, ভারতবর্ষের জনজীবন ও জনসংস্কৃতিতে সেই যুদ্ধ কতোটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীগুলো বিশেষত *জীবনরহস্য* প্রাতিস্বিকভাবে তার সাক্ষ্য বহন করে। একথা সর্বজনবিদিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব-রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি বিষফলমাত্র। (নেহেরু, ২০১১ : ৫১৮) ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসক ব্রিটিশরা মিত্রশক্তিতে যোগ দিয়ে এ যুদ্ধে অংশ নেয়। ফলে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকেও অংশ নিতে হয় সেনা পাঠিয়ে। ভারতবর্ষ আশ্বাস পায়, এই যুদ্ধ যুদ্ধের মূলোৎপাটন করবে এবং স্বরাজ আনবে। ফলে, ভারতবর্ষও এই যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর বৃহৎ-ক্ষতি ইতিহাসে বহুচর্চিত হলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার আলোচনা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতির মতো গৌণ বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ, এ যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত জনপদ ও জনসংস্কৃতিকেও বিপন্ন করে তুলেছিলো, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী সেই সাক্ষ্য দেয়। এসময় 'সবচেয়ে ধাক্কা খায় যৌথ পরিবারের ধারণাটি। ঠিকাদারির পয়সা সমাজের শরীরে ঢুকে পড়ে। ন্যায়-নীতির ধারণা জায়গা ছেড়ে দেয় পয়সার শক্তিকে, কুবুদ্ধিকে। ভয় ভক্তি ভালোবাসা উবে যায়।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৬১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ যে প্রত্যন্ত জনপদ খুলনার ভৈরবেও আছড়ে পড়েছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় লেখকের *জীবনরহস্যের* আখ্যানে। মিত্র শক্তিতে অংশ নেওয়া আমেরিকান সেনাদের জাহাজ নোঙর ফেলে ভৈরবের বন্দরে। ভৈরবের তীর হয়ে ওঠে যুদ্ধঘাঁটি। প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিমান উড়তে থাকে

আকাশে। মৃত্যুশঙ্কাগ্রস্ত এরূপ প্রতিবেশ জনমনে তৈরি করে অনিশ্চয়তা। ভৈরবের তীর ঘেঁষে বেড়ে ওঠা জীবনগুলো ব্রিটিশদের সাথে পরিচিত বহুদিন কিন্তু আমেরিকান দেখে এই প্রথম। ফলে, পরিচিত হয় আর একটি সংস্কৃতির সাথে। লেখক বলেন–

> গাদা গাদা সাহেব খালি গায়ে কাজ করছে। নদীর পাড়ে। নদীর মাঝখানে গাদাবোট। সেখানেও খালিগায়ে সাহেব। বিরাট কাঠের বোর্ডে সাদা করে ইংরেজিতে লেখা–'রুজভেল্ট জেটি'।
>
> টোটো তো অবাক। আমেরিকান দেখবি? দ্যাখ। সাদা সাদা আমেরিকান। ওদের ভেতর কয়েকটা লালচে ছিল। বেশ কয়েকটা ছিল একদম কালো। নিগ্রো। নির্জন নদী তীরে এমন পেল্লায় ময়দানবী কাণ্ড তার আগে কখনো দেখিনি। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ২৪)

আমেরিকানদের আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলের মানুষের চোখে উন্নত মানুষ হলো ব্রিটিশরা। যাদের আছে 'উন্নত সংস্কৃতি' এবং যারা সুদূর ইউরোপ থেকে এসে ভারতবর্ষ শাসন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভৈরবের তীরে আমেরিকানদের আগমন ঘটায় এই অঞ্চলের মানুষ জানতে পারে, পৃথিবীতে আরেকটি 'উন্নত জাতি' আছে, যারা আমেরিকান। নানা বর্ণের আমেরিকান। সেই সাথে এই অঞ্চলের মানুষ পরিচিত হয় রুজভেল্টের নামের সাথে। আমেরিকানদের গাদা-বোটের সমারোহে আর 'পেল্লায় ময়দানবী কাণ্ডে' অনেকেরই ঠিকাদারি, অর্ডার সাপ্লায়ার, দালালিসহ কোনো না কোনো চাকরি জোটে। ইটের রাস্তা তৈরি হয়। যদিও তাতে কারোই পরিবারের বেহাল দশার খুব একটা পরিবর্তন হয় না, তবুও সকলেরই বলিদানের মাত্রা বাড়তে থাকে। ভৈরবের তীর ঘেঁষা সহজ, সরল, সাধারণ মানুষের সেইসব বাধ্য-বলিদানের ইতিহাসই তুলে আনেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। আখ্যানে উঠে আসে বিজয় মোদকের স্ত্রীর সম্ভ্রমহানীর বিবরণ–

> সারা পাড়ায় চাপা গরম। আসলে তখন কানেকটিকাট কিংবা ওহাইওর যুবা মাকিন সৈনিকরা বিজয় মোদকের অল্পবয়সী বউকে পালা করে লাইন দিয়ে রেপ করেছিল। এসব দিব্যি অনায়াসে হয়ে যাচ্ছিল। কেউ যে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে–তেমন কেউ ছিল না। যেমন আর কি একসময় মহাভারতে হয়ে গেছে। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৪৬)

ভৈরব নদীতে ঘাঁটি করে আমেরিকানরা বাঙালি মেয়েদের 'বলাৎকার' করে অবলীলায়। সেই ঘটনাকে লেখক তুলনা করেছেন *মহাভারতের* সাথে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় সভাপূর্ণ প্রবীণ সভাসদগণ কেউ যেমন প্রতিবাদ করেনি, বিজয় মোদকের স্ত্রীর সম্ভ্রমহানীর সময় তেমনি কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না, করতে পারে না। কেননা, ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থেকে 'ভূমিপুত্ররা' সে ক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। এমনই এক প্রসঙ্গ বিধৃত করতে *জগতের লাঞ্ছিত* (২০০৬) গ্রন্থটিতে ফ্রাঞ্জ ফানো (১৯২৫-১৯৬১) বলেছেন–

> ভূমিপুত্রের উপর অত্যাচার চালানো হলে, তার স্ত্রীকে হত্যা করা হলে, বা ধর্ষণ করা হলে, সে কারো কাছে অভিযোগ করে না। অত্যাচারী সরকার ইচ্ছা করলে প্রতিদিনই তদন্তের

> জন্য বা সংবাদ সংগ্রহের জন্য কমিশন গঠন করতে পারে, কিন্তু ভূমিপুত্রের দৃষ্টিতে এইসব কমিশনের অস্তিত্ব নেই। (ফানো, ২০০৬ : ৬৯)

ফ্রাঞ্জ ফানোর এই উদ্ধৃতি থেকে ঔপনিবেশিকতার ফলে বিবর্তিত ভূমিপুত্রদের মানসিকতার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় এবং ধারণা করা যায় যে, কেনো বিজয় মোদকের স্ত্রীর ধর্ষণ স্বচক্ষে দেখেও কেউ প্রতিবাদ করে না। ফ্রাঞ্জ ফানোর এই দৃষ্টান্তটি তাঁর দেশের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ছেঁকে জারিত। প্রায় একই ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষেরও। প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন এখানেও কোনোদিন এরূপ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যে সময়ের কথা লেখক এখানে বলেছেন, ব্রিটিশ শাসন থাকলেও এসব ব্যাপারে কেনো ব্যবস্থা তখনও গ্রহণ করা হতো না। সেই সুযোগে আমেরিকান সেনারা শুধু বলাৎকার করেই ক্ষান্ত থাকে না। শহরে গড়ে তোলে প্রথম 'পতিতালয়' (খুলনা শহরের ভেতরেই বিরাজমান 'ফুলতলা পতিতালয়' আজও সেই সাক্ষ্য বহন করছে।) পতিতালয় প্রতিষ্ঠার পর আমেরিকান সৈন্যরা দিনে-দুপুরে অর্ধনগ্ন পতিতাদের নিয়ে সময় কাটাতো উন্মুক্ত অঞ্চলে। পতিতাদের সাথে মিলিত হতো দিনে-দুপুরে, লোকজনের সামনে। তার দর্শক হতে হতো স্কুলের শিক্ষার্থীদেরও। লেখক বলেছেন–

> সুদূর আমেরিকার চার সোলজার চোতমাসের দুপুরে চারটি লোকাল বেশ্যা নিয়ে শহরের মাঝখানে বিরাট তারের পুকুরে সুইমিং কম্পিটিশন চালাল একদিন। প্রায় সন্ধ্যে অব্দি। আটজনেরই পরনে সুইমিং ট্রাংক। শহরের চার-পাঁচটি স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছুটির পর স্টুডেন্টরা পুকুর ঘিরে সেই সুইমিংয়ের দর্শক। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৬৬)

উদ্ধৃতিটিতে লেখক যে দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন, তা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। স্কুলের বাচ্চারা সেই দৃশ্যটি দেখে এবং অবধারিতভাবে তাদের মনে বিরূপ রেখাপাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের জনজীবন ও জনসংস্কৃতিকে কতোটা বিপন্ন করে তোলে, এটি তার একটি দৃষ্টান্তমাত্র। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত *জীবনরহস্যের* পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত খুলনা শহরের মানুষদের জীবনকে কতোটা বিপন্ন ও অনিরাপদ করে তোলে। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিলক্ষ্য কেবল সেটুকুই নয়। তিনি যেভাবে চিত্রগুলো উপস্থাপন করেন, তাতে বোঝা যায়, এসবের সবচেয়ে বড়ো অভিঘাতটা মূলত সাংস্কৃতিক। বাঙালি সংস্কৃতির এবং মূল্যবোধের মর্মমূলে আঘাত করে যা এই জনজীবনের স্পন্দন ও জনসংস্কৃতির ধারাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অভাব, অনটন, অনিশ্চয়তার পাশাপাশি আচার ও মূল্যবোধে এই আঘাত জনজীবনের স্থিরতাকে বিপন্ন করে মানুষকে উন্মুল করে তোলে।

০৩.

উপর্যুক্ত প্রতিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে খুলনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এতোটাই বদলে যায় যে, সেই বদল এই জনপদের মানুষের

অন্তঃস্থের আঁচড় কাটে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মায়ের কাছে পাঠানো তাঁর দাদার চিঠিতেও পড়ে সেই বদলের ছাপ। দেশভাগ-পূর্ব রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানুষের নৈমিত্তিক বোধগুলোরও রূপান্তর ঘটে, বদলে যেতে থাকে ভাষা। লেখক বলেন–

> তখন তনুদা পড়ে যাচ্ছে বড়দার চিঠি– মা, আমি নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছেছি। –তনুদাকে আবার থামালো মা। দেখলি–দেখলি? কি সুন্দর লিখেছে 'পৌছেছি'–আমরা লিখি–নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৩৭)

শুধু চিঠির বাংলাই নয়, এসময় খবরের কাগজের বাংলা, রাজনৈতিক দলের বাংলাতেও আসে পরিবর্তন। লেখক বলেন : 'একটা বাংলা খবরের কাগজ আসতে লাগল কলকাতা থেকে। তাতে দন্ত্য স-এর জায়গায় সর্বত্র ছ বসানো। মুসলিম লিগের বাংলাও আলাদা।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৯) অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশভাগের সন্নিকটবর্তী সাম্প্রদায়িকতার হাওয়ায় জনমানুষের জীবনের ধরন বদলানোর সাথে সাথে বদলে যায় চিঠির ভাষা, রাজনীতির ভাষা, খবরের কাগজের ভাষা। বদলে যায় দুর্গাপুজোর ধরন। বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ যে দুর্গাপুজো, তাতে দুর্গা দেবীর পরিবারেও দেখা যায় সেই ভাগের চিহ্ন। এর আগে পর্যন্ত দুর্গাপূজা করা হতো এক চালিতেই কিন্তু এসময় দুর্গাপুজোর ধরনে পরিবর্তন আসে। দেবী দুর্গার এক চালি, অন্যান্য দেব-দেবীরও আলাদা আলাদা চালিতে পুজোর রীতির প্রচলন হয়। এছাড়া পুজো মণ্ডপে 'লাউডস্পিকারে' গান বাজানোর রীতিও শুরু হয় এসময় থেকেই। তার মাধ্যমে ঘটা করে হিন্দুরা আরো বেশি হিন্দু হতে থাকে এবং সেই আড়ম্বর দূর-দূরান্তের মানুষকে জানান দিতেই শব্দ-দূষণের এই আয়োজন। লেখক বলেন–

> সেবারে দুর্গাপুজোয় প্রথম দেখলাম–এক এক দেবীর–এক এক দেবের এক এক চালি। এর আগে মা দুর্গা এক চালিতেই সব ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে মণ্ডপে দাঁড়াতেন। আর দেখলাম–ছোট একটা কলের গান ইলেকট্রিক তার দিয়ে জুড়ে মাইক্রোফোন নামে একটা বাক্‌সের ভেতর গলিয়ে দিলে সে গান বহুদূর অব্দি শোনা যায়। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৮)

এই সময় হিন্দুদের ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসংগীতচর্চার ঢল পড়ে যায়। ধর্মে ব্রাহ্ম হলেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দুয়ানির এক অন্যতম চিহ্ন হয়ে ওঠেন। এই সংগীত আগে লোকে যে যার বাড়িতে নিজের মতো চর্চা করতো। আড়ম্বর বা জানান দেবার বিষয় ছিল না। কিন্তু দেশভাগের হাওয়ায় রবীন্দ্রসংগীত শেখার জিনিস হয়ে ওঠে–

> পুজোর পরেই হাতে-লেখা পোস্টারে দেখলাম–যত্নসহকারে বাড়ি গিয়া রবীন্দ্রসংগীত শিখাই। এতদিন এই সংগীত যে যার বাড়িতে গাইত। এবারে রবীন্দ্রসংগীত সবার শেখার জিনিস হয়ে উঠে এল। এর আগে এভাবে দেখিনি। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৮)

ভাষার হিন্দুয়ানি-মুসলমানি বিভাজন, শব্দে 'স' এর বদলে 'ছ', হিন্দুর আরও বেশি হিন্দু আর মুসলমানের আরও বেশি মুসলমান হয়ে ওঠা, পূজার অতিআড়ম্বর, লাউডস্পিকারে পূজার গান বাজানো, মুসলমানদের মসজিদে মাইক সংযোজন,

রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু করে তুলে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বাড়াবাড়ি ইত্যাদি ঘটনাপুঞ্জ দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে বাঙালির সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার চিহ্ন। ব্রিটিশদের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির কবলে পড়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সমাজে গড়ে উঠতে থাকে এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। সমাজে স্থান করে নেয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এই রাজনীতিই সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন। এসময়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের একটি উল্লেখযোগ্য এবং নতুন ধারক-বাহক-স্মারক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। (চৌধুরী, ২০১৬ : ৬১) আবহমান বাংলার সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিস্থাপকতায় তার আঘাত প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন–

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর-ভেতরেই পাকিস্তান-দাবি প্রবল হয়ে উঠল। সে দাবি ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার দাবির থেকেও যেন প্রবল হয়ে উঠল। স্বাধীনতার দাবি ছিল, মুক্তির দাবি, অনেক ত্যাগের পর। আর পাকিস্তান-দাবি ছিল বহুদিনকার সামাজিক সম্প্রীতি ছিন্ন ভিন্ন করে বিভক্ত হওয়ার দাবি, বিভেদের দাবি, বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি। এর ভেতরে ছিল মনোভঙ্গের যন্ত্রণা, সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা তছনছ করে দেওয়ার মর্মবেদনা। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৬১)

মুসলিম লীগের প্রভাবে 'রাজনীতির মাতাল' হাওয়া খুলনার জনজীবনকেও প্রভাবিত করে। যার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে শ্রেণিবৈষম্য। কেননা বহু বছর থেকেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই অঞ্চলের সকল মানুষ গুটিকয়েক অভিজাত হিন্দুদের দ্বারা নিষ্পেষিত। যারা কেউই এখানকার নয়, কলকাতার বাবুশ্রেণি। (Mukherjee, 1976 : 233) এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান প্রায় সবাই অশিক্ষিত ও দরিদ্র। এই জনপদে সকলেরই মিলেমিশে বাস। অথচ মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্ররোচনায় অশিক্ষিত এবং রাজনীতি, রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে অজ্ঞ মুসলমানগণ মনে করে হিন্দু মানেই শত্রু। এই বিভাজনের বাইরে থাকে না স্কুলের ছেলেমেয়েরাও। মুসলমান ছেলেরা আলাদা লাইন করে স্কুলে যায়। তাদের মুখে মুসলিম লীগের কথা। যেনো মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে হলে পূর্বশর্ত হিসেবে মুসলমানই হতে হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব স্কুলের ছেলেদেরও কিভাবে বিভক্ত করে ফেলেছিলো তার দৃষ্টান্ত–

> স্কুলে ঢোকার মুখে একদিন দেখি হায়দার আলি, সায়েদুল ইসলাম, আসফাকুল, আনোয়ারদা–সবাই আলাদা লাইন করে স্কুলে ঢুকছে। কি ব্যাপার? ওরা বলল, আমরা তো পরশু থেকে মুসলিম লিগ হয়ে গেছি। ... এতদিনের ক্লাসফ্রেণ্ডরা সবাই আলাদা লাইন করে স্কুলে ঢুকতে লাগল। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৫৯)

শিশুরা রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজ পরিবর্তন বোঝে না। কিন্তু এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতার বীজ যতটা প্রকট হয়েছে, প্রবীণরা পরধর্মের প্রতি যে পরিমাণ বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছেন, তার সমপরিমাণ প্রভাবই পড়েছে শিশুমনে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের প্রভাবে সুস্থ সংস্কৃতিভিত্তিক একটি সমাজ, য

একইসাথে শ্রম ও আচারকেন্দ্রিক, দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে কিভাবে তা ভেঙে পড়েছিলো, শিশুমনের এই অভিঘাত আর আচরণের এই অস্বাভাবিকতা থেকেই সেটা বোঝা যায়। সর্বব্যাপী বিস্তৃত এই বিষবাষ্পে প্রবুদ্ধ হয়ে চিরদিন সহাবস্থান করা হিন্দু-মুসলমানেরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। সম্প্রীতির সুষ্ঠু সম্পর্কের মধ্যে দেখা দেয় অবিশ্বাস। লেখক বলেন–

> যুদ্ধ এসে আমাদের শৈশব গিলে খায়। বাতাসে নারায়ে তাকবির, বাতাসে পার্টিশনের গন্ধ, অবিশ্বাসের তাত। কবে নাকি আমাদের পূর্বপুরুষরা অবিচার করেছিলেন–তার কড়ি গুনতে গিয়ে দেশটাই নাকি আমাদের থাকবে না। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৬৫)

এই উদ্ধৃতিটিতে 'পূর্বপুরুষ' বলতে লেখক রাজনৈতিক পূর্বপুরুষ কংগ্রেসকে বুঝিয়েছেন। ততোদিনে কংগ্রেস তার সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে হয়ে উঠেছে অভিজাত হিন্দুদের দল। ফলে, মুসলিম সমাজে তার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। অথচ গঠনকালের দর্শনের কথা ভেবে শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলাতেও তার প্রবল লোক-লজ্জা ও আপত্তি। (আহমদ, ২০১৬ : ৪২) এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে একদার অভিজাত মুসলমানদের দল মুসলিম লীগ বলতে শুরু করে মুসলিম-সম্প্রদায়ের সার্বিক অধিকারের কথা। তাকে উপলক্ষ্য করেই জনপ্রিয় করে তোলে আলাদা দেশের দাবি। দুই দলের কপট রাজনৈতিক চালে বিভক্ত হয়ে পড়ে মানুষ, আর অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে দেশভাগ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই জনপদের কোনো মানুষ প্রবল আবেগে দেশের অবধারিত এই পরিণতিকে উপেক্ষা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন তাঁর সত্তর বছর বয়সী এক 'পিসেমশাইয়ের' কথা। সাধারণ, সরল সেই মানুষটি দেশভাগকে কোনোদিন স্বীকার করেননি। 'পাকিস্তান' বা 'হিন্দুস্থান' শব্দগুলোকে কখনও মুখেই নেননি তিনি। একার দাঢ্যে আমরণ এই দেশটাকে তিনি ডেকেছেন ভারতবর্ষ বলে। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৬৬)

০৪.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই পিসেমশাইয়ের নাম সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বা তাঁর মতো লোকেদের আবেগ, অনুভূতিকে উপেক্ষা করেই দেশটা ভাগ হয়ে যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মের শহর খুলনা হয়ে যায় পাকিস্তানের অংশ। অথচ তখনও ঠিক হয়নি পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভাগ্য কী হবে? দেশভাগোত্তর সেই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের নিশ্চিত জীবনও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন–

> গুরুজনরা বলতে থাকলেন–এখানে আর থাকা যাবে না। তার মানে–এই খেলার মাঠ, এই পুকুরঘাট, এই নদীর পাড়–এই সোয়েদুল, বজলা, ফেরদৌসদা–সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তা কখনো হয়?...জানিস, কাল করাচিতে পাকিস্তান হয়েছে। ঢাকাতেও পাকিস্তান হয়েছে–বাড়ি ফিরে ভেতরের ঘরে দেখি–মা গম্ভির হয়ে বসে। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হচ্ছে আজ, অথচ মায়ের মুখে কোন হাসি নেই। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৮৩)

দেশভাগের ফলে উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত লেখকের মায়ের মুখের হাসি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। লেখকের পরিবার চলে যায় কলকাতায়। এর আগেও পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ প্রায়ই কলকাতায় যেতো। অফিস, আদালত, চাকরি সবই তো তখন কলকাতায়। কিন্তু এ যাওয়ার মানে ভ্রমণ করতে বা কোনো কাজের সূত্রে যাওয়া নয় দেশ ছেড়ে যাওয়া, শৈশব-কৈশোর ছেড়ে যাওয়া। নিশ্চিন্ত গৃহস্থজীবন ফেলে নতুন জায়গায় গিয়ে তাঁরা পান অনিশ্চিত এক বস্তিজীবন। যে বাড়িটাতে ওঠেন সেখানে সবসময় 'যাত্রাপার্টির রিহার্সেলের মতো' এলোপাথাড়ি চিৎকার, মেঝেতে বড় বড় ট্রাঙ্ক ঘষার শব্দ, শিশুদের কান্না। স্বভূমিতে নিমিষেই তারা হয়ে ওঠেন পরবাসী। বাস্তুহারা এই পরিবারের এক সন্তান, লেখকের সেই দাদা যে মাকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, 'আর তো ক'মাস পরেই ফাইনাল–পাশ দিয়ে চাকরিতে বসলে তোমার আর কষ্ট থাকবে না মা', (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৩৮) দেশভাগের আঘাতে বি.এস.সি পড়ুয়া সেই ছেলেটি আত্মঘাতী হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সুইসাইড। লাশ পাওয়া যায় লেক হাসপাতালে। ছেলেকে হারিয়ে মা হয়ে যান আধা-পাগল। বাবা নির্লিপ্ত। মেজো ছেলে গম্ভীর, বড় ছেলে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে কোনদিন ফিরবে না জেনেও হয়তো অপেক্ষা। উদ্বাস্তু জীবনের লড়াইয়ে একসময় তনুকে হারানোর শোক দূরবর্তী হয়ে যায়। কলকাতার নিত্যকার সংগ্রামী জীবনে তবু ধোঁয়াটে হয় না বাল্যস্মৃতি। স্মৃতির ভূমিতে লেখক ফিরে আসেন বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, দেশভাগের পঁচিশ বছর পর। ফিরে দেখেন, কিছুই আর আগের মতো নেই লেখক বলেন–

> সেই যে চলে আসি ছেলেবেলার শহর পেছনে ফেলে–তার ছবি সবসময় মনে ভাসত। ছবিটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনের ভেতর। সেই কাঁটা তুললাম ঠিক তার পঁচিশ বছর পরে। পূর্ব পাকিস্তান তখন বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে শহরে ঢুকে দেখি কিছুই চেনা যায় না। মনে হয়েছিল–শহরে ঢুকতেই রাস্তার ঘাসগুলো আমায় চিনতে পারবে। শেষে বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছগুলোর মুখোমুখি হলাম। ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম–তোমাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুর্দাকে বালকবয়সে বাবার সাঙ্গে এসে কিনে নিয়ে গিয়েছি। সেই সুবাদে তোমাদের সঙ্গে আমার কি আজকের সম্পর্ক? ইলিশরা সেদিন কেউ কোন জবাব দেয়নি। (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৯০)

উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায়, ছেলেবেলার শহরের যে ছবি সবসময় লেখকের 'মনে ভাসত', যা মূলত 'কাঁটার মতো বিঁধে ছিল মনের ভেতর' ইতোমধ্যে সময় তাকে গ্রা করেছে। এই শহরে আবার আসার আগে তাঁর মনে হয়েছিল, 'শহরে ঢুকতেই রাস্তা ঘাসগুলোও তাঁকে চিনতে পারবে' কিন্তু 'ছোটবেলার শহরে ঢুকে' লেখক নিজেই কি চিনতে পারেন না। তখন বুঝতে পারেন, তাঁর 'জন্মভূমিটি' এখন 'পরদেশ' হয়ে গেছে। আর যে দেশটিকে এখন নিজের বলে ভাবতে তিনি বাধ্য হন, সেখানে চিরদিন তিনি 'পরবাসী'। জন্মের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধি হয়, দেশভাগ মানুষের স

কেড়ে নিয়েছে : স্মৃতি, সম্পর্ক, আবেগ সব। বিনিময়ে দিয়েছে কখনও না চাওয়া, কখনও স্বীকার করতে না পারা এমন এক পরিচয়, যা থেকে কোনোদিনই আর পরিত্রাণ নেই।

০৫.

আত্মজীবনীতে বিধৃত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস্তব বেদনাগুলোই হয়ে উঠেছে রূপকথা। স্মৃতিকে আখ্যানাকারে উপস্থাপন করাটাই তার কারণ। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, সময়। লেখক নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। সেকারণে *জীবনরহস্যের* শুরুর বাক্যেই তিনি বলেছেন, 'সময়ের দূরত্বে সাধারণ কথাই রূপকথা হয়ে যায়।' (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১১ : ৯) দেশভাগের অভিঘাত একেকজন মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক জীবনে কতোটা প্রভাব ফেলেছিলো, লেখকের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি সেই রূপকথারই বিয়োগান্তক নমুনা। যেখানে দেশভাগপূর্ব খুলনার জনসংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তারকারী দেশভাগকেন্দ্রিক বিবিধ ঘটনাপুঞ্জ এবং তদ্‌সঞ্জাত উত্তেজনা ও বিকারজাত পরিবর্তনের অভিব্যক্তিবাদি অনুভবসমূহ চিত্রার্পিত হয়েছে। আর তার মাধ্যমেই পূর্ববঙ্গের জনজীবন ও জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের প্রভাব কতোটা সুদূরপ্রসারী সেটা উপলব্ধি করা যায়। সেই উপলব্ধিরই সম্ভাব্য রেখাচিত্র ধরে আজকের বাংলাদেশের জনসংস্কৃতিতে দেশভাগের উপজাতসমূহের প্রভাবের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব। এই এষণায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি সাহিত্য হিসেবে সার্থক হয়েও ঐতিহাসিক এই দায় নির্বাহের মাধ্যমে হয়ে উঠেছে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনন্য দলিল।

টীকা

১. কলকাতার দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *রচনাসমগ্র* গ্রন্থ পরিচয় অংশে *কী খাবো, কী দেখে কিনব, মনে কি পড়ে, ঘুম* এবং *নবীন থাকার উপায়* গ্রন্থগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে 'মিনি বই' হিসেবে।

২. *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* মূলত *জীবনরহস্য* গ্রন্থটিরই পুনর্মুদ্রণ। বাংলাদেশের 'কাগজ প্রকাশন' থেকে পুনর্মুদ্রণের সময় (২০০৩ সালে) নতুন এই নামকরণ করা হয়। এছাড়া গ্রন্থটির শুরুতে যুক্ত করা হয় মাত্র একটি অধ্যায়। তাতে মাত্র কয়েক পাতাজুড়ে বিধৃত করা হয় ১৭৭০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কালপর্বের ইতিহাস। গ্রন্থটির মূল এষণার সাথে যা সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। কলকাতার 'মিত্র এন্ড ঘোষ' প্রকাশনি থেকে প্রকাশিত *জীবনরহস্য* শীর্ষক গ্রন্থটিও এখনও সহজলভ্য। সেকারণে *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের উদ্ধৃতি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল বইটি থেকে অর্থাৎ *জীবনরহস্য* থেকেই এই প্রবন্ধের অধিকাংশ পাঠ ও উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে।

৩. জনসংস্কৃতি বলতে এই প্রবন্ধে প্রান্তিক জনপদের সেই জীবনশৈলীকে বোঝানো হয়েছে, আবহমান কাল ধরে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যা বিকশিত, সামাজিক বির্তনের স্বাভাবিক ধরনে সংশ্লেষিত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ দ্বারা নিরীক্ষিত এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় সমাজ-মানসের ধরন ও অনুভূতির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

৪. ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবের অব্যবহি পরেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পেশ করে। কংগ্রে কর্তৃক তখন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় সংঘটিত হয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। তার প্রভাব পড়ে নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর মুসলমানরা আক্রমণ করে হিন্দুদের উপর। সূচনা হয় পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার। প্রায় চার সপ্তাহ ধরে চলমান সেই দাঙ্গায় বহুলোক হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন আ ধর্মান্তরকরণের শিকার হয়। পরে সেই দাঙ্গা বিহার, পাঞ্জাব এবং দিল্লীতেও ছড়িয়ে পড়ে।

৫. খুলনার নামকরণ নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি হলে 'খুলনা' নামের উৎপত্তি হয়েছে কবি কঙ্কনের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উল্লিখিত ধনপতি সওদাগরের পত্নী 'খুল্লনার' নাম থেকে।

সহায়ক গ্রন্থ

আহমদ, আবুল মনসুর (২০১৬)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল (২০০৭)। *জীবনরহস্য*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স।

——(২০১১)। *রচনাসমগ্র*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

——(২০১১)। *দেশের বাড়ি*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

——(২০১৯)। *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি*। ঢাকা : কাগজ প্রকাশন।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০১৬)। *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি : ১৯০৫-১৯৪৭* ঢাকা : সংহতি প্রকাশন।

নেহেরু, জহরলাল (২০১১)। *দ্যা ডিসকোভারি অব ইন্ডিয়া*। ঢাকা : চারদিক।

ফানো, ফ্রাঞ্জ (২০০৬)। *জগতের লাঞ্ছিত*। আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনু.। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার (২০১৮)। *দাঙ্গার ইতিহাস*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.

মিত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র (১৯১৪)। *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা : চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং।

Williams, Raymond (1976). *Keywords : A Vocabulary of Culture and Society*. New Yor Oxford University Press.

সহায়ক প্রবন্ধ

Mukherjee, S. N. (1976). 'Vadralak in Bengali Language and Literature: an essay on tl language of caste and status'. *Bengal : Past and Present*. Vol : 181. Calcutta: The journ of the Calcutta Historical Society.

গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজি *দেশ মাটি মানুষ* : ১৯২২-১৯৪৬ কালপর্বে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী

সিনথিয়া মুমু*

সারসংক্ষেপ
সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারীর অবস্থান কখনোই স্থিরীকৃত ছিল না। ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাথে ঢাকা পড়ে নারীর স্বাধীনতা। সেই থেকে নারী শুধু অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকা হয়ে যাচ্ছিল; পরিচালিত হচ্ছিল পুরুষের ইচ্ছাতে। স্বাধীনতা হারানো থেকে শুরু করে কালের বিবর্তনে নারী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছিল। মানসিক দৈন্যতা ও আত্মসম্মানবোধহীনতা তাদেরকে গ্রাস করেছিল। তাদের এই দৈন্যদশার পেছনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল পুরুষের। ধর্মের সুপরিকল্পিত ব্যবহারে পুরুষ স্বার্থসিদ্ধি করেছিল; শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল নারীকে। বিশ ও ত্রিশের দশকে নারী কতটা অবহেলিত ও নির্যাতিত ছিল, তা *জল পড়ে পাতা নড়ে* এবং *প্রেম নেই*তে পাওয়া যায়। তবে *প্রেম নেই* এর কিছু জায়গায় নারী জাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ট্রিলজির শেষ ধাপ *প্রতিবেশীতে* এসে নারী তার অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এবং শুরু হয় নিজের আত্মসম্মানবোধ ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা, মানুষ হিসেবে যা তার প্রাপ্য। বর্তমান গবেষণায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিংশ শতকে এসে নারীর হারানোর তালিকাটা কতটা দীর্ঘ হয়েছিল, বা হারানোর তালিকায় নতুন কিছু যুক্ত হয়েছিল কিনা। এক কথায়, তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় ছিল। এই বিষয়টি উদ্‌ঘাটনের মূল অবলম্বন গৌরকিশোর ঘোষের *দেশ মাটি মানুষ* ট্রিলজিটি।

মানব ইতিহাসের অরণ্য-পর্বে মানুষের প্রধান শত্রু ছিল জীবজন্তু। জন্তুর ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিহতের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে বর্তাত। অন্যদিকে, ভার বহনের দায়িত্বে ছিল নারী। পুরুষ রক্ষাকর্তার দায়িত্বে থাকায়, নিজেদের অবস্থান নারী অপেক্ষা উচ্চস্তরে ভাবতে শুরু করল এবং নারীকে হেয় করার প্রবণতা যুক্ত হলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে নারীর তুলনা শুরু হলো পশুর সাথে, কারণ পশুর মত তারা শুধু বংশবিস্তারে ভূমিকা রাখত। সন্তান জন্মদান পুরুষের মতে তেমন কোনো কাজের মধ্যে পড়ে না। 'নারী টিকিয়ে রেখেছে মানুষ প্রজাতিকে, আর পুরুষ বদলে দিয়েছে পৃথিবীকে; নারীর নিয়তি, অন্তত এখন পর্যন্ত, হয়ে রয়েছে জীবনের পুনরাবৃত্তি

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

করা; কিন্তু জীবনের পুনরাবৃত্তি ক'রে কেউ পৃথিবীর প্রভু হ'তে পারে না। জৈবিক ও আর্থ কারণে পুরুষ হয়েছে পৃথিবী ও নারীর প্রভু।' (আজাদ, ২০১৭ : ৫৯) অরণ্য পর্বের সমাপ্তিতে, সম্প্রসারণ যুগের সূচনাতে নারী পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে শুরু করেছিল, কেননা পুরুষ তখন ব্যস্ত থাকত যুদ্ধক্ষেত্রে। তখন নারী হয়ে উঠেছিল উৎপাদন ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী। কাছাকাছি সময়ে দেখা যায় সাম্যতন্ত্রী পরিবারে নারীর আধিপত্যও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে পুরুষ সম্পদের অধিকারী হতে থাকে, যার দরুন তাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরুষরা নারীকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার সূত্র বদলে ফেলে। মাতৃধারা ভেঙে শুরু হয় পিতৃপ্রথার; সন্তান-সন্ততি তাদের গোত্রভুক্ত হতে থাকে। তবে শুধু যে সম্পদশালী হওয়াই পুরুষকে শক্তি যুগিয়েছে তা কিন্তু নয়; পিতৃত্বের রহস্য উন্মোচন, সেই শক্তিকে আরো উদগত করেছিল। পূর্বে তারা ভাবত নারী জৈব প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম দেয়। কিন্তু যখন জানলো সন্তান জন্মদানে তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; নারী তখন আরও গুরুত্ব হারায়। আর এ পর্যায় থেকেই নারীর সোনালী অতীত ম্লান হতে থাকে। নানা বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে নারী-পুরুষের কাছে, কখনো ধর্মের নামে আবার কখনো বা বিবাহ প্রথায়। আবার এক পতিপত্নী বিবাহপ্রথার প্রচলনে নারীরা আরো বেশি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের পরিচয় হয়– পুরুষের বৈধ সন্তানের জননী, প্রধান গৃহকর্ত্রী, দাসীদের প্রধান। 'তাই একপতিপত্নী বিয়ে নির্মমভাবে সত্য হয় শুধু নারীর জন্যে, পুরুষের জন্যে নয়।' (আজাদ, ২০১৭ : ৬৫) প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় শুধু নয়, নানা ধর্ম গ্রন্থেও নারীকে হেয় করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। *মহাভারতে* ভীষ্ম বলেছেন- 'প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এ সমুদয়ের সহিত তাহাদের তুলনা করা যায়।' (বেদব্যাস, ১৯৮৫ : ১৭) 'তৈত্তিরীয় সংহিতায় নারীকে ক্ষমতাহীন, উত্তরাধিকারী এবং পাপী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ১৬) 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারীকে পাপযোনি আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ১৭) নারী-পুরুষের ভেদাভেদ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, শুচিতা রক্ষার ক্ষেত্রেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সতীত্ব ও নারী একে অন্যের পরিপূরক, অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনসংসর্গ করলে শুধু প্রায়শ্চিত্তেই নিষ্কৃতি মেলে। এছাড়া যৌন সংসর্গের ক্ষেত্রে নারীর অনুমতির তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, পুরুষের ইচ্ছারই প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে। উপনিষদের প্রখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক "বৃহদারণ্যক" উপনিষদে বলেছেন– 'সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্রালংকার দিয়ে তাকে কিনে ফেলার চেষ্টা করতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে প্রহার করতে হবে।' (চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী, ১৯৮৯ : ১২) সমাজ, ধর্ম ও পরিবার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী অশুচি, অপবিত্র, পাপী, পশুসম। তাদের জীবনের লক্ষ্যই অন্তঃপুরে থেকে পুরুষের জৈবিক চাহিদা থেকে শুরু করে প্রতিটি চাহিদা মেটানো।

উল্লিখিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সভ্যতার উন্মেষ পর্বে নারীর অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। অনেকটা সময় অতিবাহিত করে বিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা বা আদৌ পুরুষের চিন্তাজগত বদলে ছিল কিনা, তা স্পষ্ট হবে তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কথাসাহিত্যের আলোকে। এই কালপর্বে অনেকের লেখনীতে নারীর অবস্থান চিত্রায়িত হলেও গৌরকিশোর ঘোষের (১৯২৩-২০০০) অবস্থান স্বতন্ত্র। কেননা সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকার সুবাদে জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। আর সেই পর্যবেক্ষণ গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। বলা যায় ১৯২২-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর লেখনীতে; তারই নিদর্শন *দেশ মাটি মানুষ* ট্রিলজিটি। ২৫ বছরের দেশ, রাজনীতি, সমাজ, শ্রেণিবৈষম্য, নারীর অবস্থান, ধর্মের টানাপোড়েন সকল কিছুই ফুটে উঠেছে *জল পড়ে পাতা নড়ে* (১৯৭৮), *প্রেম নেই* (১৯৮১) ও *প্রতিবেশীতে* (১৯৯২)। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজির আলোকে বিশ থেকে চল্লিশের দশকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিহ্নিত করার প্রয়াস পাওয়া যাবে।

প্রথাগত ট্রিলজির যে ধারণা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত *দেশ মাটি মানুষ* তার ব্যতিক্রম। ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপন্যাসে সেই অর্থে ধারাবাহিক কোনো কাহিনি অনুসৃত হয়নি। বরং প্রতিটি কাহিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

২. *জল পড়ে পাতা নড়ে*

জল পড়ে পাতা নড়ে উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে দুটি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারকে ঘিরে। যাদের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত বিবাহের মধ্য দিয়ে। প্রথমাংশ 'দুরন্ত ধারা' এবং দ্বিতীয়াংশ 'হাওয়া এলোমেলো' নামে চিহ্নিত। প্রথমাংশের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে দেওয়ান বাড়ির মানুষজন, অপরাংশের কেন্দ্রীয় বিষয় দেওয়ান বাড়ির মেজোকর্তার একমাত্র কন্যা গিরিবালা ও তার পরিবারের অস্তিত্বের সংকট। গ্রামীণ ও গার্হস্থ্য জীবন উপন্যাসের কাহিনিতে প্রভাব বিস্তার করলেও রাজনৈতিক জীবনের নানাবিধ পরিবর্তন সমাজকে ধীরে ধীরে কিভাবে প্রভাবিত করছে, তার ছোটখাটো নিদর্শন উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'এক পরিবর্তমান সময়, ব্যর্থ স্বপ্ন, অনিশ্চিত ভবিষৎ, তারই মাঝে টিকে থাকার প্রচেষ্টা, জীবনের অনুসন্ধান এই নিয়েই 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র পথ-পরিক্রমা।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২ : ৪৩-৪৪) এককথায় নানাবিধ মৌলিক প্রশ্নের সম্ভার এই উপন্যাসটি।

জল পড়ে পাতা নড়ে উপন্যাসে বিংশ শতকের নারীদের সাথে সভ্যতার উন্মেষ পর্বের নারী জীবনাচরণের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বিংশ শতকে এসেও গৃহকোণই তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বিধায় নারীর অন্তরাত্মার জাগরণও হচ্ছিল না। আর

পুরুষ বিয়ে নামক শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করে, সামান্য খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দেখাশোনার ভার চাপাত। খাদ্য প্রস্তুত থেকে শুর করে গৃহের পরিচ্ছন্নতা, অতিথিসেবা ও রান্নাঘরের সার্বিক দিক দেখার দায়িত্ব ছি নারীর। 'গৃহকর্ত্রীর নিজের কাজ সব।' (মুখোপাধ্যায়, ১৩৬৭ : ৪৯১) 'গৃহিণীর উপর গৃহ-সুখ নির্ভর করে।' (সেন, ২০১৭ : ১) *জল পড়ে পাতা নড়ে*'তে গিরিবালা চরিত্রটি মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারীর কর্মব্যস্ত দিনের চিত্র উঠে আসে এভাবে–

> তাই গিরিবালা নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে রাখে। এমনকী প্রকাশ্যে সে খোকনের উপরও দৃষ্টি দেয় না। সময়মতো খাওয়াতে পারে না, খিদেতে চিৎকার করতে থাকে তার ছেলে। কেঁদে কেঁদে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলে। কিন্তু সে অবুঝটা তো বুঝতে পারে না তার মা বন্দিহয়ে আছে সংসারের কাজে। হেঁশেলে কি অন্য কোথাও। (ঘোষ, ২০১৫ : ১৬১-১৬২)

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পুরোটা সময় নারীর কাটে কর্মে লিপ্ত হয়ে; তবুও শ্বশুরবা তাদের জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনাহীন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিজেদে ক্ষমতাশালী প্রমাণে পুরুষরা থাকে সদা তৎপর। ভূষণের বড়'দা বিলাস গিরিবালা দুর্ঘটনার কথা শুনেই তার স্ত্রী দামিনীকে কটু কথা শোনাতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি এমনকি বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে গাড়ু নিয়ে মারতেও ছুটেছিল। নারী জীবন নি পরিবারে কতটা বিপর্যস্ত তা এ ঘটনার মধ্য দিয়ে কিছুটা আঁচ করা যায়। নারীর প্র এই যে উৎপীড়ন তা বিশের দশকের লেখক শৈলবালা ঘোষজায়ার (১৮৯৪-১৯৭ *স্নিগ্ধা* (১৯৩৩) উপন্যাসেও দেখা যায়। স্নিগ্ধা তার স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল শু অপমান, লাঞ্ছনা, ঘৃণা। তা সত্ত্বেও তার দাদামশাইয়ের হিন্দু স্ত্রী সম্পর্কে পরামর্শ ছি এরূপ–

> তুমি হিন্দু স্ত্রী। স্বামী তোমাকে ত্যাগ করতে পারেন, তাড়িয়ে দিতে পারেন, উৎপীড়ন করতে পারেন, যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীর জন্য শাস্ত্রকাররা সে সব যথেচ্ছাচারের অধিকার রাখেননি। হিন্দু স্ত্রীর কাছে স্বামী সেবাই পরম ধর্ম। তা সে স্বামীটি যত অত্যাচারী, যত ভয়ানকই হোন ত্যাগ করবার অধিকার হিন্দু স্ত্রীর নাই। (ভট্টাচার্য, ২০০৪ : ৩১)

উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় নারী মেনে নিয়েছিল হেঁসেলে দায়িত্বটা। অন্যদিকে যদি কোনো সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতার পুরুষ তাদের গৃহক সহায়তা করার চেষ্টা করত, তখন নারীরাই তাদের উপহাসের পাত্র করে তুলত। কার পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা ও মানসিক দৈন্যতা তাদের শিক্ষা দিয়েছে, গৃহকর্ম পুরুষে কাজ নয়। উপন্যাসে বিবৃত–

> বড়গিন্নি রান্নাঘরে এসে দেখেন, ভূষণ ওর মধ্যেই একটা গোছগাছ করে ফেলেছে।
> ...বড়গিন্নি একটানে বাড়ুনটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। ধমকে দিলেন ভূষণকে।
> ...এতক্ষণে চম্পি উঠে এল। ঘরে ঢুকে একনজর চেয়েই হেসে ফেলল।
> মরি মরি, বাড়ুন হাতে কী রূপই তুমার খুলিছে ছোটকাকা! কাকিমা দেখলি ভিরমি খায়ে পড়বেনে! (ঘোষ, ২০১৫ : ১৭২)

সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব লীলা মানব সন্তান, যাকে পৃথিবীর আলো দেখানোর সামর্থ্য শুধু নারীতেই সীমাবদ্ধ। মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদনের সেই সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে নারী পাচ্ছে না যথাযথ সহযোগিতা ও সম্মান। নানা আচার অনুষ্ঠানের নামে তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হতো। শুধু যে পুরুষেরা একে মান্যতা দিয়েছে তা নয়, বাড়ির বয়স্ক নারীরাও কুসংস্কার রক্ষায় ছিল যেন একধাপ এগিয়ে। সমাজের সৃষ্ট মানসিকতাকে এই নারীরা খণ্ডন করার চেষ্টা তো করেই নি, বরং আঁকড়ে ধরে রেখেছে সযতনে। *জল পড়ে পাতা নড়ে* উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র গিরিবালা। সন্তান জন্মদানের প্রাক্কালে প্রকৃতির ভয়াল রূপ দেখে মেজকর্তা গিরিবালাকে কুঁড়েতে নিতে চাননি। কিন্তু তার প্রস্তাবে সবার চক্ষু চড়কগাছ। লেখকের ভাষায়–

> মেজকর্তার কথা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘরে হবে আঁতুড়! মেজকর্তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? নাকি খিরিস্টান হয়ে গিয়েছেন?
> ...এখেনকার নিয়ম হচ্ছে, যে ঘরে ছেলেপুলে হয়, সে ঘরডা নোয়ার কামানের দিন ভাঙ্গে ফেলতি হয়। না হলি পোয়াতির উপর দিষ্টি লাগে। তা তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এই বাড়িডা ভাঙ্গে ফেলতি চাও? (ঘোষ, ২০১৫ : ১৯)

নারীর স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠা থেকেও পুরুষ নারীকে জননীরূপে দেখতেই বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করত। আর এটাই নারীকে সন্তানোৎপাদন ও পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। যে নারী যত সন্তানের জন্ম দিতে পারত, তার গুরুত্ব সমাজে ততো বেশি। তার পাশাপাশি ছেলে সন্তানের প্রাধান্য তো ছিলই। লিঙ্গবৈষম্যকেন্দ্রিক মনোভাব এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এমনকি বেশি সন্তানের জননীদের অনেক সময় ভগবান জ্ঞান করা হতো এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে নানা কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল। *জল পড়ে পাতা নড়েতে* তেমনি একটি চরিত্র তাঁতি বউ। সে আট-দশটা ছেলেপুলের জন্ম দিয়েছে, তেমন কোনো প্রসববেদনা ছাড়াই। তাই এই অঞ্চলের দাইরা যেসব প্রসূতির প্রসবে কষ্ট হয় তাদেরকে তাঁতি বউয়ের পা ধোয়ানো জল খাওয়ায়। দাইদের বিশ্বাস এ এক অব্যর্থ ঔষধ। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা থেকে বহুদূর স্থিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে।

জনসংখ্যার অর্ধেক হয়েও তৎকালে নারীকে গণ্য করা হতো পিতার বোঝাস্বরূপ। এই চিন্তাটা ত্বরান্বিত হয়েছিল মূলত পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার না থাকাকে কেন্দ্র করে। ভাবা হতো তারা নিজেরাই অন্যের সম্পত্তি, জন্মের পর থেকে-ই শুরু হতো হস্তান্তরের অপেক্ষা। আর সেই প্রক্রিয়ার নামে গৌরিদান প্রথায় বলি হতে হতো নারীকে। বারো-তেরো বছর বয়সের আগেই মেয়েদের নতুন জীবনে পদার্পণ ঘটতো। বয়স তেরো পেরোলেই কন্যা তার পিতার গলার কাঁটা হয়ে যেত। তাকে যেকোনো মূল্যে গলা থেকে নামাতে পারলেই যেন রক্ষে। *জল পড়ে পাতা নড়ে*র চম্পির মেজদির বেলাতেও তাই ঘটেছিল। তার বাবা অন্নজল ত্যাগ করে পাত্র খুঁজে, জমি বিক্রি করে বিয়ে দিয়েছিল চম্পির মেজদিকে। বিংশ শতকে প্রচলিত এ রীতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত

হয় আর্য যুগে। সেই যুগের নারীরা অনেক বেশি স্বাধীনচেতা ছিল; নিজেদের সঙ্গী নিজেরা বেছে নিতে পারত। *ভারতের নারী পরিচয়* গ্রন্থে–

> তখন মেয়েদের বিবাহিত হইত বাল্যে নয়, যৌবনে। ঐ বয়সে তাঁহারা নিজেরাই নিজের নিজের বর নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন, এবং পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবক সম্মতি দিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইত। কখনো কখনো মেয়েরা সমনে গিয়া নিজের নিজের বর অন্বেষণ করিতেন। অনেক সময়, কেহ কেহ অধিক বয়স পর্য্যন্ত বর নির্ব্বাচনে সমর্থ না হইয়া পিতৃ-গৃহে বাস করিতেন, এইরূপ অধিক- বয়স্কা কুমারীকে বলা হইত– 'অমাজুর'। (দাসগুপ্ত, ১৩৬০ : ৪-৫)

এছাড়াও কুলীন সমাজে কৌলীন্য প্রথাও দেখতে পাওয়া যায়। জাত-কুল রক্ষায় কোনো কিছু না ভেবেই পিতা তার কন্যাকে দ্বিগুণ বা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তিনগুণ বয়সের পুরুষের কাছে সমর্পণ করতেন; বিয়ের নামে। আপাতদৃষ্টে চম্পিরা বাহ্যিকভাবে সামাজিক অনুশাসনকে মান্যতা দিলেও, মনোজগতে সমাজের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্‌গীরণ করেছে ঠিকই। জীবনের রস আস্বাদনের আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিধবার কাতারে শামিল হতো। সাথে যুক্ত হতো সমাজের চাপিয়ে দেওয়া হাজারো বিধিনিষেধ। জীবনকে বুঝে উঠার আগেই অস্তমিত হতো জীবন সূর্য। তেমনি এক হতভাগ্য চরিত্র ফেদি। যে বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হারিয়েছে স্বামীকে। কিন্তু এ সমাজ তাকে অধিকার দেয়নি পরবর্তী বিবাহের। তাই নিজের কামনা বাসনাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে, বছরের পর বছর ধরে সে সাধনা করে চলেছে বর্ণহীন, গন্ধহীন এক জীবনের। সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া নারীদের এই দুঃসহ জীবনের অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়, ঔপন্যাসিক নিরুপমা দেবীর (১৮৮৩-১৯৫১) *অন্নপূর্ণার মন্দির* (১৯১৩) উপন্যাসে। পিতার আদেশে বৃদ্ধকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে অন্নপূর্ণা অচিরেই বৈধব্য ধারণ করেছিল। *জল পড়ে পাতা নড়ে*র চম্পি ও *অন্নপূর্ণার মন্দির*এর অন্নপূর্ণা আলাদা দুটি উপন্যাসের চরিত্র হলেও দুজনের মনোজগতে এই ঘটনাগুলো ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। এতে প্রতীতি হয় নারীরা নিজেদের চাওয়া পাওয়াগুলোকে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখছিল।

ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, জীবনবোধ সবকিছুকে ছাপিয়ে শুধু সৌন্দর্যই একজন নারীর যোগ্যতা হিসেবে তৎকালে বিবেচিত হতো। আকাশ ছোঁয়া পণ নির্ধারিত হতো যদি মেয়ের রং কালো হয়। কখনো-কখনো আকাশ ছোঁয়া পণও কালো মেয়েদের বিবাহের যোগ্য করে তুলত না। ব্যক্তিত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এমনি এক চরিত্র চম্পি। সে সর্বগুণে গুণান্বিত হয়েও বারবার পাত্রপক্ষ দ্বারা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। নিঃশব্দে হজম করেছে মায়ের গঞ্জনা, পাড়া-প্রতিবেশীদের বিদ্রুপ। প্রতিবেশী সুহাসকে চম্পির মনে হয়েছিল তার কাছে রূপের চেয়ে গুণের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু চামড়ার রঙটাই যে নারীর যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি তা চম্পির বোনযুথিকে সুহাসের গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়।

ব্যবহার্য বস্তুর ন্যায় নারীর সাথে আচরণ করা হতো পুরুষশাসিত সে সমাজব্যবস্থায়। নিজের প্রয়োজনে যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়; যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ *জল পড়ে পাতা নড়ের* চরিত্র গোপালদাসী কিংবা কালিন্দী। নারীকে জড়বস্তুতুল্য ভাবায় পুরুষ কখনো তার মানসিক অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। সন্তান হারানো ছোট বউ, শোক সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বদ্ধ-পাগল বনে গিয়েছিল। মেজকর্তার জীবনে তার স্ত্রীর এরূপ অবস্থা তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। খুব সহজেই স্ত্রীর জায়গা নিয়েছিল অন্য নারী। স্ত্রীর কোনো খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি সে। নারীর প্রতি দায়িত্ব পালনে পুরুষের অবহেলা বা অসচেতনতাই প্রতীয়মান হয় এখানে। শুধু তাই নয়, পুরুষের মর্জির উপর নির্ণীত হতো তার আচরণ কেমন হবে। তারই উদাহরণ পাওয়া যায় উপন্যাসে—

> ছোটকর্তা দেখলেন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর সাত পাকের বউ, তাঁরই চোখের সামনে, সেই বারবাড়ির উঠোন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পলক না পড়তেই কোনও জাদুকর ঠিকসেখানে রেখে গেল মনুষ্যাকৃতি কিম্ভূতকিমাকার একটা জানোয়ারকে। ছোটকর্তা দ্রুত পায়ে উঠোনে নেমে গেলেন, বিনা দ্বিধায় সেই জানোয়ারটার মানুষের মতো সরু ঘাড়ে মারলেন তাঁর অসুরের মতো হাতের এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই জানোয়ারটা ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ছোটকর্তা অবলীলাক্রমে তাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নিলেন, তারপর ধানের বস্তার মতো ভিতর-বাড়ির উঠোনে ছুড়ে দিলেন। সেটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। কোত্থেকে যেন রক্তপড়ছিল, ঠিক খেয়াল ছিল না। হয়তো কোথাও কেটে গিয়েছিল সেটার, হয়তো হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। ছোটকর্তা ভিতর-বাড়িতে ঢুকে সেই কুণ্ডলী-পাকানো মাংসের পিণ্ডে খুব জোরে মারলেন একটা লাথি। (ঘোষ, ২০১৫ : ৯০-৯১)

'এটা', 'উটা' এ ধরনের জড় বস্তু নির্দেশক শব্দ নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। এমনকি কুকুর বিড়ালের সাথেও তুলনার চিত্র পাওয়া যায়। এভাবে এই উপন্যাসে বিশের দশকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীকে পাওয়া যায় মূলত শৃঙ্খলে আবদ্ধ পুরুষের ক্রীড়নকরূপে। তবে ব্যতিক্রমী কিছু চরিত্র রয়েছে, যেমন- চম্পি, ফেদি। তাদের মধ্যে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গার আভাস পাওয়া যায়।

৩. *প্রেম নেই*

প্রেম নেই এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মূলত মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করে। যদিও *জল পড়ে পাতা নড়ের* পরবর্তী পর্যায়ের রাজনীতি এই কাহিনির প্রেক্ষাপট।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২ : ৪৪) তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা ভেঙে মুসলমান অন্তঃপুরকে বিশদভাবে এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। তাঁর চমৎকার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে, তৎকালীন বাঙালি মুসলমান পরিবারের ছেলেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। *প্রেম নেই* উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত : 'আওরতে হাসিনা', 'মধ্যিখানে চর' এবং 'দিগন্তে কালবৈশাখী'। প্রথম পর্বে মুসলমান অন্তঃপুরই কেন্দ্রীয় বিষয়। হাজী পরিবারের সদস্যরাই এই অংশের কেন্দ্রবিন্দুতে। লেখক বেশি আলো ফেলেছেন নারী জীবন ও নারীর মানসিকতায়; এই অংশের

নামকরণেই তা প্রমাণিত। তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শফিকুলের জীবনকে বৃহৎ পরিসরে দেখানোর প্রয়োজনে কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি; তাই গল্পের অগ্রসরে ক্রমে প্রতীয়মান হয় রাজনীতিই উপন্যাসের মূল বিষয়। পরবর্তী দুটি অংশে- 'মধ্যিখানে চর' এবং 'দিগন্তে কালবৈশাখী'তে রাজনৈতিক প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ দুটি অংশে আরও উপস্থাপিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক। দীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি বসবাসরত, আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দুটি জাতি কিভাবে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তা উঠে এসেছে এখানে। এছাড়াও সাঁইত্রিশের নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা রাজনৈতিক মাঠ এবং সেখানে সাধারণের অসহায়ত্ব দিয়ে শে হয় *প্রেম নেই*।

প্রেম নেই উপন্যাসে মুসলমান অন্তঃপুরের চিত্র আরো শোচনীয়ভাবে প্রকাশিত মুসলমান নারীদের ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা সকল কিছু পরিচালিত করত মোল্লা মৌলভীরা; হাদিস ও কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা দানের মধ্যমে। 'অর্থাৎ বহুজনে মনরাখা জগতের জন্য এককথায় তাকে মানুষ হিসেবে মানুষ করা হয় না, কাজে লাগানোর উপকরণ হিসেবে দেখা হয়।' (ভট্টাচার্য, ২০০৪ : ২৯) নারীরা শিক্ষার আলো থেকে অনেকটা দূরে ছিল বিধায় সত্য-মিথ্যা বিচার-বিশ্লেণের কোনো চিন্তাই তাদে মনোজগতে উঁকি দেয়নি। তাই নানা ধরনের উদ্ভট চিন্তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, ে সকল পরিস্থিতির জন্য মনে মনে নিজেও প্রস্তুতি নিত। *প্রেম নেই* উপন্যাসের হাজ সাহেবের কন্যা ছবি ও তার সই টগরের কথোপকথনে এমন কিছু বিষয় সামনে আসে-

> বিলকিস ঠেস দিয়ে বলল, "অতই সুজা? যদি কোনও সোয়ামীর শরীল থেকে পুঁজ রক্ত সব সুমায় বেরোতি থাকে তবে তার বিবি যদি নেককার হতি চায় তবে সেই বিবিরি সেইসব পুঁজ রক্ত জিভ দিয়ে চা'টে সাফ করে দিতি হবে।" (ঘোষ, ২০০০ : ২)

এ ছাড়া ফকির চরিত্রের বচনের মধ্য দিয়েও সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করা যায়-

> কোরাণের বাণী আর নবীর বচন।
> মন প্রাণ দিয়া আরও শুন বিবিগণ ॥
> যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে।
> কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে ॥
> শতশত সাপ বিচ্ছু কাটিবেক তথা।
> দিবানিশি আগুনেতে জ্বলিবেক সেথা ॥
> আরও কত কষ্ট তার নাহিক শুমার।
> সে সব কষ্টের কথা কি বলিব আর ॥ (ঘোষ, ২০০০ : ৬)

অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকা হওয়ার চেষ্টাতেই রত ছবি, ছবির মা, খালা, দাদী। তাদে সমগ্র চিন্তার জগত জুড়ে বিচরণ করে স্বামী, সন্তান ও সংসার। তৎকালীন গ্রা পরিবেশের এটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র; সে নারী যে ধর্মেরই হোক না কেন। নারী সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান জুড়ে স্বামী ও পরিবার বিরাজ করলেও সে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্

পায়নি। ফুটকি তার উল্লেখযোগ্য নজির। দাউদকে আগলে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। কালোজিরে, দুলি বিবি একের পর এক নারীতে মত্ত দাউদ। সব জেনেও যেদিন ফুটকি তার স্বামীকে বিশ্বাস করে নতুন এক ভোরের স্বপ্ন দেখেছিল, সেদিনের ভোর হয়েছিল অন্য একজনের। আর সেই ঘৃণা, ক্ষোভ, অভিমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল সে। সতীত্বের কাটা নারীদের যতটা বিঁধে পুরুষের ততোটা নয়। তাই সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রতিবাদী ফুটকি বিজয়ী করেছিল নিজেকে আত্মহননের মধ্য দিয়ে। অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর (১৯০৫-১৯৭২) *ঘূর্ণি হাওয়া* (১৯৩৪) উপন্যাসে। কল্যাণী তার স্বামীকে বিপথ থেকে দূরে সরাতে না পেরে; অভিমানে গৃহত্যাগ করলেও সমাজ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাকে স্বামীর কাছে আবারও আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। মর্যাদাহীনতা, পুরুষের ইচ্ছার ক্রীড়নক, সতীত্বের অসহনীয় বোঝার ভার সইতে না পেরে কল্যাণী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। সমাজের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ নারী হৃদয়কে দগ্ধ করলেও, পুরুষের বেড়াজাল থেকে তারা তখনও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিমায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবুও সমাজ-সংস্কারকে অস্বীকার করে নিজেকে হনন করার মতো শক্তি বা সাহসটুকু যে তারা অর্জন করতে পেরেছিল তাই ছিল তাদের বিজয়ের পথ।

পর্দা প্রথার নামে মুসলমান পুরুষেরা নারীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখত। ধর্মের দোহাই দিয়ে বহুবিবাহ, পণপ্রথা সর্বস্তরে প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। পুরুষের এই একচোখা মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় *প্রেম নেই* এর মেন্দা মিয়ার মধ্য দিয়ে। সে তার বিবিদের সূর্যের আলো থেকেও বঞ্চিত রাখত; পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে। বিবিরা যেন অধিকার নামক শব্দ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করত। অথচ কোরআনের অনুশাসনে কেবলমাত্র নারীর জন্য প্রযোজ্য হয়নি পর্দা; পুরুষের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। *ইসলামে নারীর অধিকার* গ্রন্থের 'পর্দা' অংশে এ বিষয়ে কোরআনের আলোকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

> শালীনতা বা পর্দার ব্যাপারে কেবলমাত্র নারীদের প্রতি সাবধান- বাণী উচ্চারণ করা হয়নি; বরং প্রথমেই পুরুষদের জন্য কোরআন নির্দেশ দিয়েছে- "বিশ্বাসী দিগকে (পুরুষদের) বল : তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনঅঙ্গের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয় অবহিত।" (মোস্তাফা, ১৯৬৫ : ৩)

ধর্মের নানা ফতোয়া দিয়ে নারীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হতো। যাতে তারা তাদের আশেপাশের অদৃশ্য শৃঙ্খলকে ভেঙে, নিজের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে না পারে। শুধু ভয়ভীতিতেই ক্ষান্ত হতো না মৌলভী সাহেবেরা। ধর্মের আড়ালে পুরুষদের প্রতি তাদের কৃত দায়িত্বগুলোও চতুরতার সঙ্গে নারীদের মস্তিষ্কে গেঁথে দিত, যাতে করে কখনোই তারা পুরুষদের অবাধ্য না হয়। এসবের দোহাই দিয়ে চলত বিবাহ-পরবর্তী শারীরিক নির্যাতন। খসমের হক আদায় না করলে স্ত্রীর স্থান হবে

জাহান্নামে; এই ভীতি *প্রেম নেই* উপন্যাসের নসীফাদের মতো চরিত্রদের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগে বাধ্য করতো–

> প্রতি রাত্রে তার খসম তার হক আদায় করতে চায়। হায়েজের দিনগুলোতে পর্যন্ত সে তার বিবিদের রেহাই দিতে চায় না। হায়েজের খুন প্রতিমাসে জারি হবার সময় হলে তারপর কদিন আর অশান্তির শেষ থাকে না। যদিও তার তিন বিবি, কিন্তু তাতেও তার ক্ষিধে মেটে না। বিবিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি অসুখ বিসুখে হলেও পার পাওয়া যায় না। বলে, ওসব তোদের ছুতো, বদমাইসি। ...অতএব তিন বিবির গর্ভ প্রায় সময়েই ভরাভর্তি থাকে। নছিফার সন্তান জন্মায় মরে। তার কিন্তু বিশ্রাম নেই। (ঘোষ, ২০০০ : ৫৬)

মেয়েদের এমন প্রাণান্তকর অবস্থাকে শৈলবালা ঘোষজায়া তার নানা উপন্যাসের কাহিনির প্রেক্ষাপটে অনাবৃত করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চিন্তার ক্ষেত্রটা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ছিল শুধুমাত্র ভাবনার বৃত্তে। নির্দিষ্ট কিছু মানুষ ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে নারীরা যেন ছিল জন্ম অভিশপ্তা। তারা যেন ক্রীতদাসী, একজন স্বামী, সে যেন প্রভু, তার অধিকার স্ত্রীকে নিগৃহীত করা।

অন্যদিকে, কখনো যদি কোনো পুরুষ নারীর কোনো সুখ শান্তির ব্যবস্থা করতে যেত, তখন সমাজে গেল-গেল রব উঠত। হাজী সাহেব তার স্ত্রী নয়মোন বিবির জন্য পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দিতে গিয়ে, এমনি এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল– 'মুসলমান হয়ে জ্যান্ত বিবির আরামের জন্য কোনও মিঞা ঘাট বাঁধিয়ে দেয় এ কথা এ গ্রামের লোক কখনো শোনেনি।' (ঘোষ, ২০০০ : ৪১) এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তবে সময়ের সাথে সাথে নারীদের চিন্তা-চেতনা ও আগ্রহের পরিবর্তন লক্ষণীয়। *প্রেম নেই* উপন্যাসের সময়কালে, ভারতীয়রা স্বাধীনতার জন্য নানা আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা কলকাতাতেও সে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে; সরোজিনী নাইডু, রোকেয়া, বদরুন্নেসা খাতুনের মতো কিছু মহীয়সী নারী কলম ধরেছিলেন নারীজাতির অবস্থান লক্ষ করে। তাদের লেখনীতে ছিল ধিক্কার, নারীজাতির স্তব্ধতাকে ক্ষমার চোখে দেখেননি তারা। মফস্বলের ছেলে শফিকুল কলকাতায় গিয়ে সেখানকার নারীসমাজের অগ্রগতি দেখে, অনেকটা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। তার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, নিজের স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তুলতে। এ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় তার শ্বশুরের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে–

> কলিকাতায় আসিয়া দেখিতেছি মুসলিম সমাজে বেশ জাগরণ হইতেছে। আপনি যদি পারেন আপনার কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবেন। বিদ্যা আমাদের চক্ষু স্বরূপ, ইহা ক্রমেই বুঝিতেছি। উহা যত আমল হইবে দুনিয়াকে ততই সাফ দেখা যাইবে। (ঘোষ, ২০০০ : ৬)

শফিকুল বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারলেও, মোল্লা-মৌলভীরা তা গ্রহণ করতে নারাজ। বেগম রোকেয়া তার লেখায় পুরুষদের নিজের স্বার্থে তৈরী করা এসব নিয়মকে

প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন। মাসিক 'নবনূরে' প্রকাশিত এমন কয়েকটি চরণ নাড়িয়ে দিয়েছিল শফিকুলের মনোজগৎ। রোকেয়ার প্রতিবাদের ভাষাটা ছিল এমন–

> যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ- সতীদাহ। যেখানে ধর্মবন্ধন, শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত আছেন। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে। (ঘোষ, ২০০০ : ১০৭)

রোকেয়া ও শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু, যাদের চিন্তা-চেতনা শফিকুলের মনে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল; তাদের পথ চলা খুব একটা মসৃণ ছিল না। একটু অতীতে ফিরে গেলেই নারী শিক্ষার বন্ধুর পথটার সন্ধান পাওয়া যায়। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে নারী শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন–

> লোকে বলিতে লাগিল– "এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।" নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন: "বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!" লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। (শাস্ত্রী, ১৯০৯ : ১৯০)

এভাবেই ধীরে ধীরে নারীর ভিত শক্ত হচ্ছিল। শিক্ষিত নারী মহলের চিন্তা চেতনা ছড়িয়ে পড়ছিল শহরের অগ্রগামী এবং সচেতন পরিবারগুলোতে। তাই শিক্ষিত কিছু-কিছু পরিবার তাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। তবে এই সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকায় উচ্চশ্রেণির হিন্দু নারীর সংখ্যাই বেশি; *প্রেম নেই* উপন্যাসের শহুরে চরিত্র মিস পালিত তারই প্রমাণ দেয়। অথচ শহুরে মুসলমান পরিবারগুলোর অবস্থান ছিল তার বিপরীত। মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তাদের তেমন চিন্তা ছিল না। একঘেয়ে কাজ আর ঢিমে ক্লান্তিকর গতিতে দিন কাটে নারীদের। উপন্যাসে সইফুনের আত্মকথনেও এরই চিত্র ফুটে উঠে। পরবর্তীতে নারী শিক্ষা বিষয়ক শফিকুলের ভাবনা সইফুনের পিতা মৌলভী সাহেবকে ক্ষণিকের জন্য প্রভাবিত করলেও, সময়ের সাথে তা ম্লান হয়ে যায়। এভাবে সইফুনের জীবনে গতিশীলতা তৈরি হতে গিয়েও থমকে যায়। এ কাহিনি শুধু সইফুনেরই নয়, এটাই ছিল তৎকালীন মুসলিম নারী সমাজের পশ্চাৎপদতার বাস্তব চিত্র। তবে ত্রিশের দশকে মুসলমান নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার লক্ষ করা যায়। এবং এতকালের শৃঙ্খল ভেঙে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা তাদেরকে নিজস্ব অধিকার নিয়ে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. *প্রতিবেশী*

*প্রেম নেই*তে প্রতিফলিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও রাজনীতির ময়দানে সাধারণের স্বপ্নভাঙ্গার আখ্যান। অন্যদিকে, *প্রতিবেশী*তে চিত্রিত হয়েছে এই একই রাজনৈতিক কারণে সাধারণের জীবন পরিবর্তনের গল্প। ধর্মীয় বিভেদের দেয়াল টপকে

এক হতে পারেনি ফুলকি ও শামীম; রচনা করতে পারেনি তাদের স্বপ্নের সংসার। *প্রতিবেশী* উপন্যাসটি দুটি অংশে বিভক্ত- প্রথম অংশ ১৯টি পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অংশ ৫০টি পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত। কলকাতার শহরকেন্দ্রিক জীবন প্রথম অংশের বিষয়বস্তু। তবে এখানে যে চরিত্রগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে এরা সবাই প্রায় প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং রাজনীতি সচেতন। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ফুলকি-শামীমও রাজনীতি সচেতন; আলোচনা থেকে শুরু করে রাজপথ সর্বত্রই তারা সক্রিয়। প্রথম অংশের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে অমিতা। ক্যান্সারাক্রান্ত দিনগুলোতে সে তার একমাত্র সঙ্গী মন্টুর মায়ের কাছে খুলে দিয়েছে, তার অতীতের ঝাঁপি। সেখানে উঠে এসেছে সুধাকর এবং তার তিন মেয়ের শৈশব-কৈশোর-যৌবনের গল্প, পাশাপাশি ফুলকির রাজনৈতিক জীবন ও তার একাধিক দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার কাহিনি। অসুস্থ অমিতার স্মৃতিচারণায় খণ্ড-খণ্ড চিত্রে বর্ণিত সে অংশের ঘটনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে প্রভাব বিস্তার করছে মূলত ফুলকি-শামীমের ভালোবাসার রোমাঞ্চকর কাহিনি; যেখানে তারা নিমগ্ন হয়েছিল তাদের কল্পনার ঘর তৈরিতে। কিন্তু ধর্ম বাদ সাধে এখানে ভালোবাসায় ডুবে থাকার দিনগুলো শেষ হয়ে, শুরু হয় বিচ্ছিন্নতার দিনগুলো। এই কাহিনির সমান্তরালে লেখক আরো একটি কথাস্রোতকে মিলিয়েছেন, তা হচ্ছে প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরের নানা রাজনৈতিক ঘটনা।

কলকাতাকেন্দ্রিক একটি পরিবারের কাহিনিই *প্রতিবেশী* উপন্যাসের মুখ্য আলেখ্য। তবে এই অংশের নারী চরিত্ররা চম্পি, গিরিবালা আর ছবির মতো নয়; তারা রাজনীতি সচেতন, প্রতিবাদী, অধিকার সচেতন ও শিক্ষিত। তাইতো নারীর প্রতি বঞ্চনা অসহায়ত্ব নিয়ে প্রতিবাদী হতে দেখা যায় ফুলকিকে। তার কাছে হিন্দু মুসলমান নারীতে কোনো ভেদাভেদ নেই, কারণ নারী সব সমাজে অবহেলিত। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ফুলকির মুখে–

> সব মেয়েরাই সমান অসহায়। তুমি পুরুষ শামিম তাই জান না। পুরুষের জগতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। কিন্তু মেয়েদের জগতে শুধু মেয়েরাই আছে। তারা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান নয়। তারা শুধুই মেয়ে। সব বঞ্চনার তারাই শিকার। (ঘোষ, ২০১২ : ২৬৭)

অবহেলিত এ জীবন থেকে মুক্তির একমাত্র মন্ত্র শিক্ষা। *প্রেম নেই*তে শফিকুলের চিন্তা চেতনার যে জাগরণ আমরা দেখেছিলাম, শামীম চরিত্রে এসেও সে চিন্তা ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়; বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কে। ফুলকি ও শামীমের কথোপকথনে মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার শোচনীয় রূপটি দৃশ্যমান হয় রেশমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মুসলমান নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজপতিদের সৃষ্ট নানা প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হয় সেখানে। *প্রেম নেই* থেকে প্রায় এক দশক অতিবাহিত হলেও মুসলমান নারীদের তখনও শাহনামা, আমীর হামজা, আলেফ লায়লা, চাহার দরবেশ, কাসাসুল আম্বিয়া, শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা, কেয়ামতনামা, গো

কাউলি'তে আটকে রাখা হতো। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাকে প্রচার করা হতো য়তানের শিক্ষারূপে, যা নারীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা য়।

র্মের প্রকৃত নির্দেশনা নারীদের পর্যন্ত পৌঁছানোর সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল মাজপতিরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারী হৃদয়কে তারা াতঙ্কগ্রস্ত করে তুলত। নারীদের এই ধর্মভীতি কে পুঁজি করে কখনো কখনো ধর্মের পব্যাখ্যাকারীরা নিজেদের কুৎসিত মনোবাসনা চরিতার্থ করত। লেখক উপন্যাসে ান্ত্রিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভণ্ডদের এই মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করেছেন সার্থকভাবে। াখানে ছবিতে মুগ্ধ তান্ত্রিক নিজের কুৎসিত কাম-বাসনা পূরণে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে াকে ধর্ষণ করে পালিয়ে গিয়েছিল। এই ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্ম ও নারীর মাঝখানে বস্থান করে নারীদের স্থান নির্ধারণ করে দিত। পরবর্তীতে শিক্ষা বিস্তারের ফলে কিছু ংখ্যক নারী যখন এই বিষয়গুলো অনুধাবন করেছেন, তখনই তারা অন্য নারীদের াগরণের স্বার্থে কলমকে যুদ্ধাস্ত্র বানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রদূত াকেয়ার উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশমাত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ...পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন তিনি আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।...তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। (ঘোষ, ২০১২ : ২৫৪)

ভ্যতা যত এগিয়েছে বিজ্ঞান ততোই উন্নতি সাধন করেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নানা ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু এর বহুমাত্রিক ব্যবহার নারীর জীবনকে নেক ক্ষেত্রে সংকটে ফেলেছে। গর্ভের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, বিজ্ঞানের কল্যাণে া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই জানা যায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আসার আগেই ীবনাবসান ঘটে কন্যা সন্তানের। *প্রতিবেশী* উপন্যাসে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহারের ত্র পাওয়া যায়। শুধু বংশবিস্তারেই নারীর জীবন সীমাবদ্ধ থাকেনা, স্বামী সংসারের ঙ্গলের দায়িত্বও তাদের কাঁধে বর্তায়। পুরুষদের দীর্ঘায়ু, শ্বশুরকুলের মঙ্গল ও স্বামীর ালোবাসার জন্য হিন্দু নারীদের পালন করতে হয় নানা রকম ব্রত ও আচার। পন্যাসে এমন কিছু ব্রত পালনের চিত্র পাওয়া যায়। তবে নারীরা এ সময়ে এসে ঝতে শিখেছে এসব ব্রত তাদের জীবনে কোনো কাজেই আসেনা। সুধাময়ের মায়ের াষায়–

> পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে ভোরের বেলাকে আবার? সেই কাকভোরে উঠে আমারাই পূজেছিলাম। পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হবে গঙ্গাজলে। কাঁচকলা। এ বেতর ফল হল কি? স্বামী আমার কোলে সংস্কার রেখে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন। (ঘোষ, ২০১২ : ২১৩)

আত্মগ্লানি, মর্মভেদী অনুশোচনা, মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নারীকে একসময় সচেতন করে তোলে। সমস্ত শৃঙ্খল ভাঙতে তারা উদ্যত হয়। উপলব্ধি করে বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। মিস ফজিলতুন নেসা এম এ এর কথায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়–

> মুসলিম মেয়েদেব উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে এ সমাজের উন্নতি কোনও কালেই হবে না। ...এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নারীও যে মানুষ, সভ্য সমাজে তার পরিচয় দিতে হবে। ভিক্ষুকের মতো কেঁদে, পায়ে ধরে চেয়ে, প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে নিজের ন্যায্য অধিকার জোর করে আদায় করে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই তাই সাহসও নেই- কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। (ঘোষ, ২০১২ : ২৫৯-২৬০)

শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয়ে নারী সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছে। গৃহবধূ থেকে সংগ্রামের সৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পুরুষের থেকেও বেশি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মণিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭) 'সেদিনের কথা রচনাটিতে বলেছেন–

> দেশভাগের পর সেই যে দেখতাম, মেয়েরা অবাধে ট্রেনে বাসে বোঝাই হয়ে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের নয় পরিবারের ভার কাঁধে নিচ্ছে আজ এই ভিড়ের মধ্যে তাদেরও যেন খুঁজে পাচ্ছি। (সেন, ২০১০ : ২২৫)

উপন্যাসের অমিতাও এই নারীদের দলে। কর্মে ফেরার স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃতঅে স্বাধীনতা সে পায়নি। কারণ তার স্বামী সমীরেন্দ্র শুধু তাকে ব্যবহার করে নিজের স্বা উদ্ধার করে নিচ্ছিল। কিন্তু এই মানুষটার স্বপ্নপূরণ করতে অমিতা নিজেকে উৎস করেছিল। সমীরেন্দ্র যখন চাকরি ছেড়ে এসেছিল অ্যাকাডেমিক হওয়ার জন্য: সেদি সে কিছুই বলেনি। কিন্তু এই অমিতাকেই নিচু দেখাতে পারলেই যেন সে শান্তি পেত স্ত্রী-সন্তান তার কাছে কখনোই মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি বরং নিজেকে জাহির করতে পারার মধ্যেই সে বেশি সুখ খুঁজে পেত। নারীদের এই বাহ্য স্বাধীনতা সম্পর্কে মণিকুন্তলা সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–

> আমাদের দেশে যেটুকু অধিকার মেয়েরা লাভ করেছেন তার প্রয়োগক্ষেত্রে যে সমস্যা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তার একটা কারণ হল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা, সন্তানপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দানে সরকারের অক্ষমতা এবং সবচেয়ে বড় কারণ এদেশের পিতৃতান্ত্রিক প্রথার কল্যাণে পুরুষের মজ্জাগত জমিদার সুলভ অভ্যাস। ... আমাদের সমাজে স্বামী সেবা পায় আর স্ত্রী সেবা করে এটাই নিয়ম। উভয়ই উভয়ের সেবা বা সহযোগিতা করবে- এটা নিয়ম নয়। জমিদারি না থাকলেও অন্তত 'স্ত্রী' নামক একটি বাধ্য প্রজা এদেশের গরিব স্বামীও পেয়ে থাকে। নতুন যুগের দৌলতে সেই প্রজাটি যদি শিক্ষা পায় অফিসে যায় ও টাকা রোজগার করে, তাতে স্বামীর তেমন মাথাব্যথা নেই যতক্ষণ তার অভ্যস্ত পাওনায় নড়চড় না হয়। (সেন, ২০১০ : ২৮০)

রাজনীতির মঞ্চে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল অনেকটা সময় অতিবাহিত হলে। তীব্র সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। মুসলমান নারীদের অবস্থা ছিল আরো বেশি সমস্যাসংকুল। তবুও সকল বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙিয়ে 'স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ পরিবর্তনশীল মুসলিম সমাজে তাদের গতিশীল কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে।' (হোসেন, ২০১৪ : ২১১)

উপসংহার

বিশ থেকে চল্লিশের দশক, এই কালপর্বে শিক্ষা নারীকে কিছুটা শৃংখলমুক্ত করলেও, প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী কারো জায়া, কারো কন্যা, কারো মাতা পরিচয়েই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এর মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় নারীর মনোজগৎ তখনও পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। তবে আশার বিষয় এই যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীর যে অবস্থান ছিল তা ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। শূন্য থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে নারী তার অধিকার নিয়ে কথা বলতে শিখেছে বা অধিকার আদায়ে সচেতন হয়েছে। তবে নারীমুক্তির এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজন আত্মসম্মান বোধ যা অর্জন সম্ভব শুধুমাত্র প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তবেই সম্ভব নারী-পুরুষের মধ্যকার ভেদাভেদ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা। তখনই একমাত্র নারীরা সমাজে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে পারবে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে। গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজি 'দেশ মাটি মানুষ' ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ কালপর্বে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের সেই সাক্ষ্য দেয়।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (২০১৭)। *নারী*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

ঘোষ, গৌরকিশোর (২০০০)। *প্রেম নেই*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

____। (২০১২)। *প্রতিবেশী*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

____। (২০১৫)। *জল পড়ে পাতা নড়ে*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ও গৌতম নিয়োগী সম্পা. (১৯৮৯)। *ভারত ইতিহাসে নারী*। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

দাসগুপ্ত, শ্রীনলিনীনাথ (১৩৬০)। *ভারতের নারী পরিচয়*। কলিকাতা : এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী (১৯৯৮)। *ধর্ম ও নারী, সেকাল ও একাল*। কলকাতা : এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বাশা (২০১২)। *গৌরকিশোর : কালের উত্তরাধিকার*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বেদব্যাস (১৯৮৫)। *মহাভারত*। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূ.। কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।

ভট্টাচার্য, সুতপা (২০০৪)। *মেয়েদের লেখালেখি*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব (১৩৬৭)। *পারিবারিক প্রবন্ধ ভূদেব রচনা সম্ভার*। কলিকাতা : অমর সাহিত্য প্রকাশন।

মোস্তাফা, সাইয়েদা কানিজ (১৯৬৫)। *ইসলামে নারীর অধিকার*। কলিকাতা : বাণী প্রকাশ।

শাস্ত্রী, শ্রীশিবনাথ (১৯০৯)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ*। কলিকাতা : এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কো.।

সেন, দীনেশচন্দ্র (২০১৭)। *গৃহশ্রী*। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

সেন, মণিকুন্তলা (২০১০)। *গণজাগরণে নারীজাগরণে*। কলকাতা : থীম।

হোসেন, আনোয়ার (২০১৪)। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী*। কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশ।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ

সাদ্দাম হুসাইন*

সারসংক্ষেপ

'এলিয়টিয় কাব্যনাটকে'র সার্থক রূপকার সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যনাটক লিখে আরোহণ করেছেন খ্যাতিশীর্ষে। কাব্যনাটকের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে নানামাত্রিক নিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। যে নিরীক্ষার দুটি উৎকৃষ্ট-দৃষ্টান্ত– *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* এবং *ঈর্ষা*। এলিয়টিয় কাব্যনাট্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য– 'another kind of drama' (যেখানে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্ব বা সংকট মুখ্য) এর আলোকে নাটক দুটির তিনটি চরিত্রের (মাতবর, প্রৌঢ় ও যুবতী) অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। নাট্যকার এই তিনটি চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে কীভাবে শিল্পে রূপায়ণ করেছেন, তা পাঠ-বিশ্লেষণ, বর্ণনামূলক, তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে।

১.

'ভিন্নধরনের কবিতা' (another kind of verse) এবং 'ভিন্নধরনের নাটক' (another kind of drama)-এর সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি আধুনিক নাট্যপ্রকরণ হলো কাব্যনাটক[১]– যার পথিকৃৎ টি. এস. এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot; ১৮৮৮-১৯৬৫)। কেমন হবে এই 'ভিন্নধরনের কবিতা'– এ বিষয়ে তিনি প্রধানত দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন : ১. '... the poetry must express, in a way in which natural speech cannot, not only the reality of the individual, but the reality of a situation composed of a fusion, in sympathy or antipathy, of two or more individuals.' (Eliot, 1944 : 8-9) অর্থাৎ কাব্যনাটকের ভাষা অনুভব পেরিয়ে যে অনুভব, সে অনুভব জন্ম দেবে। ২. 'To create a form is not merely to invent a shape, a rhyme or rhythm. It is also the realization of the whole appropriate content of this rhyme or rhythm. The sonnet of Shakespeare is not merely such and such a pattern, but a precise way of thinking and feeling.' (Eliot, 1921 : 57) অর্থাৎ কাব্যনাটকের ভাষার মধ্যে ছন্দ থাকবে, একটা গতি, একটা প্রবাহ, একটা রিদম থাকবে– তবে তা শেকস্পিয়রের (William Shakespeare; ১৫৬৪-১৬১৬) সনেটের মতো হবে না।[২] আর 'ভিন্নধরনের নাটক' (another kind of drama) হলো– কাব্যভাষায় লিখিত নাটক, যেখানে ব্যক্তির অন্তর-রহস্যকে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করা হয়–

---

* পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

> A verse play is not a play done into verse, but a different kind of play: in a way more realistic than 'naturalistic drama', because, instead of clothing nature in poetry, it should remove the surface of things, expose the underneath, or the inside, of the natural surface appearance. It may allow the characters to behave inconsistently, but only with respect to a deeper consistency. (Eliot, 1944 : 9)

টি. এস. এলিয়ট এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য করেছেন যে, কবিতায় লিখিত নাটক হলেই কাব্যনাটক হবে না। অর্থাৎ গ্রিক নাটক থেকে শুরু করে এলিজাবেথিয় যুগের নাটক কাব্যভাষায় লিখিত হলেও সেগুলো কাব্যনাটক নয়, বরং 'naturalistic drama'। কারণ, এসকল নাটকে চরিত্রের অন্তর-রহস্য বা অন্তর-দ্বন্দ্ব তেমন নেই। আর যেহেতু 'naturalistic drama'র চেয়ে কাব্যনাটক অধিক বাস্তবসম্মত, সেহেতু এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্ব বা সংকট। 'এলিয়টিয় কাব্যনাটকে'র রূপকার সৈয়দ শামসুল হক[৩] (১৯৩৫-২০১৬) তাঁর কাব্যনাটকে অনুসরণ করেছেন এলিয়ট প্রদর্শিত কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্য (another kind of verse and another kind of drama)। এই প্রবন্ধে কেবল 'another kind of drama' (যেখানে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্ব বা সংকট মুখ্য) বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাঁর *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (রচনাকাল : ১লা মে-১৩ জুন ১৯৭৫, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৭৭) এর মাতবর এবং *ঈর্ষা* (রচনাকলা : সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-আগস্ট ১৯৯০; প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯০) এর প্রৌঢ় ও যুবতী– এই তিনটি চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তাঁর অধিকাংশ কাব্যনাটকের চিত্রিত চরিত্রে অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্ব শিল্পিত হলেও উল্লিখিত দুটি কাব্যনাটকের তিনটি চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব অধিক প্রবল বিধায় এখানে কেবল উক্ত তিনটি চরিত্র সমালোচনা-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠযোগ্য করার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

২.

আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত সংলাপ এবং শৈল্পিক কুশলতার সমন্বয়ে সৃষ্ট সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটক মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ নাটক। মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামবাংলার মানুষের একান্ত অনুভূতি, মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তাদের অন্তর্ভাবনা, বিবেকের তাড়না, ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব– সর্বোপরি স্বাধীনতাবিরোধীদের ভূমিকা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি বিষয় এ কাব্যনাটকে শিল্পিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাঙালির স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল ১৯৭১ সালের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর পূর্বে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার অনতিকাল পরেই পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের টনক নড়ে। তারা বুঝতে পারে–

> তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-এরা যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁদের ভাষাটা আলাদা। দেখলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতিচিন্তায় মিল সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে, অনেক অমিল সম্পর্কেই তাঁরা সচেতন হলেন। মিল খুঁজে পেলেন কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও

> তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্বেও, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ইসলাম ধর্মীয় সাম্য-মৈত্রীর আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে বাঙালিদের ন্যায় অধিকারকে স্বীকার করছে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবিচারের মুখে কদিন টিঁকে [টিকে] থাকে ধর্মের এই ঠুনকো ঐক্য? সুতরাং, একদিন, আমরা যাঁদের পরম আত্মীয় বলে মেনে নিয়েছিলুম, তাঁদের প্রতি আমাদের বাঁধন ধীরে ধীরে আলগা হলো। (মুরশিদ, ১৯৭৬ : ৫০)

ফলে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, তারা ১৯৪৮ সালেই মাতৃভাষা বাংলার জন্য শুরু করে আন্দোলন এবং তা রূপ নেয় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। বস্তুত, 'ভাষা-আন্দোলন যেদিন শুরু হলো সেদিনই বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং পাকিস্তানের পতন আরম্ভ হয়েছে।' (মুরশিদ, ১৯৭৬ : ৪৯) ভাষা-আন্দোলনের সময় থেকেই এদেশের মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে– যার ফলেই তারা সামিল হয়েছে ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯-এর মতো গণআন্দোলনে। এসব গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বারবার আশ্রয় নিয়েছে 'ধর্ম' নামক আফিমের–

> ১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্টের পর থেকে এদেশে শাসক শ্রেণী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অনর্গল বলে এসেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা সব সময় দাবী করে এসেছেন যে তাঁরাই ইসলামের সত্যিকার পাবন্দ এবং অন্যেরা পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন।
>
> গত বাইশ তেইশ বছর [প্রবন্ধটি ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়, সেজন্যই বাইশ-তেইশ বছর বলা হয়েছে] ধরে যারা পাকিস্তানে অবাধ রাজত্ব করে এসেছে তারা অন্যকে দমন করার জন্যে ইসলামকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে কসুর করেনি। এর ফলে সব রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারা ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যা দিয়ে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে। ... ইসলামের প্রতি পাকিস্তানের এবং বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার মানুষের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে বিগত বাইশ বছরে ইসলামের শ্লোগান দেনেওয়ালা শাসকচক্রের গণবিরোধী এদেশের কীর্তিকলাপই দায়ী। ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন এদেশের পক্ষে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা পৃথক কথা কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পদলেহী দালালরাই যে মূলত দায়ী সে কথা অস্বীকার করবে কে? (উমর, ১৯৭৬ : ১১)

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১) চিহ্নিত এই 'পদলেহী দালালরাই' 'ইসলামের শ্লোগান দেনেওয়ালা শাসকচক্রের' মতবাদ বিশ্বাস করেছে এবং প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তাদের যথার্থ দোসর হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকের মাতবর চরিত্রটি এই 'পদলেহী দালাল' শ্রেণির চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে 'ইসলামের শ্লোগান দেনেওয়ালা শাসকচক্রের' মতবাদ প্রচার করেছে বিধায় পাকিস্তানি শাসকচক্রও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রধান করেছে তাকে। ফলে সময়ের পরিক্রমায় সে হয়েছে সাধারণ জনগণের নেতা, গড়েছে সম্পদের পাহাড়। অথচ যাদেরকে আশ্রয় করে সে নেতা হয়েছে, তারা ধর্মের 'পাখিপড়া বুলি' ছাড়া কিছুই পায়নি। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ এটা বুঝতে পেরেছে অনেক পরে– যখন

তাদের আর কিছুই করার নেই। তবুও তারা প্রকাশ করেছে তাদের আক্ষেপ– যেখানে দৃষ্ট হয়েছে 'আল্লার ন্যায় বিচারবিধান'। যে বিধানের দোহাই এবং পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় মাতবর হয়েছে বিত্তবান :

গ্রামবাসী

অথচ আল্লার নামে আপনের ঘরে
কখনো কিছুর কম হয় নাই, য্যান থরে থরে
বাগিচায় বারোমাস্যা ফুলের বাহার।
বুঝি না আল্লাহর
কুদরত কারে কয়, কারে কয় বিচার আচার।
যাদের জীবন হইল জন্তুর লাহান
তারে কিছু দ্যাও নাই, দিয়াছো ঈমান:
আর যারে সকলি দিয়াছো, অধিকার
তারেই দিয়াছো তুমি দুনিয়ার ঈমান মাপার। (হক, ২০১৬ : ২৯)

'যাদের জীবন হইল জন্তুর লাহান' এবং যারা আল্লার কাছ থেকে 'ঈমান' ছাড়া কিছুই পায়নি, তাদেরকে তারই দোহাই দিয়ে মাতবর পাকিস্তান নামক ইসলামি রাষ্ট্রের রক্ষক হয়েছে। বলেছে– 'সকল কামের চেয়ে বড় হইল দেশ রক্ষা করা।' (হক, ২০১৬ : ২৬) তাদেরকে বুঝিয়েছে মুক্তিবাহিনী এদেশের কল্যাণের জন্য, সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য প্রধান প্রতিবন্ধক। ফলে তারা যেন মুক্তিবাহিনীকে কোনো প্রকার আশ্রয়-প্রশ্রয় না-দেয় এবং দেখামাত্রই তাদের প্রতিহত করে। সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধের এই বাস্তব ইতিহাস তুলে ধরেছেন গ্রামবাসীর সংলাপে–

গ্রামবাসী

... আপনের হুকুম মতো এই সারা সতেরো গেরামে
কোনোদিন কোনো ব্যাটা মুক্তিবাহিনীর নামে
আসলেই খেদায়া দিছি যেমন ভিটায়
খা-খা কাক ডাকলে দুপুর বেলায়
লাঠি হাতে বৌ-ঝি খেদায়।
আপনের হুকুম মতো খোলা রাখছি চাইরদিক চোখ
গেরামের মধ্যে কোনো সন্দেহজনক
ঘোরাফেরা দেখলেই পাছ নিছি সাপের মতন
হুজুরে হাজিরও করছি দুই চাইরজন। (হক, ২০১৬ : ২১)

এভাবে এদেশীয় দালালদের সহায়তায় পাকিস্তানি শাসকচক্র সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিবাহিনীকে ধরিয়ে দিতে। বস্তুত, ধর্মীয় অনুশাসন এবং শাসকগোষ্ঠীর ভয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে অবস্থান নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। তাদেরকে শেখানো হয়েছে– মাতবরের মতো ধর্মধারী নেতারাই শিখিয়েছে যে, মুক্তিবাহিনী ইসলামের দুশমন, মুসলিম রাষ্ট্রের দুশমন। ফলে মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাতে সমর্পণ করাকে তারা অন্যায় মনে করেনি, বরং সওয়াবের কাজ ভেবেছে। কিন্তু যখন যুদ্ধের অন্তিমমুহূর্ত– বিজয় যখন সন্নিকটে– মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত পায়ের আওয়াজ যখন

সতেরো গ্রামের মানুষ শুনতে পেয়েছে, তখন তারা ভীষণ ভয়ে ভীত হয়ে হাজির হয়েছে তাদের নেতা মাতবরের কাছে। মাতবর এই তীব্রসংকটমুহূর্তেও ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে, দিয়েছে আল্লাহর দোহাই–

মাতবর ... আল্লার তরফে আছি আমরা যখন
ডর নাই, কোনো ডর নাই, দুষমন [দুশমন]
নিজেই নিজের থিকা শেষ হয়া যাবে।
আল্লা ছাড়া গতি নাই যে পার করাবে।
ঈমান রাখতে পারো যদি তার পর।
আবার সলোক হবে আন্ধার ঘর।
বিপদ শিয়াল হয়া জঙ্গলে পালাবে। (হক, ২০১৬ : ২৭)

এই বক্তব্যে শেষবারের মতো মাতবর গ্রামবাসীকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। গ্রামের সরল ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সম্পর্কে যেহেতু সে ভালোভাবেই জানত, সেহেতু সে স্পর্শ করেছে তাদের 'ঈমান'। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীও মাতবরের বক্তব্যের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে জোরালো ধর্মীয় যুক্তি : 'আল্লার উপরে আপনে দিলেন যেভাবে/ সকল দায়িত্ব দিয়া, মনে হয় তাতে/ নিজের করার কিছু নাই দুনিয়াতে/ অথচ তিনিই দিয়া দিয়াছেন হাত আর বুদ্ধি বিবেচনা।' (হক, ২০১৬ : ২৭) গ্রামবাসীর এ ধরনের কথা– সর্বোপরি যুবকদের উত্তেজনা দেখে মাতবরের মনে তৈরি হয় 'ভয়'। তাছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া (এ ঘটনা কেবল মাতবরের পরিবারই জানত) এবং মুক্তিবাহিনী আগমনের সংবাদ পাওয়া– সর্বোপরি গ্রামবাসীর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে মাতবরের মনে 'ভয়' তৈরি হয়। এই ভয়ের কারণেই সে শুনতে পায়– শুকনো যমুনা নদীতে জোয়ার ডাকার শব্দ– পাড় ভাঙার শব্দ। এই 'শব্দ' তার অন্তর্গত রক্তের ভেতরের ভয় এবং আশঙ্কার। স্মর্তব্য, নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং শিল্পের সংমিশ্রণে নাটকটি রচনা করলেও মাতবর চরিত্রের 'মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা' সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি শেকস্‌পিয়রের *ম্যাকবেথ* (*The Tragedy of Macbeth*; ১৬০৬) দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছেন অনুমান করা যৌক্তিক। ম্যাকবেথ যখন নিরাপরাধী রাজা ডানকানকে হত্যা করে, তখন তার 'মানস' তাকে জানিয়ে দেয় সে 'খুনি'। ফলে তার মনে তৈরি হয় 'ভয়' এবং 'আশঙ্কা'– যার কারণেই সে তার মনের বদ্ধদরজায় একটা কড়ানাড়ার শব্দ শুনেই চলে এবং ভাবে এই বুঝি কে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল–

Macbeth Whence is that knocking?
How is't with me, when every noise appals me?
What hands are here! Ha! they pluck out mine eyes.
(Shakespeare, 1905 : 853)

ম্যাকবেথের এই মানসিক অবস্থা আরো গভীর হয় ব্যাঙ্কো-হত্যার পর। কেননা, তার পুত্র ফ্লিয়ান্স তখনো জীবিত। ফলে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীটি সর্বক্ষণ তাড়া করে

ফেরে তাকে। যা রূপ নেয় হেলুসিনেশনে। ফলে ভোজসভায় সে তার আসনেই ব্যাঙ্কছায়ামূর্তি দেখতে পায়, যা সে ছাড়া ভোজসভার আর কেউ– এমনকি লেডি ম্যাকবেথও দেখতে পায়নি, অথচ ব্যাঙ্কছায়ামূর্তিকে সে বারবার দেখে চমকে উঠেছে এবং তাকে ফিরে যেতে বলেছে–

Macbeth — Avaunt! and quit my sight!
Let the earth hide thee!
Thy bones are marrowless, the blood is cold;
Thou has no speculation in those eyes
Which thou dost glare with. (Shakespeare, 1905 : 858)

স্মর্তব্য, ম্যাকবেথের মনের 'বদ্ধদরজা', যেটাকে থমাস দি কোয়েন্সি (Thomas Penson De Quincey; ১৭৮৫-১৮৫৯) বলেছেন, 'world of darkness'[৪]– হচ্ছে 'অস্তিত্ব', যেখানে কড়ানাড়াচ্ছে 'বিবেক'। এই বিবেকই ভোজসভায় 'ব্যাঙ্কছায়ামূর্তি'। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকের মুক্তিবাহিনী নিরাপরাধী। তাদেরকে গ্রামবাসীর সহায়তায় মাতবর পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে মাতবরের 'মানস' তাকে জানিয়ে দেয় সে 'অপরাধী'– তার মনে তৈরি হয় 'ভয়' এবং 'আশঙ্কা'। যার কারণেই সে তার মনের বদ্ধদরজায় শুকনো নদীতে জোয়ার এবং পাড় ভাঙার শব্দ শুনেই চলে– যে শব্দ সে ছাড়া সতেরো গ্রামের আর কেউ শোনেনি–

মাতবর — [হঠাৎ কান পেতে শোনার চেষ্টা করে মাতবর]
একি! দূরে য্যান শব্দ শুনি যমুনার।
হঠাৎ ভাঙ্গতে আছে খ্যাতের কিনার:
স্রোতের আঙুল দিয়া খালি হাঁচড়ায়
ভিটার তলের মাটি যমুনা সরায়।
সাবধান, সাবধান। নাকি ভুল শুনতে আছি?
কি হয়? কোথায়?
ও কিসের শব্দ শোনা যায়?
চুপ করো, চুপ করো শুনতে দাও, শুনি।

গ্রামবাসী — কোথায় যমুনা আর কোথায় যে পানি।
কাপাসের তুলা পানি আছিল আষাঢ়ে
য্যান এক জোলা গ্রীষ্মকালে তারে
পাকায় চিকন সুতা চৈতের রদ্দুরে
টানা দিয়া রাখছে ঐ দেখা যায় দূরে।
কোথায় জোয়ার?
যতদূর চক্ষু যায় খাড়া দুই পাড়,
চিকচিক করে বালু, দুই একটা চিল উইড়া যায়,
শব্দ নাই কোনোখানে, যদি শোনা যায়,
তাও এক তপ্ত হাওয়া শোসায় ফোপায়
মাঝে মধ্যে। মাঠের পাতায়
ক্যাবল কনা হাওয়া নাচায় ফিরায়।

মাতবর — চুপ! একটা আওয়াজ কিসের?
... শোনো নাই?
কেউ শোনে নাই?
কান পাতো। ভালো কইরা শোনো। শোনো, শোনা যায়,
যায় কি না? কও কি না যায়? (হক, ২০১৬ : ৩০)

এই 'শব্দ' মাতবরের অন্তর্গত রক্তের ভেতরের ভয় এবং আশঙ্কার। যেটাকে নাট্যকার সূক্ষ্মভাবে চিত্রণের মাধ্যমে মাতবরের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে শিল্পিত করেছেন– যা কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩.

ঈর্ষার নির্যাস নিয়ে শেকস্‌পিয়র রচনা করেন বিখ্যাত বিয়োগান্তক নাটক *Othello* (*The Tragedy of Othello, the Moor of Venice*; ১৬০৩)। *ঈর্ষা* কাব্যনাটক রচনার সময় সৈয়দ শামসুল হকের স্মৃতিতেও *Othello* ছিল, কিন্তু 'ঈর্ষা'কে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ নতুনমাত্রায়–

> শিল্পে আমি ঈর্ষাকে যখন স্মরণ করি, অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়, এবং আমার মতো অনেকেরই নিশ্চয়, শেকসপীয়রের 'অথেলো'– ঈর্ষার নির্যাস নিয়ে এর চেয়ে অক্ষয় রচনা আমার আর জানা নেই। কিন্তু সেখানেও একদিন আমি আবিষ্কার করি যে, অথেলোর ঈর্ষা এমন ঈর্ষা নয় যা সম্পূর্ণ মানবিক, সৎ অর্থে 'পশু' শব্দটি ব্যবহার করে বলতে পারি পশুদের ভেতরেও মোটা দাগে অথেলো-র প্রায় অনুরূপ ঈর্ষা এবং পরিণামে হত্যা-সংঘঠন দুর্লক্ষ্য নয়। অচিরেই আমার এ সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আমি অগ্রসর হই এবং অনুসন্ধান করতে থাকি ঈর্ষার এমন কোন রূপ যা কেবল মানবের ভেতরেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। (হক, ২০১৬ : ৩০৯ [সবিনয় নিবেদন])

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোধগম্য হয় যে, নাট্যকার সর্বাংশে মানবিক ঈর্ষাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন– যা অপর প্রাণীদের ভেতরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই দুরূহ নিরীক্ষা তিনি করেছেন মুখ্যত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে–

> ১. জীবনের সকল প্রসঙ্গের ভেতরে প্রেম ও দেহ-সংসর্গে স্থাপিত ঈর্ষাই আমার কাছে একমাত্র গ্রাহ্য হয়েছে।
> ২. ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের প্রতি ঈর্ষান্বিত, ব্যক্তি যখন নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী।
> ৩. প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের ভেতরে একাধিক ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে। (হক, ২০১৬ : ৩০৯ [সবিনয় নিবেদন])

মানবজীবনের শিল্পিতসত্য এই তিনটি 'দর্শন'কে নাট্যকার তিনটি চরিত্রের দীর্ঘ সাতটি সংলাপের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন– যেখানে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মানসিক দহনই মুখ্য। নামহীন এই তিনটি চরিত্রই চিত্রশিল্পী। এর মধ্যে যুবক-যুবতী বিদ্যায়তনিক চিত্রশিল্পপাঠ সমাপ্ত করে শিল্পের প্রায়োগিক কৌশল রপ্ত করতে সদাসচেষ্ট– অর্থাৎ তারা এখনো শিল্পশিক্ষাধীন তথা অপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। অপর চরিত্র– প্রৌঢ়। যিনি প্রতিষ্ঠিত

চিত্রশিল্পী– ইতোমধ্যেই তিনি তার শিল্পিখ্যাতি হিসেবে পেয়েছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি, অর্জন করেছেন আচার্যের সম্মান, ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন দেশে। অর্থাৎ প্রৌঢ়ই প্রকৃত শিল্পী– যার শিল্পযাপনকে নাট্যকার শিল্পিতভাষ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। বস্তুত প্রকৃত শিল্পী মাত্রই তাঁদের সৃজনশীল মন এবং উদ্ভাবনী ধীশক্তিবলেই 'মহান আত্মা'র (great soul) অধিকারী হন এবং তাঁরা তাঁদের সময়ের চেয়েও এগিয়ে অবস্থান করেন। ফলে তাঁরা থাকেন নিঃসঙ্গ। অর্থাৎ শিল্পী পৃথিবীর নির্জনতম মানুষ; তাঁর শিল্পভুবনে তিনি সম্পূর্ণ একা এবং দুঃখী। এই দুঃখবোধ জাগৃত হয় তিনি একা বলে, বিচ্ছিন্ন বলে। কারণ, তিনি যে সময়ে বাস করেন বা যেমন সময়ে বাস করতে চান, সময়টা তেমন নয়– ভুবনটা তেমন নয়। নয় বলেই তিনি তাঁর কল্পিতভুবনে নিঃসঙ্গ একাকী বাস করেন। অর্থাৎ নিঃসঙ্গতাই শিল্পীর নিবাস– যে সত্যকে নাট্যকার কাব্যভাষায় নির্মিত প্রৌঢ় শিল্পীর সংলাপে তুলে ধরেছেন–

> আসলে মানুষ তার হাড়ের ভেতরে খুব ভালো করে জানে, ভয়াবহ একাকী সে;
> এমনকি ভীড়ের মধ্যেও তার চারদিকে কাচের দেয়াল,
> তাই সে বাড়ায় হাত, জানে কোনো আশা নেই, তবু হাত সে বাড়ায়,
> কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে, কিছু একটা,
> যেন যখন তলিয়ে যাবে, একা না তলায়;
> তারই জন্যে আমাদের ক্যানভাসে ব্রাশের আঁচড় টানা,
> রাতের লণ্ঠন জ্বেলে ভূতগ্রস্ত কলমে কবিতা লেখা,
> তানপুরা টেনে গান গাওয়া
> রঙ্গমঞ্চে অন্যকোনো মানুষের রূপ ধরে উচ্চারণ করা সংলাপ। (হক, ২০১৬ : ৩৪৩)

অর্থাৎ শিল্পী তাঁর সময়ের পৃথিবীতে বহু মানুষের ভীড়ে একা জেনেও একটা কিছু আঁকড়ে ধরার আশায় হাত বাড়ান এবং বিফল হয়ে ফিরে এসে তাঁর দুঃখবোধকে রূপান্তর করেন শিল্পে। কার্যত সব শিল্পীই দুঃখী, কিন্তু কোনো শিল্পীই অন্যকোনো শিল্পীর মতো করে দুঃখী নন। অর্থাৎ তিনি যেমন একা বলে দুঃখী, তেমনি দুঃখী হিসেবেও একা। আর এই একাকিত্বকেই তিনি যাপন করেন নিজের মতো করে– যেখানে তিনি অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করেন সমস্ত 'নিষেধের তর্জনী'। প্রৌঢ় শিল্পীও তাই করেছেন–

> ডাক্তারের নিষেধ, চুরুট চলবে না, দ্যাখো, চুরুট এখনো খাচ্ছি।
> মানুষ দুর্বল তার অভ্যেসের কাছে।
> মানুষের হাত শুধু অবিরাম একটা কিছু খোঁজে, কোনো নিষেধ মানে না।
> নিষেধ, নিষেধ, নিষেধের কাঁটাতারে জীবন ঘিরছে;
> সেই কাঁটাতারে রক্তাক্ত হচ্ছে হাত, হাত কি ফেরাতে পারছি?
> বিষ বলে জানছি, তবু পেয়ালায় চুমুক দিয়েই যাচ্ছি।
> একা থাকি, তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়, সাবধানে সবাই থাকতে বলে,
> তবু সাবধান হতে পারছি কই?– (হক, ২০১৬ : ৩৪১-৩৪২)

প্রকৃত শিল্পী সাবধান হতে পারেন না। কারণ, তিনি থাকেন তাঁর ভাবজগতে– স্বনির্মিত শিল্পভুবনে। যেখানে তিনি সাধনা করেন 'আকারে'র– সাধনা করেন 'প্রাণে'র। গাছ, বাড়ি, মানুষ, নৌকা, মাঠ, নদী, মেঘ, পাহাড়, জনতা– এইসব বস্তুর ভেতর থেকে যে আকার ক্রমাগত উঠে বসতে চায়– 'তারার বাজির মতো কেন্দ্র ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায় শ্রান্তিহীন'; (হক, ২০১৬ : ৩৪২) চিত্রশিল্পী বস্তুর সেই চাঞ্চল্য– প্রাণ প্রার্থনার সেই আর্তনাদ, সেই দুঃসহ গতিময়তাকে ক্যানভাসে ধরতে চান। মুক্ত করতে চান আকারের বন্ধন, প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রাণ। কিন্তু আকারের বন্ধন মুক্ত করতে যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'আকারে'র, তেমনি 'প্রাণ' প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রয়োজন 'প্রেম'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এমনটাই বিশ্বাস করতেন বলেই তিনি তাঁর 'বৈষ্ণবকবিতা'য় বৈষ্ণবকবিকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন–

> সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
> বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
> কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
> আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
> রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা
> রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
> আঁখি হতে! (ঠাকুর, ১৩৪৮ : ৫৮)

রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসা থেকে জানা যায়– বৈষ্ণবকবিরাও কারো অশ্রুআঁখিকেই রাধিকার অশ্রুআঁখি হিসেবে, কিংবা তাঁদের ব্যক্তিজীবনের প্রেমকেই রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা হিসেবে শিল্পিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা আকারে আবিষ্ট হয়েই মুক্ত করেছেন আকারের বন্ধন, প্রাণাবিষ্ট হয়েই প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রেম। এজন্য 'আকার' এবং 'প্রেম' যে কোনো শিল্পের জন্যই অপরিহার্য উপাদান– চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। *ঈর্ষা* কাব্যনাটকের প্রৌঢ় শিল্পীর প্রতিষ্ঠার নেপথ্য হিসেবে প্রধান অবলম্বন হয়েছে এই 'প্রেম' এবং 'আকার'। প্রৌঢ় শিল্পী তার যৌবনে একবার প্রেমে পড়ে ছিলেন। এই প্রেম একপাক্ষিক হলেও গভীর ছিল তার অনুভব। মেয়েটি তারই সঙ্গে পড়ত। গাড়ি চড়ে আসত এবং ক্লাস শেষে কোনো দিকে না-তাকিয়ে যখন গাড়িতে উঠত তখন তার মনে হতো– 'আমার শরীর ছিঁড়ে আরেক শরীর।/ তার পিছু পিছু বাড়ি যেতো।' (হক, ২০১৬ : ৩৪৪) একদিন সে নিজেই তার বাড়িতে ডাকে– শেষবর্ষে প্রথম হয়েছিলেন, সেই সূত্রে আমন্ত্রণ। তারপর একদিন তিনি নিজেই তেলরঙে আঁকা কিছু বাছাই করা ছবি নিয়ে হাজির হন তার বাসায়– যা দেখে মেয়েটির

প্রাণে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগে না, বরং সেগুলোকে সে মূল্যহীন-তুচ্ছবিষয় বলেই গণ্য করে। ফলে ভীষণ লজ্জায় শিল্পী নিজেই যখন ছবিগুলো ফিরিয়ে নিতে উদ্যত হন, তখন মেয়েটি তার হাতে হাত রেখে বারণ করে। এই প্রথম কোনো নারীর স্পর্শ– যে স্পর্শানুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন প্রৌঢ়–

> হাতের ভেতর দিয়ে বিদ্যুত বয়ে যাচ্ছে অবিরাম,
> তার থেকে আমার, আমার থেকে তার; কি একটা স্পন্দন, কম্পন;
> জানি না কখন আমার হাতের থেকে আশ্চর্য চাপ অসীম সাহসে
> তার হাতে চেপে দিলো ছবির ফ্রেমের কাঠে।
> সম্বিত ফিরতেই সরিয়ে নিলাম হাত, হাত তুলল সে,
> দেখি, হাতে তার রক্তের লাল গাঢ় দাগ পড়ে গেছে।
> আমি সেই দাগটিকে বহন করে বাড়ি ফিরলাম। (হক, ২০১৬ : ৩৪৪)

এরপর তাকে ঘিরেই নিবিষ্ট তাঁতির মতো স্বপ্নের শাড়ি বোনা– কিন্তু সেই শাড়ি পড়ে রইল তারই তাঁতের রোলারে! একদিন চিঠি এলো সিঁদুরের রং দিয়ে আলপনা আঁকা– এক উঠতি আমলা পিএসপির সঙ্গে তার বিয়ে। বিয়ের দুদিন আগে তিনি তার কাছে গিয়ে জানান ভালোবাসার কথা, কিন্তু নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসেন এবং সেই রাতেই চাপান ক্যানভাস। প্রথম বিমূর্ত কাজ। 'সিঁদুরের ক্রুদ্ধ রঙ আর দোমড়ানো মোচড়ানো কিছু বস্তুর আঁকার।' (হক, ২০১৬ : ৩৪৫) এরপর ক্রমাগত বিমূর্তের সাধনা। এভাবেই একজন শিল্পী তাঁর দুঃখবোধকে শিল্পের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন এবং তাকে পরিণত করেন শিল্পের গূঢ় শক্তিতে– যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে প্রেম, রঙ, আকার এবং অনুভব। অর্থাৎ প্রেমের ওপারে প্রেম, রঙের ওপারে রং, আকারের ওপারে আকার– সর্বোপরি অনুভব পেরিয়ে যে অনুভব সেই অনুভবের রূপায়ণই শিল্প। প্রকৃত শিল্পী আকারের অনুভব তাঁর প্রতিভার হাতে চেপে ঠেসে পিণ্ড করে, যা কিছু বর্জনীয় নির্মমভাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে, কেবল নির্যাসটুকু বের করে তাঁর ক্যানভাসে রাখেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব আর ব্যক্তিগত থাকে না, সকলের হয়ে যায়– হয়ে ওঠে শিল্প–

> শিল্প তো অনুভব শুধু, মুহূর্তের খণ্ড অনুভব মানবের বিশাল ক্যানভাসে।
> তাই ব্যক্তির রচনা হয়েও শিল্প ব্যক্তিগত নয়;
> শিল্প তখনি তো শিল্প হয়
> যখন ব্যক্তির অনুভব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে উঠে সকলের হয়। (হক, ২০১৬ : ৩৬৭)

প্রৌঢ় শিল্পী তার প্রৌঢ় বয়সে শিল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন– তার যৌবনে অঙ্কিত ছবিরে মধ্যে সেই লক্ষণ বিদ্যমান ছিল বলেই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) শিল্পীর শিল্পপ্রদর্শনীতে সকলের সম্মুখে অবিশ্বাস্য কঠিন ও কোমল থাবায় কাঁধে চাপ দিয়ে বলেছিলেন : 'আমার যৌবনকাল ফিরায়া আনলা তুমি এই ছবিতে আবার।' (হক, ২০১৬ : ৩১৪) উল্লেখ্য যে, যৌবনে কলেজের প্রথম বছরে প্রৌঢ় শিল্পীর আঁকা

রমণীর এক মুখ দেখে জয়নুল আবেদিন সকলের সম্মুখে একথা বলেছিলেন। যেখান থেকে ধরে নেওয়াই সমীচীন যে, প্রৌঢ় শিল্পী তার যৌবনে বিমূর্ত নয় মূর্ত ছবিই এঁকেছেন। সেই মূর্তশিল্প বিমূর্ত হয়ে ওঠে বিদ্যায়তনিক শিক্ষাজীবনের শেষবর্ষে– যখন তিনি প্রথম প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হন। তখন থেকেই ক্রমাগত বিমূর্ত শিল্পের সাধনা। স্মর্তব্য, প্রৌঢ় শিল্পীর প্রথম প্রেমিকার উঠতি আমলার সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনে আসে আরেক অসুখী (বেশি সুখে থাকলে মানুষ যেমন অসুখী হয় তেমন অসুখী) আমলার স্ত্রী– যে নিজেই খুঁজে বের করেছিল তাকে। সেই মহিলারই প্রয়োজন ছিল বেশি– ভ্যানিটি ব্যাগের আরো একটি ফুল চাই তার– সেই প্রয়োজন থেকেই। মহিলার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থাতেই প্রৌঢ় শিল্পী সহপাঠী এক বন্ধুর সাথে একবার বেশ্যালয়ে যান– বস্ত্রহীন করে নারীর ছবি আঁকা তথা আকারের সন্ধানে। মেঝের ওপর ছেঁড়া শতরঞ্জে শুয়েছিল নগ্ন মেয়েটি। শেষরাতে বন্ধুটি বাংলা মদে অচেতন হলে মেয়েটি তাকে টেনে অন্ধকারে ঘামে ভেজা বুকে নিয়েছিল। এই প্রথম দেহ-সংসর্গ। নাট্যকারের ভাষায় : 'প্রথম গুলি খেয়েছিল বাঘ– রক্তের আস্বাদ ভোলেনি।' (হক, ২০১৬ : ৩৪৫) সেই রক্তের টানে আমলার স্ত্রীকে নিয়ে বেশ কয়েক মাস কাটানো। একদিন সেও চলে যায়– স্বামী তার রাষ্ট্রদূত হলে প্রাচীন সতীর মতো সহগামী হয়ে ওঠে বিমানে। এরপর তাকে সান্ত্বনা দিতে আসে এক নিঃসন্তান বিধাব মহিলা– বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল তার স্বামী। প্রচুর সুখ্যাতি আর হাতে তার প্রচুর সময়। ফলে সে প্রৌঢ় শিল্পীর কাছে আসত, ছবি আঁকা দেখত, ভালোমন্দ রান্না করত, গান শোনাত– 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।' হঠাৎ একদিন ঈর্ষা হয় প্রৌঢ়ের। আত্মজিজ্ঞাসা জাগে– কার সঙ্গে ঝুলনায়, কার সঙ্গে কোন বনে দুলেছিল– যুদ্ধশহিদ স্বামী তো সে নয়। এরপর একদিন টান দিয়ে বিছানায় নেয় তাকে। মূলত তিনি এই নারী-সংসর্গেও মধ্যে খুঁজেছিলেন প্রেম–

> ঈর্ষা যদি হয় প্রেমের ক্যানভাস, সেই ক্যানভাসে আমি চেয়েছিলাম
> আমাদের দু'জনের যুগল একটা ছবি আঁকতে– তুলির বড় বড় টানে,
> রঙের পুরু পুরু চাপানে, শরীরের সমস্ত অস্থিরতা দিয়ে টেকশ্চার নির্মাণে। (হক, ২০১৬ : ৩৪৬)

ব্যর্থ হন শিল্পী। আত্মদ্বন্দ্বে এবং আত্মজিজ্ঞাসার জর্জরিত হয়ে আবিষ্কার করেন নিজেকে– 'ঘাতক' হিসেবে। বস্তুতপক্ষে তিনি একটি প্রেমকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন– যে প্রেম তার প্রথম প্রেম। একপাক্ষিক হলেও গভীর ছিল যার অনুভব। সেই প্রেমকে হত্যার জন্যই ক্রমাগত নারী-সংসর্গ। কার্যত তার ভেতরে কোনো প্রেম ছিল না, ছিল নারীর প্রতি ঘৃণা– ছিল নারীর কাছে বারবার পারজিত হয়ে নারীকেই নষ্ট করার ক্রোধ। যেই ক্রোধের কিছু রাগী দাগ আর ক্রুদ্ধ দোমড়ানো-মোচড়ানো কিছু আকারের সমন্বয়ই প্রৌঢ়ের বিমূর্ত শিল্পকর্ম। যে শিল্পকর্মের জন্য তিনি হয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাবস্ট্রাট শিল্পী। উল্লেখ্য যে, প্রৌঢ় শিল্পী যখন নারীর কাছে

বারবার পরাজিত হয়ে নারীকে নষ্ট করার ক্রোধে ক্রুধান্বিত– তখন তিনি বক্ষ্যমাণ কাব্যনাটের যুবতীকে দেখতে পান। যুবতী তখন 'প্রি-ডিগ্রি সেবেন্ত ইয়ারে'র শিক্ষার্থী। যদিও যুবতী প্রৌঢ় শিল্পীর সরাসরি ছাত্রী ছিল না। তাছাড়া যুবতীর ছাত্রী-জীবনের প্রথম দুবছর তিনি কলেজে ছিলেন। তারপর মাস্টারি ছেড়ে তিনি ব্যস্ত হন শুধু আঁকা নিয়েই। তবুও তার মাস্টারি-জীবনে কলেজপ্রাঙ্গণে– কখনো করিডোরে, কখনো গাছের নিচে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখেছেন যুবতীকে। (হক, ২০১৬ : ৩১৮) একদিন তিনি যখন ভাস্কার্য বিভাগের দিকে যাচ্ছিলেন, হরিণের খাঁচার সম্মুখে হঠাৎ যুবতীকে দেখেন। যুবতী তখন ঝুঁকে পড়ে হরিণ দেখছিল– যা দেখে তার–

> মনে হয়েছিল, ঘুমন্ত অগ্নিগিরি, বাইরে পাথর তার ভেতরে আগুন:
> সে আগুন বেরিয়ে আসতে চায়, পাথর গলিয়ে ঠেলে
> স্রোত হয়ে নেমে আসতে চায় কাঁধ বেয়ে।
> ... মনে হলো, রঙের ভেতর থেকে
> আগুনের স্নান করে বেরিয়ে আসতে চাইছে সব ক'টি রঙ–
> ধাবত, ভেষজ রঙ, মৌলিক রঙ–
> লাল নীল সবুজে আমার চোখ বুঝি অন্ধ হয়-হয়,
> আমি মুহূর্তের মধ্যে এক অপরূপ আগুনের ভেতরে সাঁতার দিয়ে
> পৃথিবীর আদিম তীরে গিয়ে উঠলাম।
> তোমাকে দেখলাম। একজন মানুষকে দেখলাম। এক নারীকে দেখলাম। (হক, ২০১৬ : ৩৪৬-৩৪৭)

এটাই মূলত দেখা। একজন প্রকৃত শিল্পীর 'চোখ'-এ দেখা। যে দেখার কাছে পূর্বের দেখাগুলো গৌণ– তথা সচরচার দেখা ছিল। মূলত শিল্পী তার নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে শিল্পের উপকরণ তথা সৌন্দর্য খোঁজেন– বাঁধা পড়েন কোনো বিশেষ এক মুহূর্তের কাছে। তেমনই এক মুহূর্ত ছিল যুবতীর ঝুঁকে পড়ে হরিণ দেখার দৃশ্য– যে দৃশ্যে আটকা পড়েন প্রৌঢ় শিল্পী। তার মনে হয়–

> ... এই নারীটিকে ক্যানভাসে যদি ধরতে পারি।
> তাহলে নারীকেই যে একদিন নষ্ট করেছি সজ্ঞানে, তার একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়।
> দেহকে একদিন আমি যে অপমান করেছিলাম, এই কুমারী দেহটিকে
> রঙ আর রেখার অর্পণে উপাসনা করে হয়ত শুদ্ধ হওয়া যায়। (হক, ২০১৬ : ৩৪৭)

এই দেখার মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না– ছিল রং আর রেখার অপর্ণে উপাসনা করে শুদ্ধ হওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু যাকে নিয়ে এই কল্পনা, সেই নারীই যখন তাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে তখন তার কল্পনাসাগর মুহূর্তের মধ্যেই শুকিয়ে নিষ্করুণ মরুভূমিতে পরিণত হয়! তিনি দ্রুত ফিরে যান ভাস্কর্য বিভাগের দিকে। পরাজয়ে নত হয়ে ফিরে যান অফিসে। ফেরেন বাড়ি। দাঁড়ান স্টুডিওতে– ক্যানভাসের সামনে। কিন্তু একটাও তুলির টান দিতে পারেননি! প্রসববেদনায় ছটফট করেও টানা তিনমাস আঁকতে পারেননি– শুধু তুলি হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছেন সাদা ক্যানভাসের সামনে!

কারণ, কল্পনার সেই নারীর সাথে ভীষণ দূরত্ব তার। তারপর দেখা হয়েছে বহুবার, কিন্তু প্রৌঢ় শিল্পী সযত্নে এড়িয়ে গেছেন তাকে– যদি 'স্যার' বলে ডেকে ওঠে এই ভয়ে। অতঃপর একটা সময় প্রৌঢ় শিল্পী কলেজের মাস্টারি ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আঁকা নিয়ে। কার্যত, ১৯৭৬ সালেও প্রৌঢ় শিল্পী কলেজে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয় কাব্যনাটকের যুবক চরিত্রটি তখন শেষবর্ষে ওঠে। (হক, ২০১৬ : ৩৩৬) এই বর্ষের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্য সে দায়ী করেছে প্রৌঢ় শিল্পীকে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে– তার কাজ প্রৌঢ় শিল্পী পছন্দ করত না। এছাড়া সে প্রৌঢ় শিল্পীর পথে না-চলে, তার মতো করে না-এঁকে, তার শিল্পবোধে আস্থা না-রেখে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে রিয়ালিস্টিক ছবি এঁকেছে। তাছাড়া ক্লাসের বাইরেও সে বহুদিন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পীকে তর্ক করে বিরক্ত করেছে, হতাশ করেছে। ফলে সে তার শেষবর্ষের ফল খারাপের জন্য দায়ী করেছে তাকে। (হক, ২০১৬ : ৩২৯) এটা ছিল তার একান্ত অনুমান, অথবা প্রৌঢ় শিল্পী দায়ী হতেও পারেন। সেই তর্কে না-এগিয়ে ধরে নেওয়াই যৌক্তিক যে, ১৯৭৬ সালেও প্রৌঢ় শিল্পী কলেজে মাস্টারি করেছেন। কারণ, ১৯৭৫ এর আগস্ট মাসে যুবক চরিত্রটি শেষবর্ষে পৌঁছায়– যে বর্ষের পরীক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে একবছর পর– অর্থাৎ ১৯৭৬-এ অনুষ্ঠিত হয়। তখনও প্রৌঢ় শিল্পী মাস্টারি ছাড়েননি। এ বছরেই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রৌঢ় শিল্পীর কাঁধে হাত রাখেন দ্বিতীয়বার– যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত তাঁর কণ্ঠস্বর, কর্কশ ও ফিসফিস– শোনা যায় কি যায় না, তখন তিনি তার কাঁধ খামচে ধরে বলেছিলেন–

> আমারেনি নিয়ে যাইত পারো একবার সেই দুফর বেলায় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে?
> তারে আমি দ্যাখতাম।'– 'কারে, স্যার?'– 'আহ্, কিচ্ছু বোঝো না।' বলে,
> ধীরে, বড় অসহায়ভাবে হাত এনে বুকে রাখলেন, ওপাশে ফিরিয়ে মুখ
> কিছুক্ষণ পরে নিজেকেই যেন বললেন, 'তারে আমি আবার আঁকতাম,
> আবার পাইলে তারে বিয়া করতাম'– (হক, ২০১৬ : ৩১৪-৩১৫)

এই বলেই তিনি পাশ ফেরেন চোখেমুখে কষ্টের হাত থেকে কেড়ে আনা আশ্চর্য হাসি নিয়ে– যা দেখে প্রৌঢ় শিল্পী আশ্চর্য হন। আবিষ্কার করেন আরেক জয়নুলকে– 'দুর্ভিক্ষে'র জয়নুল নয়, 'গুনটানা' মাঝির জয়নুল নয়, নয় 'মনপুরা ৭০'-এর জলোচ্ছ্বাসে দীর্ঘ এক পটের জয়নুল। ব্যক্তিগত, অন্তর্গত, একা জয়নুল। নীল আকাশের নিচে সবুজ ধানের ক্ষেতে লাল শাড়িপরা নারীটির জয়নুল। যে জয়নুল প্রৌঢ় শিল্পীর কাঁধ খামচে ধরে বলেছিলেন, 'তারে আমি আবার আঁকতাম।' লক্ষণীয়, প্রথমবার জয়নুল প্রৌঢ়ের প্রদর্শনীতে সকলের সম্মুখে অবিশ্বাস্য কঠিন ও কোমল থাবায় কাঁধে চাপ দিয়ে বলেছিলেন : 'আমার যৌবনকাল ফিরায়া আনলা তুমি এই ছবিতে আবার।'– এই হাত রাখার মধ্যে উদ্দীপনা আছে, প্রেরণা আছে, আছে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান। আর দ্বিতীয়বার হাত রাখেন সকলের সম্মুখে নয়, একান্তে– যখন তিনি

প্রৌঢ়ের কাঁধ খামচে ধরেন। এই হাত রাখার মধ্যে আর্জি আছে, আর্তি আছে, আছে তাঁর অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতেই প্রৌঢ় শিল্পী হয়তো কলেজের মাস্টারি ছেড়ে আঁকা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খোঁজেন জয়নুলের যৌবনের সেই একখানি মুখ– যে মুখটা খুঁজতেই বহুবার একা একা গেছেন ব্রহ্মপুত্র পাড়ে। ভেবেছেন : 'জয়নুল কাকে কোন কিশোর বেলায়/ দেখেছেন, আজো শেষ হয়নি সে দেখা; আজো সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে?' (হক, ২০১৬ : ৩১৫)– এভাবেই খুঁজে ফেরা, বারবার আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হওয়া। প্রৌঢ় শিল্পী যখন এভাবে আবেদিনে আবিষ্ট হয়ে আছেন তার বহুদিন বাদে হঠাৎ একদিন কাব্যনাটকের যুবতী মেয়েটি নিজেই আসে কাজ দেখাতে। প্রৌঢ় শিল্পী কখনো ভাবেনি যে, এতদিন পরে আবার আসবে সে। উল্লেখ্য যে, প্রৌঢ় শিল্পীর সাথে যুবতী চরিত্রের পুনরায় দেখার ঘটনাটা বহুদিন পরের ঘটনা ভাবাই সমীচীন। কারণ, পূর্বেই দেখানো হয়েছে– যুবতীর প্রেমিক যুবক চরিত্রটি ১৯৭৬ সালে শেষবর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। কলেজজীবনে তাদের প্রেমের সম্পর্ক। সেই হিসেবে যুবতী চরিত্রটি যুবকের সমবয়সি না-হলেও দুই-তিন বছরের ছোটো অনুমান করাই শ্রেয়। তাছাড়া যুবতীর ছাত্রী-জীবনের প্রথম দুবছর প্রৌঢ় শিল্পী কলেজে ছিলেন। এই কাব্যনাটকে নাট্যকার যে বাস্তবজীবনের সংঘাতময় ঘটনা চিত্রিত করেছেন, সেটা স্বৈরশাসনামলের। কারণ, যুবক চরিত্রটি বর্ণনা করেছেন স্বৈরশাসনের ভয়াবহ দৃশ্য। (হক, ২০১৬ : ৩৩০) নাট্যকার মূলত মুক্তিযোদ্ধা যুবক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৫, '৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ এবং স্বৈরশাসনামল (যেখানে নাটকের চরিত্রত্রয়ী বাস্তব-ভূমিমাটিতে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত)– তথা বাংলাদেশের রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, প্রৌঢ় শিল্পী কলেজের মাস্টারি ছেড়েছেন ১৯৭৬ পরবর্তী সময়ে। অতএব যুবতী চরিত্রের প্রৌঢ় শিল্পীর কাছে কাজ দেখানো তথা শিল্পের পাঠ নিতে আসার ঘটনাকে বহুদিন পরের ঘটনা– নির্দিষ্টভাবে স্বৈরশাসনামল হিসেবেই ধরে নেওয়া সমীচীন। তাছাড়া নাট্যকার এই কাব্যনাট্যের পরিসমাপ্তিতে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা দেখলেও এই সত্যতা মেলে–

> প্রৌঢ় ধীরে নত হয়ে বসে মেঝের ওপর। একই সংগে আলো গুটিয়ে শুধু তার কাঁধসহ মুখের ওপর স্থির হয়। কিছুক্ষণ পরে তার কাঁধে নারীর একটা হাত এসে স্থাপিত হয়। প্রৌঢ় মুখ তুলে তাকায়। আলো ধীরে বিস্তৃত হয়। দেখা যায় তার কাঁধে হাত রেখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে যুবতী, কিন্তু এখন তার চুলে পাক ধরেছে। প্রৌঢ় তার দিকে মুখ তুলে তাকায় এবং ধীরে তার হাতের ওপর হাত রাখে। (হক, ২০১৬ : ৩৬৮)

যুবতীর চুলে পাক ধরার ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই অনুমান করা শ্রেয় যে, প্রৌঢ় শিল্পীর সাথে যুবতীর পুনরায় দেখা হয় বহুদিন পর (১৯৮২-১৯৭৬ = ৬ বছর বা তারও বেশি। কারণ, যুবক চরিত্রটি স্বৈরশাসনামলের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছে। অর্থাৎ স্বৈরশাসনামল সে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ১৯৮২ সালে আরম্ভ হওয়া স্বৈরশাসন পর্যবেক্ষণের জন্য সময় প্রয়োজন। সেই হিসেবে অনুমান করা যৌক্তিক যে, যুবতীর

সাথে প্রৌঢ় শিল্পীর পুনরায় দেখা হয়েছে ৬ বছর নয়, বরং তারও অধিক পরে।)। উল্লেখ্য যে, এতদিন পূর্বে যাকে দেখে প্রৌঢ় শিল্পীর শিল্পবোধ নতুনরূপে জাগৃত হয়েছিল– যাকে তিনি রং আর রেখার অর্পণে পরিশুদ্ধভাবে ক্যানভাসে ধরতে চেয়েছিলে– সেই মেয়েটি নিজেই যখন আসে, তখন তার 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন নাট্যকার এভাবে–

> সময়টা বিকেল ছিল, আকাশের নীল ছিঁড়ে মেঘেরা খাচ্ছিল, আমার ভেতরে
> একটি ভীষণ ভীতু হরিণ খাচ্ছিল গোপন সবুজ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে শব্দহীনভাবে।
> স্টুডিওর দরোজা এবং হৃদয়টা খুলে দিয়ে হাত তুলে নিঃশব্দ ইশারায়
> 'এসো' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরনে তাঁতের শাড়ি, জমিনে অলিভ গ্রীন,
> পাড়ে ও আঁচলে ছিল ক্যাডমিয়াম রেড, কপালের টিপে আয়রন অকসাইড রেড,
> ভালো হতো যদি টিপের রঙটি হতো ক্রোম ইয়েলো,
> তুমি কি জানো যে প্রতি কণা ক্রোম ইয়েলোর গ্রীন দিয়ে?–
> এক জীবনের ব্যবধানে বিশেষ এ ইয়েলোটি হয়ে যায় গ্রীন?– (হক, ২০১৬ : ৩১৯)

প্রৌঢ় শিল্পী এখানে স্বৈরশাসনামলের বাস্তব-ভূমিমাটিতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করছেন দ্বিতীয়বার প্রথম দেখা সেই বিশেষমুহূর্তের কথা। অর্থাৎ এটা তার বিশেষ স্মৃতি। কার্যত, মানুষের 'স্মৃতি'– 'ছবি' ভিন্ন আর কিছু নয়। যে ছবিকে নাট্যকার অলিভ গ্রিন, ক্যাডমিয়াম রেড, আয়রন অকসাইড রেড, ক্রোম ইয়েলো রঙের সমন্বয়ে চিত্রিত করেছেন। এই রঙগুলো মূলত ব্যবহৃত হয় তেলরঙের ক্যানভাসে। অর্থাৎ নাট্যকারের কাব্যভাষায় চিত্রিত এই ছবি– তেলরঙে আঁকা এক নারীর ছবি– যেখানে নারী এবং প্রকৃতি এক অদ্বয় সম্বন্ধের মেলবন্ধনে আবদ্ধ। এই নারীকেই বহুদিন পূর্বে প্রৌঢ় শিল্পী ক্যানভাসে ধরতে চেয়েছিলেন– সেই নারী এলো। শিল্পী স্টুডিওর দরোজাটার সাথে সাথেই খুলে দিলেন হৃদয়টা। একজীবনের ব্যবধানে বিশেষ ইয়েলোটি হয়ে গেল গ্রিন। স্মর্তব্য, নাট্যকার প্রৌঢ় শিল্পীর সাথে যুবতীর দ্বিতীয়বার প্রথম দেখাকে বহুদিন পরের ঘটনা বোঝাতে 'এক জীবনের ব্যবধান' শব্দবন্ধন ব্যবহার করেছেন, বলেছেন, 'বিশেষ এ ইয়েলোটি হয়ে যায় গ্রীন'। 'ইয়েলো' হচ্ছে সূর্যের রং। আমাদের গ্রহের অবলম্বন। এটি মূলত প্রাণ, শক্তি, আনন্দ, ভরসা এবং আত্মজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশক। আর 'গ্রিন' হচ্ছে প্রকৃতির রং। আশার প্রতীক, নতুন জীবনের প্রতীক, উর্বরতার এবং সমবৃদ্ধির প্রতীক। 'গ্রিন' শান্তি এবং বিশ্রামের রং। এই রং ক্লান্তি হরণ করে আমাদের তরতাজা করে। উপর্যুক্ত সংলাপে ব্যবহৃত 'ইয়েলো' হচ্ছে– বহুপূর্বে হরিণের খাঁচার সম্মুখে হঠাৎ দেখা সেই যুবতী। যে ছিল তার ব্যক্তিগত গ্রহের অবলম্বন। যাকে দেখে তিনি প্রাণ পেয়েছিলে, শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, ভেসেছিলেন কল্পনার আনন্দসাগরে– সর্বোপরি যাকে দেখে সজ্ঞানে নারীকে নষ্ট করার ক্রোধ থেকে প্রায়শ্চিত করা এবং রং আর রেখার অর্পণে উপাসনা করে শুদ্ধ হওয়ার কথা ভেবেছিলেন। অর্থাৎ উজ্জীবিত হয়েছিলেন আত্মজ্ঞানে। 'গ্রীন'– হচ্ছে বহুদিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার প্রথম দেখা

যুবতী। যাকে দেখে তিনি 'আশায় বাসতি' গড়ে ছিলেন, কল্পনা করেছিলেন নতুন জীবনের, স্বপ্ন দেখেছিলেন শিল্পসমৃদ্ধির এবং তাকে আশ্রয় করে 'এক জীবনের ব্যবধান'র ক্লান্তি দূর করে হতে চেয়েছিলেন সতেজ-সমৃদ্ধ। সর্বোপরি তাকে তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। বস্তুত প্রকৃত শিল্পীর কাছে নারী এবং প্রকৃতি অভিন্ন কোনো বিষয় নয়– গ্রিন সেই প্রকৃতির রং। 'এক জীবনের ব্যবধানে বিশেষ এ ইয়েলোটি হয়ে যায় গ্রীন'– কাব্যভাষার মাধ্যমে নাট্যকার প্রৌঢ় শিল্পীর প্রেম তথা 'হৃদয়ে'র দোয়ার খোলার কথাকেই ইঙ্গিত করেছেন। স্মর্তব্য, প্রৌঢ় শিল্পী তার যৌবনে বস্ত্রহীন করে নারীর ছবি আঁকার প্রয়োজনে যখন বেশ্যালয়ে যান– প্রথম দেহ-সংসর্গ করেন, তখন নাট্যকার তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রথম গুলি খেয়েছিল বাঘ– রক্তের আস্বাদ ভোলেনি।' কিন্তু বহুদিনের ব্যবধানে যুবতীকে দ্বিতীয়বার প্রথম দেখা মুহূর্তে প্রৌঢ়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ভেতরে/ একটি ভীষণ ভীতু হরিণ খাচ্ছিল গোপন সবুজ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে শব্দহীনভাবে।' সংলাপদুটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম সংলাপে তিনি ব্যবহার করেছেন 'বাঘ' শব্দটি। বাঘের সাথে রক্তের স্বাদ, মাংস তথা শরীরের আস্বাদ এবং হিংস্রতা জড়িত। নাট্যকার বাঘের রক্তের আস্বাদ প্রতীকে প্রৌঢ়ের নারীশরীর ভোগকে (sex) বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয় সংলাপে তিনি ব্যবহার করেছেন 'হরিণ' শব্দটি। হরিণের সাথে সবুজ, কোমলতা, নম্রতা, স্নিগ্ধতা– সর্বোপরি ভীতির সম্পর্ক। নাট্যকার 'ভীষণ ভীতু হরিণ' শব্দব্যঞ্জনায় প্রৌঢ়কে বুঝিয়েছেন– যে হরিণ খাচ্ছিল গোপন সবুজ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে শব্দহীনভাবে। এখানে 'গোপন সবুজ ঘাস'– প্রৌঢ়ের গোপন সবুজ প্রেম; 'ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া' অর্থ– হৃদয়কে কুরে কুরে খাওয়া– সর্বোপরি 'শব্দহীনভাবে'– অর্থে গভীর-গোপন এবং অস্ফুট-তরুণ প্রেমকেই ইঙ্গিত করেছেন নাট্যকার। এ প্রেম একপাক্ষিক বলেই তিনি 'ভীষণ ভীতু' শব্দব্যঞ্জনা ব্যবহার করেছেন– যেখানে বাঘের হিস্রতা নেই, আছে হরিণের নম্রতা-সজীবতা, আছে প্রেম। উল্লেখ্য যে, কলেজপ্রাঙ্গণে প্রথম দেখার মুহূর্তে যুবতী মেয়েটি 'স্যার' সম্বোধন করাই প্রৌঢ় শিল্পীর কল্পনাসাগর শুকিয়ে নিষ্করুণ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। টানা তিনমাস তুলি হাতে সাদা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে একটিও আঁচড় দিতে পারেননি– সর্বোপরি শিল্পী সযত্নে এড়িয়ে গেছেন তাকে– যদি 'স্যার' বলে ডেকে ওঠে এই ভয়ে। সেই মেয়েটি এতদিন পরে এসে যখন পুনরায় তাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে, তখন তিনি বলেন–

> আমি কলেজ ছেড়েছি, আমি আর স্যার নই, তাছাড়া শিল্পীকে
> শিল্পীই বলে ভাববে যদি তুমি সত্যি সত্যি তাকে শিল্পী বলে মনে করো।
> যদি তুমি সত্যিই তার কাজ ভালোবাসো। (হক, ২০১৬ : ৩১৯)

প্রৌঢ় শিল্পীর যুবতীকে 'স্যার' সম্বোধন করতে নিষেধ করার ঘটনাকে আপাতদৃষ্টিতে অসৎ উদ্দেশ্য মনে হলেও এর নেপথ্যে ছিল মহৎ উদ্দেশ্য– 'শিল্পসাধনা'। যে সাধনার

বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কলেজপ্রাঙ্গণে প্রথম দেখার মুহূর্তে। অতএব তাকে ক্যানভাসে ধরার বাসনায় এবং তার সঙ্গে ভীষণ দূরত্ব ঘোচাতেই প্রৌঢ়ের এই প্রস্তাব। কারণ, দূরত্ব থাকলে প্রাণ পাবেন না, প্রেম পাবেন না, পাবেন না আকার। ফলে পূর্বের মতো তুলি হাতে সাদা ক্যানভাসের সামনে অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও পারবেন না একটিও আঁচড় দিতে। এই সমস্ত নাসূচক নেতিবাচকতাকে ইতিবাচক করতেই দ্বিতীয়দর্শনেই প্রথম দেখার 'ভীষণ দূরত্ব ঘোচানো'র ইঙ্গিত। কারণ, তিনি পরিপূর্ণভাবে তাকে চান, চান তার একপাক্ষিক গভীর-গোপন প্রেমকে দ্বিপাক্ষিক করতে। এই চাওয়া থেকেই শিল্পের পাঠ নিতে আসা যুবতীর মনে শিল্পের বোধ জাগিয়ে তুলতে তুলতে জাগিয়ে তোলেন শরীর– জাগিয়ে তোলেন মন। শরীর জাগানোর প্রথম ঘটনা ঘটে কালীগঙ্গায়। প্রৌঢ় শিল্পী তিস্তাপারে বেড়ে ওঠা নদীপাগল যুবতীকে নিয়ে যান কালীগঙ্গা নদীতে। বর্ষায় পাগল নদী– দুকূল ভাসানো জলে। 'স্যাপ গ্রীন কে যেন পানিতে বড় হালকা করে মিশিয়ে দিয়েছে।' (হক, ২০১৬ : ৩২৩) ফলে নদীরূপে মুগ্ধ হয়েই জলরঙে নদীর সিরিজ আঁকার কল্পনায় বিভোর ছিল সে– না-আঁকা সিরিজের ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছিল মাথার ভেতর। বর্ষায় মাতাল নদীর বিষম টানে নৌকার দুলুনিতে সে যখন ভয় পাচ্ছিল, তখন প্রৌঢ় শিল্পী তাকে আলতো করে বাহুডোরে বাঁধেন। অতঃপর একটুও আপত্তি নেই জেনে হঠাৎ ঠোঁট দিয়ে অধিকার করেন ঠোঁট। যুবতীর মনে হয়–

> নদীই মানুষ হয়ে ভিজিয়েছে আমার দু'ঠোঁট; একবার নদীকে দেখলাম,
> নদীতে সবুজ রঙ, নদী আছে নদীর কাছেই, দেখলাম চুমোটি আপনার।
> আপনারই আস্বাদ ঠোঁটে। (হক, ২০১৬ : ৩২৩)

শিল্পশিক্ষাধীন যুবতী যদি বর্ষাপাগল নদীরূপে মুগ্ধ হয়ে মাথার ভেতর অবিরত নদী সিরিজ আঁকতে পারে– বাহুডোরে বাঁধা পড়াকে যদি নদীর হাত হয়ে হাতে টেনে নেওয়া ভাবতে পারে– একটি চুম্বনকে যদি নদীর মানুষ হয়ে ভিজিয়ে দেওয়া ভাবতে পারে– সেই সময় অপরপক্ষের প্রতিক্রিয়াটাও ভাবা সমীচীন নয় কী? অপরপক্ষের ব্যক্তিও তো শিল্পী। যে শিল্পী যুবতীকে ভালোবেসেছে– চেয়েছে তার ক্যানভাসে ধরে রং আর রেখার অর্পণে শুদ্ধ হতে। সেই ভালোবাসার মানুষটি– বর্ষাপাগল নদীর মতোই ছিল যার উচ্ছলতা– সে যখন এত কাছাকাছি থাকে, তখন তিনিও হয়তো তাকে নদী ভেবেই চুম্বন করেন। কারণ, 'নদী ও নারী' তো শিল্পীর জীবনের সাথে মিশে থাকা অদ্বয়সত্তা। কার্যত এই চুম্বনই যুবতীর 'পরানের গহীন ভিতর' সৃষ্টি করেছিল আলোড়ন। ফলে কালীগঙ্গা থেকে ফিরে কেবলই প্রৌঢ়ের কথা ভেবেছে, আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে খুঁজেছে উত্তর– প্রেম নাকি দেহ, দেহ নাকি প্রেম? অতঃপর প্রৌঢ়ের বারবার পাঠানো সংবাদ– 'ও যেন আমাকে ভুল না বোঝে'র মধ্যে পেয়েছে মীমাংসা। ফলে প্রৌঢ়ের কাছে যাওয়ার আগেই ছুটে গেছে তার হৃদয়। তবুও সশরীরে যায়নি। অপেক্ষা করেছে দুই দিন– 'সেই দুটো দিনে উপুড় গেলাশ যেন সব

বোধ, সব শক্তি পড়ে গিয়েছিল... মাথার ভেতরে নৌকো বড় দুলছিল, স্রোত টানছিল।' (হক, ২০১৬ : ৩২৫) সেই দোল এবং টানেই ভরদুপুরে রঙিন কাগজে মোড়া মাটির ফুলদানি নিয়ে হাজির হওয়া প্রৌঢ়ের বাসায়। যুবতী ফুলদানির মোড়ক খুলেছে কি খোলেনি এমতাবস্থায় প্রৌঢ় পুনরায় কালীগঙ্গার মতো চুমো দিয়ে জড়িয়ে ধরেন, জানতে চান– 'ফুলদানি, কিন্তু ফুল?' যুবতী হঠাৎ মুখরা হয়ে জবাব দেন– 'আমি তো এসেছি।' (হক, ২০১৬ : ৩২৬ ও ৩১৭) এই আসাই প্রকৃত আসা– প্রেমের টানে আসা। প্রৌঢ় তার হৃদয়ের ফুলদানিতে পেয়ে যার 'জীবনের আশ্চর্য গোলাপটিকে'। যে গোলাপটিকেই তিনি বহুদিনপূর্বে ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছিলেন, সেই গোপালটিকে কাছে পেয়ে– 'যেন এতকাল আমার যে-জীবন ছিল প্যাডের কাগজের মতো আশাহীন শাদা,/ সেখানে প্রথম এর রেখা দেখা দিল অবিকল ঈগলের ডানা।' (হক, ২০১৬ : ৩১৮) অর্থাৎ তার কল্পনার প্রেম সত্যি হলো– সত্যি হলো ক্যানভাসে ধরার স্বপ্ন। অতঃপর সম্পূর্ণ প্রেম থেকে প্রবাহিত আঙুলের রক্তে আর স্পন্দনে তিনি আঁকতে উদ্যত হলেন–

> ... মুখ আঁকতে গেলে প্রথমে ফোটাতে হয় চোখ, আমি চোখ আঁকলাম।
> আমি একটানে আশ্চর্য একটি চোখ কাগজে ধরেছি। তুমি চোখ
> ফেরালে আমার দিকে প্রোফাইলকে ভেঙে দিয়ে অপরূপ উৎকণ্ঠা নিয়ে,
> যেন কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে নীরবে নিঃশব্দে। তুমি নড়ে উঠতেই
> আমি আবার আমাকে যেন ফিরে পেলাম (হক, ২০১৬ : ৩১৮)

কাব্যভাষায় নির্মিত এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রৌঢ় শিল্পী প্রেম এবং শিল্প অদ্বয় করে ভেবেছেন। কার্যত তিনি চেয়েছেন 'বিশুদ্ধ আকার'– যার জন্য অপরিহার্য 'বিশুদ্ধ অনুভব' তথা প্রেম। এ দুটোর অনুপস্থিতিতে ছবি হলেও 'সে-ছবিতে থাকবে না প্রাণ, হবে শুধু শিল্পহীন রঙ আর বস্তুর বমি।' (হক, ২০১৬ : ৩২১) এই শিল্পবোধকে প্রৌঢ় শিল্পী প্রবিষ্ট করেছেন যুবতীর মধ্যে– সর্বোপরি তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে প্রতীক্ষিত লাল শাড়িপরা জয়নুলের সেই নারীটিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ফলে জয়নুলের স্মরণে প্রৌঢ় শিল্পী যখন যুবতীকে লাল শাড়ি পরে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে নিয়ে যান, যুবতীও তখন নিজেকে জয়নুলের নারী বলেই ভাবে। তাকে ভালোবেসে ফেলে। ফিরে এসে সে রাতেই ন্যুড হয়ে যায় প্রৌঢ়ের ক্যানভাসে। অতঃপর প্রৌঢ়ের আলিঙ্গনে বৃষ্টিভেজা হয়ে হোস্টেলে ফিরে সারারাত রং নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই এঁকে ফেলে প্রৌঢ়ের মুখ। একই রাতে আঁকা হলো দুটো ছবি– প্রথমটি প্রৌঢ় শিল্পীর আঁকা যুবতীর প্রথম ন্যুড এবং দ্বিতীয়টি যুবতীর আঁকা প্রৌঢ়ের প্রথম মুখ। অর্থাৎ প্রেমে পড়েছে দুজনই। কিন্তু এ প্রেম 'পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা-আপনি'র মতো নয়– এ প্রেম শিল্পের প্রতি প্রেম। যুবতী তার দেহকে প্রৌঢ়কে দেখিয়েছে প্রৌঢ়ের ভেতরে এক মহান শিল্পীকে দেখে, তার প্রতিভা এবং স্মৃতির সবটুকু অধিকার করে নিতে। (হক, ২০১৬ : ৩৬১) বস্তুত মন যেহেতু শরীর থেকে আলাদা নয়, সেহেতু যুবতীর মনও প্রৌঢ়ের হয়ে যায়। ভালোবেসে

ফেলে। কিন্তু এ ভালোবাসা যুবকের সাথে যুবতীর যে ভালোবাসা তেমন নয়। কার্যত 'প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের ভেতরে একাধিক ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে।' যুবতীর কথায়–

> শিল্পের সংসারই এমন, একসংগে দু'জনকে ভালোবাসা যায়।
> তিনজন? তাও মোটে অসম্ভব নয়, যদি আপনাকে ধরি।
> আপনি কি জানেন, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে আপনাকেও ভালোবেসে ফেলি?
> তাই ফিরে এসে সে রাতেই ন্যুড হয়ে যাই, আপনার ক্যানভাসে।
> তিনের পরেও আমি চতুর্থকে ভালোবাসা দিই, ভালোবাসি–
> যে এখন আমার স্বামী। (হক, ২০১৬ : ৩৬১)

এটাই জীবনের শিল্পিতসত্য। যুবতী একই সাথে চার ব্যক্তিত্বকে ধারণ করেছে– ১. জয়নুল, ২. ব্রহ্মপুত্র পাড়ের লাল শাড়িপরা জয়নুলের নারী, ৩. প্রৌঢ় শিল্পী, ৪. যুবক (স্বামী)। এই চার ব্যক্তিত্বকে একই সঙ্গে ধারণ করে সে তার নিজের ভেতরেই রক্তাক্ত হয়েছে, জন্তুর মতো কুঁকড়ে মরেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পরেনি। পারেনি যুবক কিংবা প্রৌঢ় কাউকে ভালো না-বাসতে। ফলে যুবক শিল্পীর সঙ্গে স্কেচপ্যাড নিয়ে সারাদিন মাঠঘাট চষে বেলাশেষে তাড়াতাড়ি হোস্টেলে ফেরার নামে প্রৌঢ় শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করেছে। ন্যুড হয়ে সারারাত সিটিং দিয়েছে, লিপ্ত হয়েছে দেহ-সংসর্গে। আত্মদ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বিত হয়ে কখনো কখনো সিটিং দিতে ইতস্তত করেছে, বসবে কি বসবে না– কিন্তু হেরে গেছে প্রৌঢ়ের প্রেমের কাছে। মেঘনা থেকে ফিরে এসে যুবতীর অসমাপ্ত ন্যুড শেষ করে প্রৌঢ় যখন তাকে কাছে ডাকেন যুবতী ঝাঁপিয়ে দাঁড়ালে তার গালে ব্লু লেগে যায়। সেই বিশেষ কোবালট ব্লু– যার মধ্যে আছে বিষ। লাগলে জ্বালা করে। তাড়াতাড়ি ধুয়ে না-ফেললে, ত্বক বেশি সেনসিটিভ হলে ক্ষত হতে পারে। সেই ব্লু তার গালে লেগে গেলে প্রৌঢ় শিল্পী দ্রুত ছুটে এসে নিজ হাতে ধুয়ে দেন। তখন যুবতীর মনের–

> একটা জটিল গিঁট খুলে গেল সুতোর এক সরল টানে;
> আমি আপনার ভালোবাসা দেখলাম অবিকল সেই তার মতো
> যাকে আমি স্বামী বলে আজকেই গ্রহণ করেছি।
> সেই মুহূর্তেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আপনি বা সে, একজন–
> কারণ, সেই মুহূর্তে আপনি আমার কাছে ধরা দেন শিল্পী নয়,
> রক্তমাংসে ইচ্ছার তাপে তৈরী একজন মানুষ হয়ে।
> আমি আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে,
> ধীরে, অগোচরে– যেন আঘাত না পান, বিয়ে করলাম,
> তাও আপনাকে না জানিয়ে, আর এটাও আপনাকে ভালোবেসেই। (হক, ২০১৬ : ৩৬২)

এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যুবতী প্রৌঢ় শিল্পীকে ভালোবেসেছে। অর্থাৎ প্রৌঢ়ের কাছে শিল্পের পাঠ নিতে আসা থেকে শুরু করে যুবকের সাথে বিয়ে করা, এমনকি বিয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত– তার সাথে প্রৌঢ়ের যে সকল শারীরির, শৈল্পিক এবং মানসিক

কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে– সবগুলোর মধ্যেই যুবতী সজ্ঞানে প্রেম অনুভব করেছে। কখনো কখনো আত্মিকদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে ইতস্তত বোধ করলেও পরক্ষণেই প্রেমের টানে (শিল্প এবং শিল্পীকে ভালোবেসেই) ফিরে গেছে প্রৌঢ়ের কাছে। কার্যত জয়নুল আর কামরুল ছিলেন তার কাছে শুধুই শিল্পী, কিন্তু প্রৌঢ় শিল্পী ছিলেন তার কাছে একই সঙ্গে শিল্পী এবং মানুষ– যাকে সে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে বলেই বিয়ের কাবিনে সই করার পরেই স্বামীর কাছে মিথ্যা বলে ছুটে গেছে তার কাছে। ভেবেছে খবরটা সবার আগে পাওয়ার অধিকার তিনিই। এই অধিকারবোধ থেকে প্রৌঢ়ের বাড়িতে আসা এবং বিয়ের সংবাদ জানানো। স্মর্তব্য, যুবতীর বিয়ের সংবাদ প্রৌঢ়ের কাছে পৌঁছানো থেকেই বক্ষ্যমাণ নাটকটি আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভ হয়েছে বাস্তবজীবনের সংঘাতময় ঘটনার দ্বন্দ্ব। যুবতীর তার বিয়ের সংবাদ প্রৌঢ়কে দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে প্রৌঢ় প্রথমেই যুবতীর দেওয়া ফুলদানিটি ছুঁড়ে মারে– যে ফুলদানিকে প্রৌঢ় হৃদয়ের ফুলদানি ভেবে জীবনের আশ্চর্য এবং আরাধ্য গোলাপটিকে স্থান দিয়েছিলেন। অবশ্য যুবতীই তাকে উজ্জীবিত করেছিল 'ফুলদানি এবং গোপাল'বোধে। বিয়ের সংবাদ শুনে প্রৌঢ় সেই ফুলদানিকেই ছুঁড়ে মারেন। খানখান হয়ে ভেঙে যায় ফুলদানি– ভাঙে প্রৌঢ়ের হৃদয়– হৃদয়ের ফুলদানি। যুবতী তার দিকে ঘুরে তাকায়, প্রৌঢ় যুবতীর কাছে যান এবং বলেন–

> না, যাবে না, যেতে পারবে না, যেতে আমি তোমাকে দেবো না।
> এভাবে যেতে তুমি পারবে না। 'আমি বিয়ে করেছি'–
> এ কথা বললেই সব শোনা, সব বলা শেষ হয়ে যায় না।
> একবার এসে গেলে, একবার চৌকাঠ পেরুলে
> আমাদের সমস্ত চৌকাঠ পাহাড় হয়ে বাধা দেয়।
> জানো, জানো না তা নয়, সবই জানো, এবং এখানে এই বুকের মধ্যে
> কি হচ্ছে এখন, তাও জানো; জানো সবই। (হক, ২০১৬ : ৩১৩)

যুবতী প্রৌঢ়ের 'বুকের কথা' একবারও ভাবেনি। যেমনটা ভাবেননি পূর্বসূরি সমালোচকেরাও। ফলে প্রৌঢ়ের প্রেমকে স্রেফ 'দেহজ কামজ প্রেম' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন– সর্বোপরি তাকে নারীলোলুপ, দেহলোভী, দুশ্চরিত্র শিক্ষক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।[৫] কিন্তু তিনি যদি সত্যই নারীলোলুপ কিংবা দেহলোভী হয়ে থাকতেন, তাহলে যুবতী তার বিয়ের পর যে আশা নিয়ে এসেছিল, সেই আশাকে পূর্ণ করে আশীর্বাদ করে– 'যাও সুখী হও' টাইপের কোনো বাক্য ব্যবহার করতেন। মুক্ত মনে করতেন নিজেকে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে মনে মনে হয়তো বলতেন– 'আপদ চুকে গেল!' কারণ, তিনি তো যুবতীর দেহের স্বাদ নিতে কোনো খাদ রাখেননি। অতঃপর যুবতী চলে গেলে হয়তো আরেকজন যুবতীর, কিংবা কোনো বিবাহিত স্ত্রীর দেহভোগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকতেন। হয়তো তারা তার কাছে শিল্পের পাঠ নিতে অথবা তার শিল্পকর্মকে ভালোবেসেই তার কাছে আসত। কারণ, তিনি তো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ফলে

তার কাছে নারী আসাটা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। অতএব যুবতী বিয়ে করে চলে গেলে তার তো খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু যখন তিনি খুশি না-হয়ে দুঃখভারাক্রান্ত হন– রাগান্বিত হয়ে ভাঙেন ফুলদানি– যেখানে তিনি তার জীবনের আশ্চর্য গোলাপটিকে স্থান দিয়েছিলেন, তখন এই বোধে উন্নীত হওয়া সমীচীন নয় কি– যে তার অন্তর্গত রক্তের ভেতরে যুবতীর জন্য প্রকৃতই প্রেম ছিল? আসলে তার প্রেমকে কেউ ভাবেননি– যেমনটা ভাবেনি তার প্রেমিকা যুবতী চরিত্র। কার্যত, যুবতী তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই ভাবেনি, ভেবেছে মহৎ শিল্পী হিসেবে। কিন্তু– 'শিল্পের রচনাকালে মাটি ছেড়ে ঈশ্বরের পাশে যে দাঁড়ায়,/ শিল্পের রচনা শেষে মাটিতে সে নেমে এসে নিতান্ত মানুষ।' (হক, ২০১৬ : ৩৬৭) এই 'নিতান্ত মানুষ'-এর কথা যুবতী একবারও ভাবেনি, বরং শিল্পকেই ভালোবেসে ভালোবেসেছে প্রৌঢ় শিল্পীকে। নিজেকে ভেবেছে 'শিল্পের সংসার'-এর একজন হিসেবে– 'ব্যক্তিগত প্রেম যদি এক পাত্রে ধরে রাখা যায় নিঃশেষ,/ অনিঃশেষ শিল্পের প্রেম বহু পাত্র পূর্ণ করেও।' (হক, ২০১৬ : ৩৬১) এই 'অনিঃশেষ শিল্পের প্রেম'কে বুকের মধ্যে আগলে রেখে একই সঙ্গে 'বহু পাত্র পূর্ণ' করেছে, ভালোবেসেছে দু'জনকে, চারজনকে। নিঃশেষ প্রেমকে করেছে অনিঃশেষ। অতঃপর আত্মদ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বিত হয়ে বিয়ে করেছে যুবককে এবং ভালোবেসেই বিয়ের সংবাদ দিতে এসেছে আরেক প্রেমিক প্রৌঢ়ের কাছে– রক্তমাংসের মানুষ না-ভেবে মহৎ শিল্পী ভেবে। ভালোবাসার মানুষের বিয়ের সংবাদ শোনামাত্রই হৃদয়টা ভেঙে গেছে প্রৌঢ়ের। অতঃপর ভঙ্গহৃদয়ের সুন্দর-করুণ-কঠিন-কথায় স্মরণ করেছে তার প্রেমের স্মৃতি–

> ... পাখি তুমি, এই নামে ডেকেছি তোমাকে।
> কত চুমো, অসংখ্য আদর, কতবার এই হাত, এবং সে পাখির বাসা
> যে কোথায়, আজ এই এতকাল পরে পরে তাও বলে দিতে হবে?–
> তোমাকেই বলে দিতে হবে?– যে-তোমার সংগে একটি জীবন গেছে,
> যেন গেছে একটি মুহূর্তের মধ্যে শত শত শতাব্দীর কোটি কোটি দু'জনার
> প্রেম– প্রেম? 'হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে
> ফেলে যেতে হয়।' নির্বোধ, গাধারাই ফেলে যায়, সেই সব মূর্খেরা ফেলে যায়
> যারা হাতের মধ্যে হাত, চোখের মধ্যে চোখ, দেহের মধ্যে দেহ,
> আমার মধ্যে তুমি, তোমার মধ্যে আমি– এতে বিশ্বাস করে না,
> তারা ফেলে যায়, ফেলে যায়, আশাহীনভাবে ফেলে যায় সেই যারা
> বিশ্বাস করে প্রেম তো আসলেই বিচ্ছেদ, বিরহ, ছিঁড়ে ফেলা সোনার হার।–
> কিংবা বলবো ভাঙা ফুলদানি? (হক, ২০১৬ : ৩১৪)

এই জিজ্ঞাসা প্রৌঢ়ের, যুবতীর কাছে– যে যুবতীকে তিনি ভালোবেসেছেন বহু পূর্বেই। কলেজমাস্টারি-জীবনের শেষ দুটি বছর থেকেই। যাকে তিনি হরিণের খাঁচার সম্মুখে আবিষ্কার করেছিলেন। যাকে তিনি রং আর রেখার অর্পণে উপাসনা করে শুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। অতঃপর বহুদিন পরে প্রথম দেখা মুহূর্তে তার 'বিশেষ ইয়েলোটি হয়ে গিয়েছিল গ্রিন'। যাকে কাছে পেয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে আবিষ্কার করেন। প্রেমে

পড়েন। যার মধ্যে জাগিয়ে তোলেন জয়নুলের সেই নারীকে। হৃদয়ের ফুলদানিতে যে আশ্চর্য গোলাপকে আগলে রেখেছেন– সর্বোপরি যে পাখিকে তার হৃদয়নীড়ে সযত্নে পুষেছেন। তাকে তিনি ছাড়তে রাজি নন। কারণ, তার সঙ্গে প্রেমে এবং দেহ-সংসর্গে গেছে একটি জীবন– 'যেন গেছে একটি মুহূর্তের মধ্যে শত শত শতাব্দীর কোটি কোটি দু'জনার প্রেম।' সেই প্রেমকে ছেড়ে তিনি বিচ্ছেদ-বিরহ, ছিঁড়ে ফেলা সোনার হার কিংবা ভাঙা ফুলদানি হয়ে আশাহীনভাবে বেঁচে থাকতে নারাজ। বরং তিনি তাকে রক্তমাংস-মেদমজ্জায়সহ চান। ফলে স্মরণ করেন তার দেহ-সংসর্গের কথা– যেখানেও তিনি তার প্রেমকেই দেখিয়েছেন–

> ... তুমি তো নিজেও শিল্পী, তুমি জানো,
> তুমিই তো জানবে, যে, স্তন, পিঠ, নিতম্ব বা যোনিকেশ–
> মানুষের উচ্চারণে রূপ তার যাই হোক, শিল্পীর কাছে, শিল্পের কাছে,
> তুলিতে, ক্যানভাসে, রঙে দেহহীন, শরীর বিযুক্ত বটে এইসব– কেবল
> আকৃতি মাত্র, ব্যাস-বেধ-তল নিয়ে এইসবই জীবিতের প্রেমের আকার। (হক, ২০১৬ : ৩১৬-৩১৭)

একজন শিল্পী হয়েও 'জীবিতের প্রেমের' এই আকার বুঝেতে চাইনি যুবতী। ফলে প্রৌঢ় প্রেমে পরাজিত হয়ে উদ্যত করেন তার অমোঘ অস্ত্র। যুবতীর ন্যুড ছবি শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শনীর ভয় দেখান। এই ভয় দেখানোর মধ্যে আছে, নাট্যকার কথিত 'ঈর্ষা'র সেই রূপ– যা কেবল মানবের ভেতরেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। এই 'ঈর্ষা'র জন্ম হয়েছে প্রেম থেকে। কার্যত, ঈর্ষা যদি হয় প্রৌঢ়ের প্রেমের ক্যানভাস– যে ক্যানভাসে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন তাদের দুজনের যুগল একটা ছবি। কিন্তু যখন তিনি সেই যুগলছবি আঁকতে ব্যর্থ হন, পরাজিত হন, তখন তার মনে তৈরি হয় ঈর্ষা। ভয় দেখান যুবতীকে। আসলে এই ভয় দেখানোর মধ্যে আছে, পরাজিত প্রেমিকের ক্রোধ। এই ক্রোধ যতটা না যুবতীর প্রতি তারও অধিক যুবতীর স্বামী তথা যুবকের প্রতি। কারণ, তাদের দুজনের প্রেমের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন যুবক। যে যুবকের সামনে যুবতী নগ্ন হয়েছে কিনা, কিংবা ইতোমধ্যে শোয়া হয়েছে কিনা– এই ভাবনা নিয়েই তার ক্রোধ, তার ঈর্ষা। কার্যত, জীবনের সকল প্রসঙ্গের ভেতরে প্রেম ও দেহ-সংসর্গে স্থাপিত ঈর্ষাই প্রধান ঈর্ষা– যে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে প্রৌঢ় যুবতীর ন্যুড ছবি দর্শকের সম্মুখে প্রদর্শনীর হুমকি দিয়েছেন। কারণ, তিনি যে যুবতীকে সম্পূর্ণ প্রেমের থেকে প্রবাহিত আঙুলের রক্তে আর স্পন্দনে এঁকেছেন, সেই শিল্পপ্রতিমা একান্ত তারই। কিন্তু তার সেই শিল্পপ্রতিমায় যখন অন্যকেউ ভাগ বসাতে আসে, তখন অন্তর্গত রক্তের ভেতরে জন্ম হয় ঈর্ষা–

> স্বামী বলবো না, ইচ্ছে করে। আর কেউ স্বামী নয়,
> আর কেউ স্বামী হতে পারে না তোমার;
> আমি স্বীকার করি না, আমি করবো না,
> যতোই বলো না কেন, 'আমি বিয়ে করেছি আজকে।' (হক, ২০১৬ : ৩১৭)

প্রৌঢ়ের এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যুবতীর দেহ-মনের অদ্বিতীয় অধিকারী তিনিই। এই অধিকারবোধ জাগ্রহ হয়েছে তার 'একনিষ্ট প্রেম'[১] থেকেই। যে অধিকারবোধ পুনরায় যুবতীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্রোধে ঈর্ষান্বিত হয়ে ন্যুড ছবি প্রদর্শনীর ভয় দেখানোর পরক্ষণেই 'মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণীর' মতো নম্র হয়ে তার সাথে যুবতীর যাপিত জীবনের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করেছেন। দেখিয়েছেন তার প্রেম। কিন্তু যুবতী প্রৌঢ়ের চোখের ভাষা, মরমের আশা, ব্যাকুল প্রাণের সাধ, কিংবা পরাণের জ্বালা না-বুঝেই ফিরে যেতে চেয়েছে সদ্যবিবাহিত স্বামীর কাছে। এ কারণেই নাট্যকার নাটকের শুরুতেই সংযোগ করেছেন রবীন্দ্রসংগীত : 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে।' উল্লেখ্য যে, প্রৌঢ়ের কাছে শিল্পের পাঠ নিতে আসা থেকে শুরু করে যুবকের সাথে বিয়ে করা, এমনকি বিয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত– তার সাথে প্রৌঢ়ের যে সকল শারীরির, শৈল্পিক এবং মানসিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে– সবগুলোর মধ্যেই যুবতী সজ্ঞানে প্রেম অনুভব করেছিল, কিন্তু প্রৌঢ় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যুবতীর ন্যুড ছবি সকলের সম্মুখে প্রদর্শনীর ভয় দেখালে যুবতী পূর্বের সমস্ত স্মৃতির মধ্যে প্রৌঢ়ের প্রেম নয়, কাম দেখতে পেয়েছে। অতঃপর তারা যখন তাদের যাপিত জীবনের সমস্ত স্মৃতির মধ্যে 'কাম এবং প্রেম'র দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনই বক্ষ্যমাণ নাটকের যুবক চরিত্রের আগমন। উল্লেখ্য যে, বিয়ের পর কাজি অফিসে যুবতী তার সদ্য বিবাহিত স্বামীকে মার্কেটে সামান্য কিছু কাজের কথা বলে বেরিয়ে পড়লে যুবকের মনে দুটি ধারণার উদয় হয়। ১. সে হয়তো তার জন্য উপহার কিনতে গেছে। ২. সেই চিত্রকরের কাছে গেছে– যে চিত্রকরের প্রতিকৃতি সে দীর্ঘদিন তার গোপন বাক্সে লুকিয়ে রেখেছিল। এই দ্বিতীয় ধারণার বশবর্তী হয়েই সে যুবতীর অন্য কোনো সহপাঠীর কথা না-ভেবে সরাসরি প্রৌঢ়ের বাসায় চলে আসে। কারণ, যুবতীর অঙ্কিত প্রতিকৃতির চিত্রকর ছিল তার শিক্ষক– প্রৌঢ়। স্মর্তব্য, প্রৌঢ়ের আলিঙ্গনে বৃষ্টিভেজা হয়ে হোস্টেলে ফিরে সারারাত রং নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই সম্পূর্ণ প্রেমের থেকে প্রবাহিত রঙে যুবতী প্রৌঢ়ের যে অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছিল, সেই প্রতিকৃতি যুবতী তার গোপন বাক্সে লুকিয়ে রাখত। একদিন যুবককে ঘরে বসিয়ে গোসলখানায় যাওয়ার আগে বাক্সটা খুলে কিছু একটা বার করতে গিয়ে যুবতী যখন হঠাৎ চমকে ওঠে, তখন যুবকের সন্দেহ হয়। যুবতী গোসলে গেলে সে যুবতীর তালা দিতে ভুলে যাওয়া গোপন বাক্সে প্রৌঢ়ের অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখে নিজেই পড়ে গোলক ধাঁধায়। অতঃপর ডালা বন্ধ করে ফিরে এসে বসে চেয়ারে। খেয়াল করে– সেও গোসল সেরে ফিরেই যখন একবার যুবকের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের দিকে তাকায়, তখন তার অন্তর্গত ধাঁধার জট খুলে যায়– জানতে পারে, তার দুঃখের ভেতর যুবতীর সুখের ইতিহাস। (হক, ২০১৬ : ৩৫২) কিন্তু এর পরেও সে যুবতীকে ভালোবেসেছে। কারণ, একজন রিয়ালিস্টিক ছবির চিত্রকর হিসেবে সে যা চোখে দেখেনি, তাকে সে স্বীকার করে না। কিন্তু বিয়ের পরে যুবতীর দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতেই পুনরায় ফিরে আসে সেই অন্তর্গত

গোলক ধাঁধা। ফলে যুবতীর অন্য কোনো সহপাঠীর কথা না-ভেবে সরাসরি চলে আসে প্রৌঢ়ের বাসায়। দেখতে পায় সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে। জানতে পায় তার ন্যুড ছবির কথা। উল্লেখ্য যে, যুবতী তার একান্ত গোপন বাক্সে রক্ষিত প্রতিকৃতির মতো তার ন্যুড হয়ে সিটিং দেওয়ার কথাকেও সযত্নে গোপন করেছে যুবকের কাছে। এমনকি– সে যুবকের সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা প্রৌঢ়কে বলেনি, আবার প্রৌঢ়ের সাথে তার সম্পর্কের কথা যুবককেও বলেনি। দুজনকেই একসাথে ভালোবেসেছে। এই ত্রিভূজ প্রেমের মধ্যে যুবক চরিত্র নিজেকে পরাজিত প্রেমিক হিসেবেই ভেবেছে। কার্যত ব্যক্তিগত প্রেমে পরাজিত হয়েই স্বরণ করেছে দেশপ্রেমের কথা। দেশকে ভালোবেসে সে যুদ্ধ করেছে। সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে শোষণ মুক্তির স্বপ্ন। কিন্তু দেশকে নিয়ে রচিত স্বপ্ন ভগ্ন হয়েছে। তবুও সে তার 'ভগ্নস্তুপ' থেকে 'অবিনাশী পাখি' জেগে ওঠার স্বপ্নে ভালোবেসেছে যুবতীকে। তাকে কল্পনা করেছে স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে : 'তোমাকেই/ মনে হতো বাংলাদেশ; তুমি গর্ভবতী হবে, সন্তান জন্ম দেবে,/ এমন সন্তান যার পথ চেয়ে আছি।' (হক, ২০১৬ : ৩৩৭) কিন্তু তার পথ চাওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ, বিয়ের পরে প্রৌঢ়ের ঘরে এসে সে আবিষ্কার করে তার স্বপ্নসঙ্গীর আসল চেহারা– আবিষ্কার করে যুবতী এবং প্রৌঢ়ের মুখোশ। ফলে যুবতী প্রৌঢ়কে একপাক্ষিকভাবে দায়ী করলে একজন রিয়ালিস্টিক ছবির চিত্রকর হিসেবে, সেটাকে সে সমর্থন করেনি, বরং বলেছে–

> যদি এই ব্যক্তিকেই দিয়েছিলে দেহ
> মনও কি দাওনি। নাকি তুমি ও দু'টি আলাদা করে দেখে থাকো?
> মন আর দেহ– আমি না হয় অবোধ, অজ্ঞান। আমাকে বোঝাও
> প্রেম কি শরীরের বাইরে কিছু? ভিন্ন কিছু?
> প্রেম কি শখের জামা? দেহ প্রতিদিনের পোশাক?
> দেহ যদি খুলে দেয়া যায়, মন কি গোপন থাকে? ঢাকা থাকে রক্তের ভেতরে?
> সমস্ত শরীর খুলে যার কাছে দাঁড়াতে পেরেছো,
> গোপন কি রাখতে পেরেছো মন তার থেকে? (হক, ২০১৬ : ৩৫২)

এটাই তো জীবনের শিল্পিতসত্য– যে সত্যকে প্রস্ফুটিত করেছে রিয়ালিস্টি ছবির সাধক যুবক চরিত্র। ফলে তার লালিত স্বপ্নসঙ্গীকে প্রৌঢ় শিল্পীকে দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে শুধু জানিয়ে গেছে–

> প্রেম যদি প্রতারণা করে তবে শিল্পে দেবে আমাকে আশ্রয়;
> আমার শিল্পের হাত কেড়ে নেয় আছে সাধ্য কার?
> এ নারী আপনার। (হক, ২০১৬ : ৩৫৫)

এভাবেই শিল্পীরা তাদের ব্যক্তিগত দুঃখবোধকে শিল্পের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন এবং তাকে পরিণত করেন শিল্পের গূঢ় শক্তিতে। উল্লেখ্য যে, যুবকের চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দর্শক-পাঠকের মনে আপাতদৃষ্টিকে বিচ্ছেদবেদনা তথা ঋণাত্মকবোধ তৈরি

হলেও, পরক্ষণেই জেগে ওঠে ধনাত্মকধারণা। কার্যত বিচ্ছেদবেদনাকে কত সহজে সৃষ্টির উৎসব হিসেবে দেখা যায়– সে চেতনা নাট্যকার আমাদের দিয়ে গেলেন। ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ-প্রেম আবার ফিরে আসবে অন্যরূপে– শিল্প হয়ে। এহেন ধনাত্মক চোখই তো শিল্পীর জীবন-দর্শন হওয়া উচিত। কেননা, শিল্পীর কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো বিরহ নেই, আছে সৃষ্টিসুখের উল্লাস। কাজেই যুবক শিল্পীর 'রিক্তহস্তে' চলে যাওয়া প্রকৃতঅর্থে পূর্ণতারই ইঙ্গিত।

প্রেম-ভালোবাসা, কাবিননামা সব অস্বীকার করে যুবক চলে যেতে উদ্যত হলে যুবতী চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু যুবক ফেরে না। যুবতী তাকে ধরতে যেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে প্রৌঢ় তাকে ওঠাতে হাত বাড়ায়, কিন্তু সে তার হাত ধরতে নারাজ। কারণ, এখন সে নিজেই নিজেই পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। কার্যত, তার প্রকৃত প্রেম তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার বোধের বয়স বেড়ে যায়। আবিষ্কার করে নিজেকে নতুনভাবে–

> ... একা আমি– একা থাকতে দিন।
> একা। একাকীত্ব। নিঃসঙ্গতা। মানুষ নিঃসংগ–
> সেই সংগহীনতার শীত আমি হাড়ের ভেতরে জানি সকলের মতোই (হক, ২০১৬ : ৩৫৫)

এটাই শিল্পীর প্রকৃত ভুবন। শিল্পের ভুবনে তিনি সম্পূর্ণ একা। নিঃসঙ্গ। তার ওপর দুঃখের দারুণ ভার তাঁকে নিরন্তর রয়ে যেতে হয়। এ দুঃখ জাগে তিনি একা বলে, বিচ্ছিন্ন বলে। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর সময়ের পৃথিবীতে বহু মানুষের ভীড়ে একা জেনেও একটা কিছু আঁকড়ে ধরার আশায় হাত বাড়ান এবং বিফল হয়ে ফিরে আসেন। কার্যত সব শিল্পীই দুঃখী, কিন্তু কোনো শিল্পীই অন্যকোনো শিল্পীর মতো করে দুঃখী নন। অর্থাৎ তিনি যেমন একা বলে দুঃখী, তেমনি দুঃখী হিসেবেও একা। আর এই একাকিত্বকেই তিনি যাপন করেন নিজের মতো করে– তাঁর নিঃসঙ্গ শিল্পভুবনে। যুবতী শিল্পী তার প্রকৃত ভুবন চিনেছে যুবক তথা প্রেমিকে চলে যাওয়ার পর। আসলে তাকে কেউ বুঝতে চায়নি। যুবক বোঝেনি তার প্রেম আবার প্রৌঢ়ও বোঝেনি তার প্রেম। কার্যত দুজনের প্রতি তার প্রেম ছিল দুরকম। যুবককে সে অন্তর থেকেই ভালোবেসেছে, প্রৌঢ়কে ভালোবেসেছে শিল্পের প্রতি প্রেম থেকেই–

> সামান্য এ জীবনের অসামান্য দু'টি অর্জন;
> আমার স্বামীর প্রেমে সংসারের ব্যঞ্জনে লবন [লবণ],
> আপনার প্রতি প্রেমে আমাদের শিল্পের ভূবন [ভুবন]। (হক, ২০১৬ : ৩৬৩)

যুবক কিংবা প্রৌঢ় তার এ প্রেম বোঝেনি। বোঝেনি বলেই নিজেকে সে শিল্পভুবনের শিল্পীদের সংসারে একজন করেই ভেবেছে। যে সংসারে একাকি নিঃসঙ্গ সে। এই একাকিত্বকেই বরণ করে সে যখন প্রৌঢ়কেও ছেড়ে চল যেত উদ্যত হয়, তখন প্রৌঢ়ও আবিষ্কার করেন নিজেকে। উপলব্ধি করেন, যুবতীর সদ্যবিবাহিত স্বামী তার ঈর্ষার ব্যক্তি নয়। তিনি নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। একটা মানুষের দুটো সত্তার পারস্পরিক

ঈর্ষা– যে ঈর্ষার আগুনে তিনি নীল হয়েছেন। এজন্য তিনি যুবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> আমি নিজেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।
> তুমিই তো দেখিয়ে দিয়ছো, আমার ভেতরে আছে একজন নয়, দু'জন–
> একজন– যে মানুষ, আরেকজন স্টুডিওতে।
> একজন যে কাছে টানে, ঘুমোতে যায়–
> আরেকজন যে দূরে দাঁড় করায়, আঁকে।
> সেই দুই এখন দু'য়ের প্রতিদ্বন্দ্বী– মানুষটি শিল্পীর, শিল্পীটি মানুষের। (হক, ২০১৬ : ৩৬৬)

অতঃপর তিনি শিল্পিসত্তা ছেড়ে সম্পূর্ণ মানুষসত্তা দিয়ে যুবতীকে তার জীবনের মানচিত্রে চান। চান সম্পূর্ণ মানবিকসত্তার প্রেমবন্ধনে আগলে রাখতে–

> তুমি কি জানো তোমার ভেতরে যে এখন সে আমি এবং আমার?
> তোমার নগ্নতার ওপর দিয়ে বহে যাচ্ছে যে নিশ্বাস সে আমার এবং আমার?
> তুমি, তুমি, রক্তমাংসে যে তুমি, আমি সেই তোমাকে চাই।
> আমার ক্যনভাস হোক অমর, তোমার নদীতে আমি মরতে চাই। (হক, ২০১৬ : ৩৬৮)

প্রৌঢ় শিল্পীর এ আহ্বানে যুবতী ফিরে আসে। হাত রাখে তার কাঁধে। প্রৌঢ় তার দিকে মুখ তুলে তাকায় এবং ধীরে তার হাতের ওপর হাত রাখে। সমাপ্তি ঘটে মানসিক দ্বন্দ্বের। সমাপ্তি ঘটে নাটকের। এভাবে নাট্যকার এই নাটকে শিল্পীসত্তা এবং মানুষসত্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রক্তমাংসের মানুষেরই জয় দেখিয়েছেন।

৪.

এই আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উপর্যুক্ত দুটি কাব্যনাটকের তিনটি চরিত্রই অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বিত। তবে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ ভিন্নপ্রকৃতির। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* এর মাতবর যেহেতু নেতিবাচক চরিত্র, সেহেতু তীব্রসংকটমুহূর্তে তার 'মানস' তাকে জানিয়ে দেয় সে 'অপরাধী'। ফলে তার মনে তৈরি হয় 'ভয়' এবং 'আশঙ্কা'। যার কারণেই সে তার মনের বদ্ধদরজায় শুকনো নদীতে জোয়ার এবং পাড় ভাঙার শব্দ শুনেই চলে– যে শব্দ সে ছাড়া সতেরো গ্রামের আর কেউ শোনেনি। এই 'শব্দ' মাতবরের অন্তর্গত রক্তের ভেতরের ভয় এবং আশঙ্কার। *ঈর্ষা* এর যুবতী ও প্রৌঢ় চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ দুই রকম। নাট্যকার এ কাব্যনাটকে প্রেম ও দেহ-সংসর্গে স্থাপিত 'সর্বাংশে মানবিক ঈর্ষা'কে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে নির্মাণ করেছেন প্রৌঢ়কে। দেখিছেয়েন একটা মানুষের দুটো সত্তার (শিল্পিসত্তা ও মানুষসত্তা) পারস্পরিক ঈর্ষার রূপ– যেখানে ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রতি ঈর্ষান্বিত, ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। এছাড়া 'প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের ভেতরে একাধিক ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে'– এই দার্শনিক সত্যকে শিল্পিত করতে নির্মাণ করেছেন যুবতীকে। ফলে তাকে একই সাথে চার ব্যক্তিত্বকে ধারণ করতে দেখা গেলেও মূলত প্রৌঢ় এবং যুবকের প্রতি প্রেমসংক্রান্ত দ্বন্দ্বে অধিক দ্বন্দ্বিত হয়েছে সে।

দুজনকে একই সঙ্গে ভালোবেসে নিজেই নিজের ভেতরে রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পরেনি। কার্যত, এভাবে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাটকে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা দ্বন্দ্ব বা সংকটের শিল্পিত রূপায়ণের মাধ্যমে টি. এস. এলিয়ট প্রদর্শিত কাব্যনাটকের 'another kind of drama' বৈশিষ্ট্যের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

টীকা

১. এই আধুনিক নাট্যপ্রকরণ নিয়ে যারা নাটক রচনা করতে চান, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে টি. এস. এলিয়ট বলেন : 'So the poet with ambitions of the theatre, must discover the laws, both of another kind of verse and of another kind of drama.' [Eliot, 1944 : 9]

২. এমন ভাষার সার্থক ব্যবহার করেছেন টি. এস. এলিয়ট তাঁর *Murder in the Cathedral* (১৯৩৫) কাব্যনাটকে। একটি দৃষ্টান্ত :

Chorus
Ill the wind, ill the time, uncertain the profit, certain the danger.
O late late late, late is the time, late too late, and rotten the year;
Evil the wind, and bitter the sea, and grey the sky, grey grey grey.
O Thomas, return, Archbishop; return, return to France.
Return. Quickly. Quitly. Leave us to perish in Quiet.
You come with applause, you come with rejoicing, but you come bringing death into Canterbury:
A doom on the house, a doom on yourself, a doom on the world. [Eliot, 1935 : 18]

৩. সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাট্য ভাবনানুসারী। এ-বিষয়ে তিনি বলেন, 'একদা কলম হাতে নিয়েছিলাম কবিতা লিখব বলে, সেই কলম অচিরে গল্প খুঁজে পেয়েছে, উপন্যাসও অধরা থাকেনি, নাটক এ হাতে হবে এমন আশা আর করিনি– শেষপর্যন্ত নাটকও এলো, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় প্রাণিত হয়ে, বাংলাদেশের সমূহ বর্তমানকে ভাষা-মাধ্যমে আরো একটি স্তরে প্রকাশ করবার দরোজা দেখে, এবং এলো সে কবিতার হাত ধরে, কবিতা, কারণ, অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এই বর্তমানে, বাংলাভাষায়, খণ্ড কবিতার সব সম্ভাবনা আপাতত আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এখন একে কিছুদিনের জন্যে পাশে রেখে অন্যদিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন– হতে পারে মহাকাব্য, কথাকাব্য কিম্বা কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যই শেষ পর্যন্ত আমার করোটিতে জয়ী হয়; টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাট্যভাবনা আমাকে ক্রয় করে।' (হক, ২০১৬ : 'ভূমিকা')

৪. 'when the work of darkness is perfect, then the <u>world of darkness</u> passes away like a pageantry in the clouds: the knocking at the gate is heard; and it makes known audibly that the reaction has commenced: the human has made its reflux upon the fiendish: the pulses of life are beginning to beat again: and the re-establishment of the goings-on of the world in which we live, first makes us profoundly sensible of the awful parenthesis that had suspended them.' (Quincey, 2006 : 6-7)

৫. মোস্তফা তারিকুল আহসান তাঁর *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম* গবেষণাগ্রন্থে প্রৌঢ় শিল্পীকে নারীলোলুপ, দেহলোভী এবং দুশ্চরিত্র শিক্ষক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। যুবতীর প্রতি তার

প্রেমকে দেখেছেন স্রেফ দেহজ কামজ প্রেম। (আহসান, ২০০৮ : ২৫২-২৬৯) অনুপম হাসান তাঁর *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ* গবেষণাগ্রন্থে মোস্তফা তারিকুল আহসানের মতোই প্রৌঢ়কে নারীলোলুপ, দুশ্চরিত্রবান শিক্ষক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। (হাসান, ২০১০ : ১৮৬-২০৩) কার্যত, তাঁরা প্রৌঢ়ের অন্তর্গত গভীর-গোপন প্রেমকে অন্বেষণ করেননি, বরং *ঈর্ষা* কাব্যনাটকের কাহিনিকে খণ্ডাংশে উপস্থাপন করে একপাক্ষিকভাবে যুবতী কিংবা যুবকের দৃষ্টিতে প্রৌঢ় শিল্পীকে দেখেছেন।

৬. যুবতীর প্রতি প্রৌঢ়ের ছিল একনিষ্ঠ প্রেম। তিনি কখনো যুবতীর সাথে ছলনা করেননি। কার্যত, এই নাটকে 'ছলনা' বলে যদি কোনো শব্দের কথা ভাবা হয়, তবে সে ছলনা যুবতীই করেছে। সে ছলনা করেছে প্রৌঢ় এবং যুবক– উভয়ের সাথেই। কারণ, সে কখনো যুবকে জানায়নি প্রৌঢ়ের প্রতি প্রেমের কথা, আবার প্রৌঢ়কেও জানায়নি যুবকের প্রতি প্রেমের কথা। একই সাথে দুজনকেই ভালোবেসে নিজের ভেতরেই রক্তাক্ত হয়েছে, জন্তুর মতো কুঁকড়ে মরেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাউকেই জানাতে পরেনি। পারেনি যুবক কিংবা প্রৌঢ় কাউকেই ভালো না-বেসে থাকতে। ফলে যুবক শিল্পীর সঙ্গে স্কেচপ্যাড নিয়ে সারাদিন মাঠঘাট চষে বেলাশেষে তাড়াতাড়ি হোস্টেলে ফেরার নামে প্রৌঢ় শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করেছে। ন্যুড হয়ে সারারাত সিটিং দিয়েছে, লিপ্ত হয়েছে দেহ-সংসর্গে। বস্তুত যুবতীর এই ছলনা মহৎ অর্থে কোনো ছলনা নয়। কারণ, নিজেকে সে ভেবেছে 'শিল্পের সংসার'-এর একজন হিসেবে– 'ব্যক্তিগত প্রেম যদি এক পাত্রে ধরে রাখা যায় নিঃশেষ./ অনিঃশেষ শিল্পের প্রেম বহু পাত্র পূর্ণ করেও।' (হক, ২০১৬ : ৩৬১) এই 'অনিঃশেষ শিল্পের প্রেম'কে বুকের মধ্যে আগলে রেখে একই সঙ্গে 'বহু পাত্র পূর্ণ' করেছে। পূর্ণ করেছে শিল্পের প্রয়োজনেই।

সহায়ক গ্রন্থ

আহসান, মোস্তফা তারিকুল (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮)। *সোনার তরী*। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

হক, সৈয়দ শামসুল (২০১৬)। *কাব্যনাট্য সমগ্র*। ঢাকা : চারুলিপি।

হাসান, অনুপম (২০১০)। *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

Eliot, T. S. (1935). *Murder in the Cathedral*. New York : Harcourt, Brace and Company.

Shakespeare, William (1905). *Shakespeare : Complete Works*. W. J. Craig (ed). New York : Oxford University Press.

সহায়ক প্রবন্ধ

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭৬)। 'জামাতে ইসলামীর উদ্যোগ'। *যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ*। ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স।

মুরশিদ, গোলাম (১৯৭৩)। 'ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ'। *ধর্ম নিরপেক্ষতা*। আলী আনোয়ার সম্পা.। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

Eliot, T. S. (1921). 'The Possibility of Poetic Drama'. *The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism*. New York: Alfred A. Knopf.

——— (1944). 'Introduction'. *Shakespeare and The Popular Dramatic Tradition*. Written by S. T. Bethell. Westminster, London: P. S. King and Staples Limited.

Quincey, Thomas De (2006). 'On the Knocking at the Gate in Macbeth'. *On Murder*. Robert Morrison (ed.). New York : Oxford University Press.

• শতবার্ষিক-স্মরণ •

সুকুমার রায়ের মৃত্যুশতবর্ষ (২০২৩)
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মশতবর্ষ (২০২২)
আবুল হোসেনের জন্মশতবর্ষ (২০২২)

মৃত্যুশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি
(১৮৮৭-১৯২৩)

সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* : জীবন ও বাস্তবতার প্রতীতি

শেখ রজিকুল ইসলাম*

উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের শেষ সার্থক প্রতিনিধি সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। স্বাবলম্বী প্রেরণায় সাহিত্য ও অংকনকে নতুন চেতনাবাহী শরণ-প্রতিভায় যুগ-পরিধির দর্পণে তুলনামূলক মহিমার আধারে স্থাপন করেছেন। তিনি ইতিহাসের জীর্ণ-পুরনো ধারাবাহিকতাকে পাশ কাটিয়ে সামাজিক চলিষ্ণুতা, সময়ের বর্ধিত গতি এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তনের নিরিখে বিষয়, বিষয়ী এবং এই দুইয়ের সম্পর্ককে অনবরত যাচাই করেছেন। বর্তমানের নতুনত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে তিনি ভেঙেছেন ভাষার স্থিতিস্থাপকতাকে, শিল্পের যথাযথ প্রতিমানকে– প্রত্যাখ্যান করেছেন যথাপ্রাপ্ত সাহিত্য-শিল্পের প্রচলিত চেনা আদলকে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক দশক ধরে 'আধুনিকতা'র একটা স্থিরীকৃতমানদণ্ড সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও গরিষ্ঠজনস্বীকৃত হয়েছে। মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে রেনেসাঁস রিফর্মেশন পর্বের মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সামন্ততন্ত্রের স্থবিরতা কাটিয়ে উনিশ শতকে উপনিবেশিত শক্তির প্রবর্তনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনভাবনায় যুগান্তরের বার্তা নিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে। (তপোধীর ভট্টাচার্য, ১৯৯৫ : ০৫) বাঙালির সমাজ জীবনের বিপুল পালাবদলের তরঙ্গাভিঘাতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সেক্যুলারিজম প্রভৃতি চিন্তাধারার সার্বিক নির্ভরতায় মানবকেন্দ্রিক আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। নতুন কালের প্রবর্তনায় মানবিক মূল্যমান, শ্রেয়োচেতনা, ঔচিত্য-সৌহার্দ্যবোধ, সামাজিক মান্যতা, সাংস্কৃতিক প্রতিশ্রুতি অনবরত

---

*অধ্যাপক, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

নান্দনিক তাৎপর্যে, অতৃপ্তি ও বিকল্প পথ-অনুসন্ধানের নিরঙ্কুশ সম্ভাবনায় প্রবাহিত হয়েছে। বিশ্ব-পরিক্রমায় নানা প্রতিভাষিক উপার্জনকে সংহত করে, উপনিবেশিত প্রতিস্পর্ধী বাস্তবতার পোষকতা না করে বরং ঐতিহ্যের চিরায়ত অনুপুঙ্খকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করে।

সময়, সমাজ ও জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞাত-অভিজ্ঞানের সম্পর্কসূত্রেই সমকালে শিল্পী-সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুশীলনবীক্ষায় বাংলা সাহিত্য শিল্পকে নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের তাৎপর্যে সমান্তরালভাবে ভিন্ন আখ্যানবৃত্তের সন্ধানে সাহিত্যভাবনায় নতুনের প্রতিভাসকে প্রতিষ্ঠা দিতে যত্নবান হয়েছেন। এই সূত্রে উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য-ভাবনার আনুগত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের লোকায়ত আদর্শ ও জীবনলব্ধ অনুপুঙ্খের বিবরণে আধুনিক বাংলা 'শিশুসাহিত্যের'[১] জন্মসূচনা। বাংলা শিশুসাহিত্যের সাধনায় সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও আদিপর্বে বাংলা শিশুসাহিত্যের অনিকেতপ্রায় আধুনিক ধারাকে ভগীরথের ধারার মতো নিয়ন্ত্রণ করেছে এ সময়ের সাময়িকপত্রের বৈদগ্ধ্যের পরিশীলন। কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *বালকবন্ধু* (১৮৭৮), প্রমদাচরণ সেনের *সখা* (১৮৯৯), জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর *বালক* (১৮৮৫), সতীশচন্দ্র সেনের *সাথী* (১৮৯০), শিবনাথ শাস্ত্রীর *মুকুল* (১৮৯৫), বরদাকান্ত মজুমদারের *শিশু* (১৯১৩), উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর *সন্দেশ* (১৯১৩) এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রীর *তোষিণী* (১৯১০) প্রভৃতি শিশু মনস্তত্ত্বের আনন্দ বিনোদন আর শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ভূমিকা অর্জন করে। (আতোয়ার রহমান, ১৯৯৮ : ৩৪)। শিশু জগতকে আনন্দময় ও কল্পনাময় করে তুলতে ১৮৯১ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *হাসি ও খেলা* প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম ননসেন্স রাইমের যাত্রা শুরু হয়। (শোভন সোম ২০১২ : ৯৪) ১৯৯৩ সালে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) *কঙ্কাবতী*র প্রকাশে এক ফ্যান্টাসির জগৎ কল্পনায় বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের আস্বাদ ছড়িয়ে পড়ে। হাস্যকৌতুক, উদ্ভট আচরণ এবং অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় গ্রন্থটির আখ্যানভাগ হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়, মনোমুগ্ধকর। ত্রৈলোক্যনাথের লেখা দারুণভাবে আলোড়িত করে কিশোর সুকুমার রায়কে। ত্রৈলোক্যনাথের তৈরি এক অবিশ্বাস্য পৃথিবী, রূপকথার মায়াময় জগৎ এবং তার সঙ্গে সমাজের কিছু অসঙ্গতি, দৃশ্যমান দোষ-ত্রুটি– সব মিলে কৌতুক-হাস্যরসের মধ্য দিয়ে গল্পের খাসবুনটের রুদ্ধশ্বাসগতি সুকুমার রায়কে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুকুমার রায় কিশোর বয়স থেকেই জ্ঞানচর্চার নানা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করার পাঁচ বছর পরে ১৯১১ সালে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে গমন করেন। ইংল্যান্ডের রয়্যাল ফটোগ্রাফি সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য তিনি

ইংল্যান্ডে বসবাসকালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফটোগ্রাফি আর মুদ্রণ বিষয়ক বেশকিছু তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (আলী ইমাম, ২০১০ : ৬০)। এই সময়ে তাঁর মনোজগতকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল এডওয়ার্ড লিয়র (১৮১২-১৮৮৮) আর লুইস ক্যারলের (১৮৩২-৯৮) লেখা। এঁরা দুজন ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ননসেন্স ভার্সের মায়াবী পৃথিবীর রূপকার। লিয়রের *Book of Nonsense* (1846)-র অদ্ভুতুড়ে জগৎ আর অসঙ্গতির অবাধ কল্পনার বিস্তার এবং অন্যদিকে ক্যারলের *Alice's Adventures in Wonderland* (1865) ও *Alice Through The Looking Glass* (1871) গ্রন্থদুটিতে রূপকথার আঙ্গিকে অদ্ভুত, উদ্ভট ও শিহরণমূলক এক ফ্যান্টাসির জগৎ সুকুমারের অবাধ কল্পনাশক্তিকে সম্প্রসারিত করে–

> ক্যারলের মতো তিনিও ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী; লিয়রের মতো একাধারে চিত্রী ও লেখক; ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্বে সন্ধানী ছিলেন, আর উভয়ের মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ দুয়ের মিলন ঘটলে তবেই সত্যিকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়ত ও-বস্তু আক্ষরিক অর্থেই 'ননসেন্স' হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সুকুমার রায় তাঁর উত্তমর্ণের–সমকক্ষ বললে ভুল হবে–কেননা তাঁর ব্যাঙ্গের দিকেও ঝোঁক ছিল–কিন্ত সমীপবর্তী। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ২৬)

উভয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। ক্যারলের 'যুক্তিচালিত বিস্ময়লোক' এবং লিয়রের 'লিমেরিকগুচ্ছে ব্যক্তিত্ববাদের পরাকাষ্ঠা' বা সমকালে ইউরোপে যন্ত্রযুগের ঘোষণায় 'সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করে দাও'– সমাজের সেই স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ক্যারল-লিয়রের মতো সুকুমারকেও ব্যঙ্গধর্মী সাহিত্য রচনায় দারুণভাবে উৎসাহিত করে।

উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের উজ্জ্বল অধ্যায়ে শিশুসাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধির বৈদগ্ধ্য নিয়ে বাংলাসাহিত্যে সুকুমার রায়ের আগমন বিস্ময়কর।[২] বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, কল্পনার মনোহারিত্বে এবং ভাষার পারিপাট্যে তাঁর রচনা বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে তুঙ্গমৌলি শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাত্র ৩৬ বছর জীবৎকালে তিনি ১২৯টি কবিতা, প্রায় ৯০টি ছোটগল্প, ২টি বড়গল্প, ১৪০টির বেশি প্রবন্ধ এবং ৮টি নাটক লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে *আবোল তাবোল* (১৯২৩), *খাই খাই* (১৯৫০), *অতীতের ছবি* (১৯২২), *হ য ব র ল* (১৯২৪), *পাগলা দাশু* (১৯৪০), *বহুরূপী* (১৯৪৪) প্রভৃতি। এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে শিশুসাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছেন তেমনি শিশুমনকে কেবল ভঙ্গি দিয়ে না ভুলিয়ে শিশুচিত্তের অনুকূল সাহিত্যসৃজনে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর নিজস্ব সুর-তাল-লয়-ছন্দ আর রসের নিরন্তর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রতিটি ছড়া, কবিতা, গল্প যেন হয়ে উঠেছে সেই সোনার জীয়নকাঠি যার ছোঁয়ায় সকল কথা কৌতুক হয়ে যায়, সকল গল্প হয়ে ওঠে মজার স্ফূর্তির, কীর্তিময় এক আনন্দ যান। 'অসম্ভবের পাথার পেরুই রূপকথার/পথ ভুলে যাই দূর পারের সেই চুপকথার' *গীতবাণীতে* রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মনোরাজ্যে ছেলে ভুলানো

যে অসম্ভবের কথা বলেছেন তা কেবল রূপকথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, শিশুসাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই ছড়িয়ে রয়েছে খেয়ালখুশির এক স্বপ্নের মায়াবী জগৎ। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে 'ননসেন্স ক্লাবের' মতো সৃষ্টিছাড়া বৈঠকের কল্পনা যাঁর মাথায় আসে সেইসব কল্পনাকে রূপ দিতে সেই বয়সেই 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল'-এর মতো কৌতুক নাটক যিনি লিখতে পারেন তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিতে কল্পনার দৌড় কতটা বিস্তৃত তা সহজেই অনুমেয়। সুকুমার রায়ের ছড়া, গদ্য, নাটক– সকল ধরনের রচনাতেই চিন্তাশক্তির চেয়ে কল্পনাপ্রতিভার দৌরাত্ম্য অধিকতর বলেই শিশুসাহিত্য-শিল্পী হিসেবে তিনি অনেক বেশি স্বৌজঃ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তবে তাঁর ছড়াগ্রন্থ *আবোল তাবোল*-এ শিশু মনোরাজ্যের এসব বিস্ময়ের কীতির্তে নির্মিত হয়েছে অদ্ভুত, উদ্ভট ও শিহরণমূলক এক পৃথিবী।

***আবোল তাবোল* : অসম্ভবের পাথার পেরুই... দূর পারের সেই চুপকথার**

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় *সন্দেশ* প্রকাশিত হলে শুরু থেকেই বিভিন্ন লেখা ও ছবি প্রকাশের মধ্য দিয়ে সুকুমার রায়ের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে *সন্দেশে*-এর ভার তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হবার পর থেকেই শিশুসাহিত্য সৃজনে তাঁর কীর্তি দিনে দিনে মুখর হয়ে ওঠে। শুধু ছড়া, গল্প, কবিতা নয়, নানান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, সারাবিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ-বিদেশের উপকথা, স্বরচিত ধাঁ-ধাঁ, হেয়ালি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়-সম্ভারে *সন্দেশ*-এর পাতা ভরে ওঠে। (সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু ২০০৯ : ভূমিকাংশ)। তবে তাঁর সৃষ্টি-সম্ভার বিচিত্র হলেও ছড়া রচনার মধ্য দিয়েই তিনি শিশুদের মনোরাজ্য অনায়াসে অধিকার করেছেন। *অতীতের ছবি* (১৯২২) প্রকাশের পর রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক প্রভাব কাটিয়ে সহসাই তিনি শিশুসাহিত্যের মূলস্রোতে প্রবেশ করেন। অবাস্তব ও অসম্ভবের আদলে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের প্রচ্ছন্ন অভিনিবেশ-ঐক্যে ইংরেজি ননসেন্স ভার্সের অনুকল্পে বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি হয় আবোল তাবোল[১] সাহিত্যধারা– এই প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি *আবোল তাবোল* (১৯২৩)। *আবোল তাবোল*-এর শব্দের দ্যোতনা বা ছন্দের দোলা শৈশবকালে কবি শামসুর রাহমানকে কতটা মোহাচ্ছন্ন করেছিল সেই অনুভবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ–

> সুকুমার রায় আমার মনোজগতে একটি এলাকা দখল করে ফেলেছেন। ভুলতে পারব না *আবোল তাবোল* প্রথম পাঠের অভিজ্ঞতার কথা। শব্দের দ্যোতনা, ছন্দের দোলা, মিলের চমক সর্বোপরি কল্পনার ঝলকে অবিভূত হয়ে পড়েছিলাম। 'বকচ্ছপ', 'হাসজারু' ইত্যাদি নতুন শব্দের দেখা পেয়ে চমৎকৃত হলাম। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ ও কৌতুক, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল প্রকাশ মন কেড়ে নেয় শুধু শিশুদের নয়, বয়স্ক পাঠকদেরও। যে শিশুসাহিত্য যুগপৎ ছোটদের ও বড়দের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে, সেটা সার্থক। (শামসুর রাহমান ২০১৩ : ৮৩-৮৪)

আবোল তাবোল-এর ছড়াগুলোতে উদ্ভট (অ্যাবসার্ড) ও আপাত অর্থহীনতার (ননসেন্স) মধ্য দিয়ে রসসৃষ্টির কৃতিত্বে সুকুমারের জুড়ি নেই। এর অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি ছড়ার মধ্যে

বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা এত বেশি যে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে তাদের আবদ্ধ করা যায় না। বিচিত্র সব ছড়ায় সম্ভব-অসম্ভবের উৎসে, শব্দের কারুকাজে ও মনোহারিত্বে এবং ছন্দের দোলায় তিনি শিশুদের মন ভোলানোর খেলায় মেতে উঠেছেন। আবার তাঁর কল্পনা-প্রতিভার স্বচ্ছল-স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রবহমান বাস্তবের বাইরে কল্পনার জগতকে রূপ দিতে দক্ষ কারিগরের মতো অপূর্ব সব ছবির সমাহারে সমৃদ্ধ করেছেন ছড়াগুলো। লিয়রের ছড়ার সঙ্গে জেনি থর্নের অংকনকৃত ছবির মতো বা রবীন্দ্রনাথের *সে* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মতো *আবোল তাবোল*-এর সঙ্গে স্বভাবে, গুণপনায় সমানে পাল্লা দিয়েছে অনবদ্য ছড়াগুলো। 'লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে। কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে।'[৮] সৃষ্টির এই দ্বৈতসত্তা তাঁকে একত্বে আর অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্যে আর বর্ণময়তায়, তুলনাহীন এক ঈর্ষণীয় গৌরবের অধিকারী করেছে। তাঁর সৃষ্ট কল্পনাময়-রহস্যময় জগৎ নির্মাণ-কৌশলে তিনটি দক্ষতা অনুধাবন করা যায়–

১. অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, যা মূল বিষয়কে ও তার পরিপার্শ্বকে খুঁটিনাটিসমেত ধরে রেখেছে।
২. শিল্পীর রসিকতাবোধ।
৩. অসম্ভবের উদ্ভাবন। (কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী ২০২০ : ৬৯)

শিশুদের মন আর কল্পনাকে নিয়ে বাস্তবের বাইরে এক স্বপ্নময় জগৎ নির্মাণে এমন সুদূরপ্রসারী চিন্তা আর কেউ করেননি। বিচিত্র রহস্যময় জগতের আদিসন্ধির অনুরণন আর অনুধাবনের প্রয়াসে শব্দ ও দৃশ্যকল্প এমনভাবে মিলেছে যা অভিনবত্বে উজ্জ্বল। সমালোচকের ব্যাখ্যায়–

> যে অমলিন হাস্যরস, নির্মল কৌতুক, উদ্ভটত্ব, অভিনব-আনকোরা শব্দের বাহারি লীলা আর ধ্বনির চঞ্চল মাধুর্য *আবোল তাবোল*-এর প্রাণ...বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে, রূপরঙ্গে ও ভাবরঙ্গে ধ্বনি তরঙ্গের ঝরণাধারার সঙ্গে সেখানে আজগুবি চালের নির্মল কৌতুক উজ্জ্বল দীপন একাকার হয়ে গেছে।... সেখানে রয়েছে এক মজার পৃথিবী, বিদ্রূপহীন এক মায়াবীভুবন। (কল্যাণ মণ্ডল ২০২০ : ১২৩)

ভাবনার অভিনবত্বে আর কল্পনার চমৎকারিত্বে অবাস্তব ও অসম্ভবের জগৎ নির্মাণের দক্ষতায় সুকুমার রায়ের জুড়ি নেই। লীলা মজুমদার আশ্বস্ত করেছেন, 'সুকুমার নিজে কখনও এমন একটি পদও রচনা করনেনি, যার মধ্যে অর্থ এবং রস দুই-ই নেই। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি আচড় অর্থ এবং রসে টইটুম্বুর।' (কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী ২০০০ : ৬৬-৬৭)। অর্থাৎ সুকুমার রায় সেই 'সৎ সাহিত্যিক' যিনি তাঁর শিশু পাঠককে শুধু ভঙ্গি দিয়ে না ভুলিয়ে বাঁধাধরা বাস্তবের বাইরে নতুন এক কল্পনার পৃথিবী নির্মাণে শিশুচিত্তের অনুকূল সাহিত্যসৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে শিশুদের মনোরঞ্জনার্থে রচিত এই সাহিত্যধারা মূলধারার সাহিত্যকর্ম থেকে স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, বড়রাও এর সমান আনন্দের অংশীদার।[৫] তাই উদ্ভট এবং অর্থহীনতার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও বয়স্ক পাঠকের

সঙ্গে এই গ্রন্থের সংযোগসেতু বিচ্ছিন্ন হয় না। এই গ্রন্থপাঠের আনন্দ ছোটদের সঙ্গে বড়দেরও প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবী থেকে ছুটি নিয়ে ভিন্নতর ভাব ও আবহে পৌঁছে দিতে চায়। *আবোল তাবোল*-এর ভূমিকায় সুকুমার রায় নিজে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা 'কৈফিয়ত'-এ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়া এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই। সুতরাং এ রস যাঁহারা উপভোগ করতে পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।' (সুকুমার রায় ১৯৮৩ : ৪২০) *আবোল তাবোল*-এর ছড়াগুলোতে উদ্ভট খেয়ালরসের বাইরে অর্থপূর্ণ গূঢ়ত্ব বেশি কিছু আছে– আছে জীবনযাপনের এবং সামাজিক বাস্তবতার নানা অর্থের দ্যোতনা, সমকালীন প্রতিবিম্বন। আমাদের পরিচিত পরিপার্শ্ব থেকে পরিণত পাঠককে চিন্তা ও কল্পনার ব্যাকরণ থেকে অন্তর্নিহিত সত্য ও তথ্য অনুধাবনে আগ্রহী হতে প্রসঙ্গটিকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন *আবোল তাবোল*-এর শেষ কবিতায়–

আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে–
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হাতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে। (সুকুমার রায় ২০০৭ : ৩৭)

কিন্তু খেয়াল রস শুধু নয়, একটু খেয়াল করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রচলিত নীতি ও সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে বালকের ছদ্মবেশে সাবালকত্ব দেখিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় ছড়া 'খিচুড়ি' থেকেই সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স ভার্স'-এ উদ্ভট জন্তু-জানোয়ারের কল্পনায় পাঠককে একেবারে এক অভিনব জগতে হাজির করেছেন। ছড়াটিতে লিয়রের প্রভাব থাকলেও তা সর্বাংশে নয়। লিয়র যথেচ্ছ ধ্বনি-তরঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের অদ্ভুত ও উদ্ভট নামে চিহ্নিত করেছেন। সুকুমার সেখানে ব্যাকরণের মিশ্রীতি অনুসরণে নামকরণ করেছেন (হাসজারু=হাস+সজারু)।[৬] বিলেতে থাকাকালীন এডওয়ার্ড লিয়রের প্রাণীবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যা বইয়ের অঙ্কিত ছবিগুলোর কল্পিত উদ্ভট ধরন সুকুমারকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। তবে 'খিচুড়ি'র জীবগুলো নিঃসন্দেহে সুকুমারের অনবদ্য আবিষ্কারের অভিনব সব শব্দের ক্রীড়া-নৈপুণ্য। অন্যদিকে এইচ. জি. ওয়েলসের ক্ষ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেরো বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহ কেটে-কুটে একের লেজ অন্যের মুণ্ডুর সঙ্গে জোড়া দিয়ে উদ্ভট আকারের জীবজন্তু তৈরির ব্যর্থ চেষ্টাকে সুকুমার শুধু শব্দের তোরঙ্গেই নয় ছবির জোড়কলমেও বিচিত্র ও উদ্ভট জীবজন্তু তৈরি করেছেন।[৭] এমনকি লুইস ক্যারলের sanake আর shark এর মিশ্রণে snark-এর চেয়েও একধাপ এগিয়ে সুকুমার খাদ্য ও খাদককে জুড়ে দিতে অস্বস্তিবোধ করেননি (সিংহের শিং নেই এই তার কষ্ট/ হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট)। বিজ্ঞানের নিয়মকে অস্বীকার করে আর যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনার বিপর্যয় সৃষ্টি করেই গড়ে উঠেছে

আবোল তাবোল-এর 'খিচুড়ি'র জগৎ। 'খিচুড়ি'তে ভুলের পৃথিবীর প্রসঙ্গ টেনে 'হাসজারু', 'বকচ্ছপ', 'হাতিমি' প্রভৃতি প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়ে প্রত্যাশিত নিয়মের ছক ভেঙে উদ্ভট আবরণে এদের আগমন ঘটেছে। এই সমস্ত প্রাণী শুধু কল্পলোকেরই বাসিন্দা নয়, এদের জীবন, এদের উপস্থিতি এবং নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের চারপাশের অসঙ্গত জীবন ও সামাজিক ভ্রষ্টাচার, কেতাদুরস্ততা ও কৃত্রিমতা উপস্থাপিত হয়েছে।

খেয়ালরস কল্প-খেয়ালের নয়, সমাজ খেয়াল থেকেই এর জন্ম। এর আজগুবিতে বাস্তবকে ওলটপালট করে দেখবার একটা সচেতন প্রয়াস আছে, নিরর্থকতার মধ্যেও একটা সমাজচেতনার অর্থ আছে। হোক না উদ্ভট, আষাঢ়ে– খেয়ালিতারও একটা পা ছড়িয়ে আছে সমাজের শক্ত জমিনের ওপর। সোজাসুজি না হলেও একটু ঘুরিয়ে বা তির্যকভাবে দেখিয়ে দেয় সমাজের অসঙ্গতিগুলো। উপনিবেশিত সমাজে ইংরেজ-সাহয্যপুষ্ট অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল এক নতুন শ্রেণির উত্থান ঘটেছে এই সময়ে। নিজস্বতা হারিয়ে উর্দি বা জ্যাকেটপরা এই শ্রেণির সর্বগ্রাসী দাপটকে কটাক্ষ করেছেন সুকুমার। দেশি-বিলেতি স্বারূপ্যের সংকটে কিম্ভূতের অস্তিত্বে অনর্থের মধ্যেও অর্থময়তা জেগে ওঠে। তুলনা করা যায় পঞ্চাশের দশকের হিন্দি সিনেমা-জগতে আবির্ভূত এক ভবঘুরে চরিত্রের, যে হৈ-হৈ করে বিচিত্র পোশাকে অদ্ভুত সাজে গান গেয়ে মাৎ করেছিল। যার জুতো জাপানি, পাৎলুন ইংলিশস্তানি, লাল টুপি রুশী আর দিলখুস হিন্দুস্তানি। এ রকম জীবকে আন্তর্জাতিক বাজারের কল্যাণে যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়। সুকুমার বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে মানুষে-মানুষে যে দ্বৈতবোধের দেয়াল তৈরি হয়েছে সেটা আজ অনিয়মের-অর্থহীনতার। তিনি চেতনা ফেরাতে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ছড়ায়–

> হাঁস ছিল, সজারু (ব্যাকরণ মানি না),
> হয়ে গেল 'হাসজারু' কেমনে তা জানি না
> বক কহে কচ্ছপে- বাহবা কি ফুর্তি
> অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ' মূর্তি। ...
> ছাগলের পেটে ছিল না জানি না কি ফন্দি
> চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি। (২০০৭ : ০২)

ইংরেজপুষ্ট নব্যবণিক এই শ্রেণি মাত্রাহীন আড়ম্বরে তারল্য-ব্যয়বহুল বিলাসিতায় এবং লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন প্রলুব্ধে একে অন্যকে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেছিল। স্বজাতি, সমাজ ও দেশের মঙ্গলের চিন্তা না করেই আরো পাওয়ার আক্ষেপই বড়ো হয়ে উঠেছে তাদের চিন্তা-চেতনায় : 'এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না-/ কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।' (২০০৭ : ১৩)। সুকুমারের প্রতিভার বহুমাত্রিক এই সৃজনক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ্য গতি তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে।

তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১৩ : ভূমিকাংশ)। মন্তব্যের 'অভাবনীয় অসংলগ্নতা', 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি' এবং 'বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে' শব্দগুলোর প্রয়োগের তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্ববহ বলেই তাঁর সাহিত্যের মৌলিকতা তাঁকে সফলতা এনে দিয়েছে।

সুকুমার রায়, 'কাঠবুড়ো', 'গোফচুরি', 'লড়াই-ক্ষ্যাপা', 'ছায়াবাজি' ছড়াগুলোতে উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি এবং অভিনব কল্পনায় সমাজদৃষ্টিকে অন্তর্মূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সমাজেরই অনর্থ আর অসঙ্গতির উল্টো খেয়ালের ফূর্তিভরা শক্ত জমিনে। বিচিত্র স্বভাব আর খ্যাপাটে বাতিকগ্রস্ত মানুষের নানা বাতিকে ভরা কৌতুকময় কর্মকাণ্ডে ভরপুর সমাজের অলিগলি। উদ্ভট-অসম্ভবের অফুরন্ত কৌতুকের আবরণে পরিচিত বিশ্বের 'গ্রাউন্ড রুল'-এ বিপরীত উপাদানের সমাহারে সকলেই পাগলামো পৃথিবীর বাসিন্দা। কখনও তাদের কাজকর্মে হেয়ালি থাকে, কখনও উপস্থিত বুদ্ধিতে বা উদ্ভাবনী চিন্তার নৈপুণ্যে তিক্ত কথার প্যাঁচে পরিস্থিতির জট পাকিয়ে তোলে, উপহাস-পরিহাসে ফন্দি-ফিকিরে রহস্যময়তা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। যেমন–

১. হাড়ি নিয়ে দাঁড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ
মাথা নেড়ে গান করে গুণ গুণ সংগীত
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত। (২০০৭ : ২)

২. ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি–
বাবু হাকেন, 'ওরে আমার গোফ গিয়েছে চুরি।' (২০০৭ : ৩)

৩. চেচিয়ে বলে, 'ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তাই পড়ে?'
সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।...
এলোপাথাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুসধাপুস কত!
চক্ষুবুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মতো। (২০০৭ : ৯)

৪. ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি। (২০০৭ : ১০)

'ছায়াবাজি' ছড়ায়– 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যাথা' পংক্তিতে, 'লড়াই ক্ষ্যাপা'য় পাগলা জগাইয়ের সর্বত্র শত্রু দেখার পাগলামিতে, 'হাতুড়ে'তে ডাক্তারের চিকিৎসাবিদ্যার কেরামতিতে, 'বুঝিয়ে বলা'র দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তে আপাত হাস্যরস সৃষ্টির পরিবেশ প্রধান হয়ে উঠলেও রূপকার্থে এরা সবাই মনুষ্য আচরণবিধির অসঙ্গতি ও অতিরেকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। বায়ুরোগগ্রস্ত অদ্ভুত এই মানুষদের আড়ালে আমাদের চারপাশে পরিচিত কিছু মুখ উঁকি মারে, গম্ভীর চালের চিন্তাচ্ছন্ন ভারিক্কি মেজাজের কিম্ভূত আকৃতির এমন সব মুখ, বাস্তবে যাদের আচার-আচরণ আদৌ হাসির উদ্রেক করে না। লোকগুলো আগাগোড়া কল্পজীব নয়,

আমাদের পারিপার্শ্ব থেকেই উদ্ভূত তারা। এদের পাশেই তাই স্থান দিতে হয় ছায়াধারার ব্যবসাদায়কে ('ছায়াবজি'), ফুটোস্কোপের আবিষ্কারকর্তাকে ('বিজ্ঞান শিক্ষা'), চণ্ডীদাসের খুড়োকে ('খুড়োর কল'), হেড অফিসের বড়বাবুকে ('গোফ চুরি')। একইভাবে 'সৎপাত্র' ছড়াটিতে অসঙ্গতিজাত প্রসঙ্গের অবতারণা করে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা কংসরাজের বংশধর হিসেবে চিহ্নিত সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত কুলীনব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে সোজাসুজি গঙ্গারামের নিন্দা না করে নিন্দার ছলে ব্যজস্তুতির মাধ্যমে গঙ্গারামের শিক্ষা, কর্ম ও বংশপরিচয় তুলে ধরতে বক্তার গূঢ় উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। গঙ্গারামের রূপ ও গুণপনা উপস্থাপন করতে গিয়ে বক্তা অকপটে বলেন–

মন্দ নয় সে পাত্র ভাল-রং যদিও বেজায় কালো
তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা প্যাঁচার মতন। (২০০৭ : ৪)

সুকুমার রায়ের নিরর্থকতার মধ্যে অর্থের ব্যঞ্জনা খুঁজতে বস্তুবিশ্বের বিচিত্ররূপের ছায়াপাত, প্রত্যাহিক জীবনের সঙ্গে সংযোগবোধ নতুন শক্তি ও উপাদানে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তাই সুকুমার রায় কেবল খেয়াল খুশির কবি ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন এ্যাবসার্ডপন্থী সত্যান্বেষী; হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকের ভিক্টোরিয় যুগের মানসিকতায় উদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আধুনিক দৃষ্টিপ্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙালির প্রতিনিধি। আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্যরুচির বিশিষ্টতা তাঁকে বিপরীত দৃষ্টিতে জীবনকে, জগতকে দেখতে প্ররোচিত করেছিল। তাই 'ননসেন্স ক্লাবে'র প্রবক্তা সুকুমার এ্যাবসার্ড ভাবনার প্রয়োগকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। 'absurd' কে উদ্ভট এবং অর্থহীন বলে যারা এর ঐতিহাসিক অস্তিত্বটুকু স্বীকার করেন না, তারা ভুলে যান যে absurd-এর মূলে ক্রিয়াশীল আছে একটি দার্শনিক ভিত্তি। এই দর্শন অন্যান্য দর্শনের মতোই সত্যান্বেষী। পার্থক্য এইখানেই যে, এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়-সত্যকে সরাসরি দেখা, কিন্তু দর্শনীয় বিষয়ীকে উল্টো করে দেখা। নইলে অ্যালবি বলতেন না যে, এই সমাজের বিধিব্যবস্থা যদি পছন্দ না হয়, তাহলে change it একে বদল করো।' (বিমল মুখোপাধ্যায় ১৯৯৬ : ১১৯)।

সুকুমার রায়ের ছড়া, কবিতা, গল্প বা নাটকের খামখেয়ালিপনার মধ্যেও একটা সুশৃঙ্খল ধারা লক্ষ করা যায়। তৎকালে স্বদেশী হুজুগে যেসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সংগঠিত হয়েছে, বিশেষ করে বিজ্ঞাননির্ভর গবেষণার বাড়াবাড়ি বা অতিরেক নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, বিজ্ঞান শিক্ষার সেই অতিরঞ্জন নিয়ে বহুস্থানে তিনি ঠাট্টা করেছেন। হেশোরামের বিজ্ঞাননির্ভর রোমাঞ্চকর অভিযানে, প্রফেসর নিধিরামের কাহিনিতে, 'বুঝিয়ে বলা'র তত্ত্ববিদের জ্ঞান বিতরণে, 'হাতুড়ে' নামক ডাক্তারের বিচিত্র-বিদঘুটে চিকিৎসায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বুঝিয়ে বলা' ও 'বিজ্ঞান শিক্ষা' ছড়াদুটিতে রয়েছে জ্ঞান বিতরণ ও বিজ্ঞানশিক্ষা প্রয়োগে কৌতুকের

স্নিগ্ধ আবরণে মোড়া খেয়াল রসের কর্মকাণ্ড। 'বুঝিয়ে বলা'য় তত্ত্ববিদ শ্যামদাসকে ধরে কোমরবেঁধে তার কানের কাছে নামতা পড়ার মতো করে বলতে থাকে কোন বিশেষ কায়দায় বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম থেকে স্থূলেতে পরিণত হয়, কী প্রক্রিয়ায় প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শেকড়ে রস জমে, কেমন করে পঞ্চভূতের মূলে ঠেলা লাগে ইত্যাদি। 'শব্দকোষ', 'বস্তুপিণ্ড', 'পঞ্চভূত', 'প্রপঞ্চময়', 'বিশ্বতরু' প্রভৃতি কূটতত্ত্বের বিষয়গুলো জোর করে শোনাতে কোমরবেঁধে নেমে পড়ে বায়ুগ্রস্ত অদ্ভুত এই তত্ত্বজ্ঞানী–

> বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
> অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে–
> গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি করে
> রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে। (২০০৭ : ১৯)

অন্যদিকে 'বিজ্ঞানশিক্ষা'র বিজ্ঞানী ছোট একটি ছেলের ঘিলুতে কতখানি ভেজালের মেকি জমা আছে বা তার বুদ্ধির বহরটা ঠিক কতটা, স্ব-উদ্ভাবিত 'ফুটোস্কোপ' যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করতে উদ্যত। 'বিজ্ঞানসম্মত' পদ্ধতিতে মুণ্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট' করে, ইট দিয়ে 'ভেলোসিটি' কষে ছেলেটির বুদ্ধির পরিমাপ করতে ব্যস্ত বিজ্ঞানী। কিন্তু এই মারাত্মক পরীক্ষার জন্য গিনিপিগ হতে রাজি নয় ছেলেটি (চিত্রের অভিব্যক্তিতে)। বিজ্ঞানী তবুও আদরে-সোহাগে কাছে ডেকে উদ্দেশ্য সফল করতে চান–

> আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে
> দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
> কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিক থেকে যায় চাপা:
> কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠকঠকে কাঁপা। (২০০৭ : ২৬)

ছড়াটিতে 'ম্যাগনেট', 'রিফ্লেক্ট', 'ভেলোসিটি' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বিজ্ঞানীকে দিয়েছে পেশাগত গাম্ভীর্য। কাজেই 'বিজ্ঞান শিক্ষা'য় একদিকে ইংরেজি শব্দ অন্যদিকে 'বুঝিয়ে বলা'য় সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর অর্থাৎ একদিকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অন্যদিকে দার্শনিক পরিভাষা– দুই দুর্ভেদ্য-বিকট শব্দমণ্ডলশ্রেণির ধাক্কায় সমকালে চারপাশে সূক্ষ্ম-দুর্লক্ষ্য অনুষঙ্গের যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সেখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যজ্ঞানের সমন্বয়ে 'খিচুড়িতত্ত্বে'র দিকেই সুকুমার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোন প্রক্রিয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীমণ্ডলদ্বয় স্বনির্ভর-স্বয়ম্বশ হয়েছে, স্বাধীকার প্রমত্ত ধ্বনিপুঞ্জের প্রবল প্রতাপে চিন্তাশক্তি কীভাবে অর্থের নাগাল ছাড়িয়ে নিরেট ধ্বনিগুচ্ছে জমাট বেঁধেছে, দৃষ্টি কীভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে এবং যথারীতি তত্ত্বজ্ঞানীমণ্ডলদ্বয়ের হাতিয়ায়ে পরিণত হয়েছে, সেই ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন সুকুমার। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩ : ৩০৩-৩০৪)। 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে সুকুমার পশ্চিমা বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন থেকে ভাষার স্বেচ্ছাচার ও দৌরাত্ম্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে ভাষা ভাবের আশ্রয় ছেড়ে বা যে শব্দ অর্থের আগল ভেঙে বেরিয়ে প্রমত্ত ধ্বনিপুঞ্জের প্রবল চাপে

চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তিনি দৃষ্টান্ত সহকারে সেই শাসনতত্ত্বজ্ঞানী মণ্ডলদের কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন–

> ডারউইনের ইভোলিউশন থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদ জিনিসটা যে কি, সেটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করি না। কিন্তু ইভোলিউশন বা অভিব্যক্তি কথাটাকে আমরা খুব বিজ্ঞের মতো গ্রহণ করিয়া বসি এবং আবশ্যক হইলে ও বিষয়ে সাবধানে দু'চারটা মতামত যে ব্যক্ত করিতে না পারি এমন নয়। ...কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ-নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুক ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পালাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ এক-একটা কথায় আমরা যে পরিমাণ অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যত সহজে মুখস্ত বুলির মতো আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও তত প্রমাদ গণিয়া এক পা দুই পা করিয়া হাঁটিতে থাকে (সুকুমার রায়, ১৩৬৩ : ২০-২১)

'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়াটিতে আপাত হাস্যরসের আড়ালে লুকানো রয়েছে সমাজ সমালোচনাত্মক ব্যঙ্গের কষাঘাত। ছন্দের দোলায়িত আনন্দ, চৌকশ কথার হালকা ভঙ্গি, শব্দের সহজকথ্য ঢং (ছন্দ, ছবি, শব্দ)– এই ত্রিশক্তির সম্মিলনে সুকুমার এক অনাস্বাদিত অথচ ভয়ঙ্কর যুক্তি-শৃঙ্খলায় ভরা বস্তুজগতের কথা বলেছেন। খেয়ালরসে মন ভোলাবার আয়োজন সত্ত্বেও এর ভেতরে প্রচ্ছন্ন আছে সামাজিক অনেক গূঢ় অর্থের দ্যোতনা, সমকালীন বাস্তব ঘটনার প্রতিবিম্বন। ছড়াটিতে নির্মল হাস্যরসের আড়ালে বালক-কল্পিত আহ্লাদিত ফরমায়েশের মধ্যে প্রতীকায়িত আছে একেবারে ভিন্ন এক সমাজসত্য; যাতে ভীরু-আয়েসী, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, মিথ্যে আস্ফালনসর্বস্ব বয়স্কদেরও ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। কী চাই আমরা বাবুরাম সাপুড়ের কাছে? এমন একটা সাপ চাই, যেটা আসলে সাপই নয়– সত্যিকার সাপতো নয়ই, এমনকি রূপক বা কিংবদন্তির সাপও না, ফ্রয়েডের ভয়ঙ্কর সাপও নয়– যেনবা বৈষ্ণব পোষমানা কৃষ্ণভক্ত জীব। কিংবা কস্মিনকালেও সে কোনো জীব ছিল না, কোনো উৎপাত-উপদ্রব না করেই যে কেবল দু-বেলা দুমুঠো দুধভাত খেয়েই দিব্যি আমাদের সঙ্গে রফা করে চলে এমন 'জ্যান্ত' গোটা দুই সাপই আমাদের প্রাপ্তির আবদার। (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ : ৯২)। অর্থাৎ আমরা বেঁচে থাকতেই চাই; এ জীবনে দাঁত, নখ, কামড়, আঘাত, রক্তপাত– এসব কিছুই চাই না, ও সবে বড়ো উৎপাত। যে জীবনে শুধু দুধ-ভাতের অঢেল শান্তি নিয়ে আসে তার জন্যই আমাদের আহ্লাদেপনা। গোটা জীবনব্যাপী দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের পক্ষে এমন বিপুল আরামপ্রদ জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে মামাবাড়ির আবদারটির উদ্দেশ্যে বাড়ানো প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত।

অন্যভাবে ছড়াটির রূপকের অর্থ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বাবুরামের সাপটি হলো গান্ধীর স্বরাজ কল্পনায় সমকালীন ব্রিটিশ গভর্মেন্ট, যার দাঁত-মুখ-শিং ভেঙ্গে আর টুঁশটুঁশ করার ক্ষমতা লুপ্ত করে দিয়ে রেকাবিতে সাজিয়ে-গুছিয়ে শান্ত করে রাখতে

পারলে সহজেই স্বরাজ হস্তগত হবে। কেননা সমকালে ভারতের নানা স্থানে সংঘটি নানা আন্দোলন-সংগ্রাম-ধর্মঘট ইত্যাদির কারণে গান্ধী এবং তার নরমপন্থী অসহযো আন্দোলন ঝুকির মুখে পড়েছে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন গান্ধী। অসহযো অন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান্ধী চেয়েছিলেন নখশৃঙ্গাহীন সেই সাপকে, যার কোে উৎপাত নেই, কোনো টুঁশটাঁশও মারে না। ফলে সরকারের সঙ্গে সদলবলে গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের ভূমিকায় জনমনে যে অসন্তোষের প্রকাশ, সুকুমারের ব্যঙ্গে আক্রমণ ছিল সেই অসারতাকে উদ্দেশ্য করে। আর তাই সবরকম গোলোযোগ রক্তপাত ছাড়া 'নখ-দন্তহীন' অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে সমস্ত রক কাপুরুষতাকে তীব্র শ্লেষে ও ব্যঙ্গে কশাঘাত করা হয়েছে। সুকুমার রায় এখানে কাে দেখাতে চেয়েছেন নখশৃঙ্গাহীন-উৎপাতহীন সাপরূপে? ব্রিটিশ সরকারকে নাি নরমপন্থী অসহযোগ অন্দোলনকে ঘিরে গান্ধীকে? এখানে গান্ধীর অসার নরমপ আন্দোলন-মানসিকতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে, এ বিষয়ে সমালোচকদের কোনো সংশ নেই। আবার ছড়ার শেষাংশে উল্লিখিত গান্ধীর 'experiment with thuth'কে দম করতে ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনে লাঠির ব্যবহার করে নিরীহ আন্দোলনকে তেড়েমে ডাণ্ডা মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই– এটাই ছড়াটি নিহিতার্থ। (শঙ্খ ঘোষ ২০১২ : ১৬-১৭)। অন্যদিকে ছড়াটিতে নানা বিপরীতমু বিন্যাসে একটু ধাঁ-ধাঁর সৃষ্টি হয়েছে; যাতে আন্দোলন-সংগ্রামে সুকুমারের প্রচ্ছ সম্মতির ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়।

'নারদ নারদ' ছড়ায় দুই বাকপটু বীর মুঠো পাকিয়ে, দাঁত-মুখ খিচিয়ে, রাগে শরী চিড়বিড়িয়ে ধুন্দুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছে। ছড়ার সঙ্গে অঙ্কিত ছবিটি মিলিয়ে পড়ে দুই বাক্যবীরের পরিচয় খোলসা হয়। দুজনের পরনে ধুতি, একজন মোজা ছাড় একজন মোজাসমেত বুট পরে। প্রথম ব্যক্তিটির নগ্নগাত্রে শোভা পাচ্ছে পূত উপবীত উৎকটভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে তার অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ্য পরিচয়। অন্যদিকে দ্বিতী ব্যক্তিটির পরিচয়ে গায়ে কুর্তা, থুতনিতে হালকা দাড়ি এবং টানটান তার গোঁফজোড়া বিচিত্র নানাবিষয়ী বেআদবির অজুহাতে তাদের ধন্দুমার কাণ্ড লেগে যায়, পরস্পরে পিটিয়ে শোধ নেবার জন্য দুজনেই কোমরে হাত বেঁধে, জোরদার গলাবাজিতে চমৎকা কোন্দলের ভাষায় উষ্মা ফুটিয়ে তুলে আসরে নেমে পড়েছে– উত্তেজনায় খাঁড়া হে গেছে তাদের চুল। তাদের আস্ফালনের আসল লক্ষ্য পরস্পরের কান– শব্দবাণ ছুঁড়ে একে অপরের অহং-এ আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর তারা। 'ক্যানরে ব্যাটা ইস্টুপিড ঠেঙ্গিয়ে তোরে করব টিট।'/ 'চোপরাও তুম স্পিকটি নট্, মারবো রেগে পটাপট কিংবা অনুপস্থিত মামার প্রসঙ্গ তুলে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার হুমকি, 'আজকে যদি থাক্ মামা পিটিয়ে তোমায় করত ধামা।' (২০০৭ : ২২)। তাদের বাক্যুদ্ধের প্রধান হাতিয়া নব্যশিক্ষিত উপনিবেশিত ভদ্রলোকের নব্যলব্ধ হিন্দি-ইংরেজি মিশ্রিত শব্দবাণ

ছড়াটিতে পৈতেশোভিত এবং বুটপরা দুই বাক্‌যোদ্ধার মূর্তিতে নিঃসন্দেহে সমকালে প্রাচ্যজ্ঞানাভিমান এবং নব্য পাশ্চাত্য জ্ঞানাহঙ্ককারীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশেষে পুলিশ নামক উভয়ের মাথার ওপর ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের জুজুর প্রসঙ্গে উভয়ই 'ভেরি ভেরি সরি, মশলা খাবি' বলে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে অপূর্ব 'সমন্বয়' ঘটিয়ে সুকুমার দুই পরাশক্তির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার অন্যদিকে সমকালে মুখোমুখি দুই যুযুধানমুখী স্বাধীনতা আন্দোলনমুখী কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস-সংঘাতের রূপ ফুটে উঠেছে– সেটিও অনুমান করা যায়। কংগ্রেসের নরমপন্থী থেকে চরমপন্থী বনে যাওয়া অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের আলাদা হিস্যার দাবিতে মুসলিমলীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার উভয়ের পারস্পরিক বিরোধের তোড়জোড়ে 'মামা' বা 'পুলিশ'-এর প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের আনুগত্যকে সুকুমার তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন।

'ডানপিঠে' ছড়াটিতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্য সুকুমারের সহানুভূতি অপ্রচ্ছন্ন থাকে না। ডানপিঠে ছেলেদুটি সহজপথে চলে না। একজন মুখে আঠা মেখে স্লেট-শিশি ভাঙে তো অন্যজন হামাগুড়ি দিয়ে আলমারিতে উঠতে চায়। দূরন্ত এই দুই ভাই যেন সমকালে বাংলার দুই বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'। একইভাবে 'একুশে আইনে'র ছড়ায় 'যে সব লোকে পদ্য লেখে' বলতে স্পষ্টতই কারারুদ্ধ অনশনকারী নজরুল বিষয়ে সুকুমারের ভাবীকথন। এ জাতীয় 'পল্টন' ফেরা বিরুদ্ধবাদীদের বাধ্য করা হয় : 'খুচিয়ে পিঠে গুজিয়ে ঘাড়/ সেলাম ঠোকায় একশবার।' (২০০৭ : ২০)। এছাড়া ঘটনার অন্তরালে সংঘটিত ১৯১৯ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেম্‌চফোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত 'রাউলাট আইনের'[৮] কাঠিন্যকেও এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শিবঠাকুরের আপন দেশে সুকুমার মজার ছলে সর্বনেশে আইনগুলো শুনিয়ে দিয়েছেন। যেকোনো শাসনব্যবস্থায় তার অধীন নাগরিকদের কাছে দাবি করে আনুগত্য। আনুগত্যদের জন্য থাকে বরাভয় আর তার উল্টো পিঠে থাকে শাস্তি বা নির্যাতনের হুমকি। আনুগত্যে গড়বড় হলেই ভয় আর অভয়ের এই ভারসাম্য ভেঙে যায়। শাসক কঠোর হস্তে দমন করতে তৎপর হন। আইন অমান্য করলে 'একুশ টাকা দণ্ড হয়' নস্যি দিয়ে 'একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে' কিংবা 'একশ হাতা জল গেলায়'। শুধু তাই নয় অপরাধের ধরন অনুযায়ী একুশ পাক ঘুরিয়ে 'একশ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে।' কাজেই 'সেথায় সন্ধ্যে ছটার আগে/ হাঁচতে হলে টিকিট লাগে।' কিংবা কারুর যদি দাঁতটি নড়ে, কারুর যদি গোঁফ গজায়, কারুর যদি নাক ডাকে সবই দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে–

চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়
এদিক ওদিক ডাইনে বায়
রাজার কাছে খবর ছোটে
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,

দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়। (২০০৭ : ২০)

'একুশে আইন'-এর মতো 'রামগরুড়ের ছানা'ও ব্যঙ্গ ছড়া। ১৮৫৭ সালে সংঘটি সিপাহী বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করে শাসক ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে ত্রাসে রাজত্ব কায়েম করে। কঠোর আইনের শাসন, দমন-পীড়ন জনসাধারণের মনে ভীতি সৃষ্টি করে। বিধিবদ্ধ আইন এবং আইনের বিধিবদ্ধতায় সরকার ও জনসাধারণের মে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের মন থেকে সব ধরনের আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ হ যায়, চতুর্দিকে কোনো আশার আলো নেই, কেবল শুধু অন্ধকার। পরিবেশ ও পরিস্থি যখন আতঙ্কের-ভয়ের উপাদানে এবং অসঙ্গতির জটাজালে অবরুদ্ধ, তখন এর মে একটা খটকা, একটা থাপ্পড়, একটা মোক্ষম ঘায়েল করা ধাক্কা দিয়েছেন সুকুমার যাতে নিয়মানুযায়ী, সম্ভবের আতিশয্যে নিরীহ বা নির্বিরোধ-গম্ভীর বাস্তবের চি তাৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি ব্যঙ্গার্থতা প্রকাশে তার নির্মমতা আমাদের বুঝে মোটেই বেগ পেতে হয় না। যাবতীয় আনন্দ ও উচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হয়েছে–

সবাই মরে ত্রাসে– ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি বকে বকে
আপনারে কয় 'হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে' ...
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা। (২০০৭ : ২৯-৩০)

এর ঠিক উল্টো চিত্র 'আহ্লাদী' ছড়ায় তিনটি ছোট বাচ্চার আপনভোলা আহ্লাদী স্বরূপে কার্যকরণকে সহজভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'হাসছি কেন কেউ জা না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই'। হাসির দমকে 'উঠছে হাসি ভসকিয়ে সোডার মতন পে থেকে।' (২০০৭ : ২৯)। অন্যদিকে 'কুমড়ো পটাশ' ছড়ায় বিষয়টি উল্টোধার প্রবাহমান। যেখানে বস্তুপৃথিবীর নিয়মকানুনের সঙ্গে অর্থসম্পর্কহীন এক অদ্ভুত জগতে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রসস্বভাবের দিক থেকে কুমড়ো পটাশের অসঙ্গ উপস্থিতি এ অদ্ভুত সব আচরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীতও নয় আবার একেবারে অর্থহীন বি বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হয়েছে। আমরা এটিকে ননসেন্সের সার্থক উদাহরণ হিসেবে মে নিলেও এটি তৎকালীন ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডের উদ্ভট-খামখেয়ালি কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গ ক হয়েছে। যেখানে শিবঠাকুরের আপন দেশে মানুষ স্বাভাবিক কাজের জন্য ভোগ করে হয় অস্বাভাবিক শাস্তি, সেখানে কুমড়ো পটাশের অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে– না হলে নেমে আসবে শাস্তির খড়গ। তাই সবধ বাণী–

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,
কুমড়ো পটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন *ঠেলা*।
দেখবে তখন কোন কথাটি কেমন করে ফলে
আমার তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি বলে। (২০০৭ : ০৭)

'গানের গুতো' ছড়ায় ভীষ্মলোচন শর্মার কর্কশ কণ্ঠের তীব্র আওয়াজ, ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, 'দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত।' তার গানের অত্যাচারে সবাই যখন 'বলছে হেঁকে প্রাণটা গেল গানটা থামাও ঝটপট' তখনও 'ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশমেজাজে দিলখুশ।' বিকট গানের দাপটে দালানকোটা-বাড়িঘর বিস্কুটের মতো ভেঙে পড়ছে, মহিষ-ঘোড়া চিৎপাত হচ্ছে, মানুষ-জন্তু পালাচ্ছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। এবম্বিধ পটভূমিতে রূপক ভাবনায় সমকালীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করেছে। কেননা ভীষ্মলোচন শর্মার 'গানের গুতো' আসলে ১৯১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে (আনু.) জার্মান যুদ্ধজাহাজ 'এমডেন'-এর আক্রমণে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সে ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত। জাহাজটি ঘটনার কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগরে ঢুকে চুপচাপ অবস্থান করছিল, 'জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপচাপ।' এরপর কলকাতা-রেঙ্গুন-কলম্বো জলপথে আক্রমণ শুরু হলে 'এমডেন'ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে, 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা।' খবরটি ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে না আনলেও *দি হিন্দু* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি থেকে ইলাস্ট্রেশন করেন সুকুমার রায় এবং'গানের গুতো' আসলে 'এমডেনের 'gun' এর গুতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো এ সমস্ত জাহাজ 'goat island'-এ নোঙ্গর করা থাকতো। এটিকেই সুকুমার সচেতনভাবে 'ছাগলের গুতো' বলে রূপকায়িত করেছেন। (স্বর্ণালী দত্ত : https://mail.google.com)। আবার অন্যভাবে বলা যায়, ভীষ্মলোচন শর্মার যে গানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে দিল্লী থেকে বর্মা পর্যন্ত, তারই সূত্র ধরে সমকালে বাঙালি এক বীর সেনানীর দেশমাতৃকার মুক্তির সুতীব্র আহ্বান দিল্লী থেকে বার্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে; যুদ্ধে ভারতীয় তরুণদের সৈন্যদলে যোগ দিতে ডাক দিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত বাবুরাম সাপুড়ের মতো অসীম ক্ষমতাধার ব্রিটিশশক্তির 'শিং বাগিয়ে মারল গুতো'য় 'বাপরে বলে ভীষ্মলোচন একেবারে ঠাণ্ডা।' (২০০৭ : ৯)

একথা ঠিক যে সমকালে সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্ভট পরিস্থিতির কারণে যেকোনো সুস্থ চেতনার পক্ষে বিরাজমান এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশে সুকুমার রায়ের ফ্যান্টাসির জগতের মধ্যেও প্রত্যক্ষ সামাজিক ভাবনার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে তৎকালীন বড়লাটের পার্লামেন্ট সেক্রেটারি এইচ. এইচ. রিসলে কর্তৃক ঘোষিত 'রিসলে সার্কুলার' অনুযায়ী বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের মূলচ্ছেদ করতে এবং ছাত্রদের আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে এক ঘোষণা জারি করা হয়। যাতে স্বদেশী-অসহযোগ আন্দোলনকারী রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে ঢুকালেও কোনোরূপ শাস্তি বা

অত্যাচারের কোনো বিধি-বিধান না থাকার অভয় বাণী শোনানো হয়। জ্যৈষ্ঠ মা প্রকাশিত *প্রবাসী* পত্রিকা যথারীতি সরকারের ঘোষণায় আন্দোলন-সংগ্রাম স্থগিে কোনো নির্দেশনা নেই বলে স্বস্তি প্রকাশ করে। আর আষাঢ় মাসে *সন্দেশ*-এ 'ভ কিসের' উল্লেখ করে 'ভয় পেয়ো না' ছড়াটি প্রকাশিত হয়। (শঙ্খ ঘোষ, ২০১২ : ২১ ছড়াটির বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

> ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না–
> সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারবো না।
> মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
> তোমায় আমি চিবিয়ে খাব, এমন আমার সাধ্যি নেই। (২০০৭ : ৩৫)

তাৎপর্যপূর্ণ দিক থেকে তাই বলা যায় যে, উৎসকে অতিক্রম করে যাবার সামথে রয়েছে রচনাটির অন্যতম শক্তি– উৎসের রূপক হয়ে থাকাটাই সেখানে ভবিতব্য ন শক্তিমানের মিষ্টি কথার আদরে দুর্বলকে ফাঁদে ফেলার চিরন্তন কৌশলের বাণী, 'এ এস গর্তে এস, বাস করে যাও চারটি দিন,/ আদর করে শিকেয় তুলে রাখবো তো রাত্রি দিন' (২০০৭ : ৩৫)– রচনাটির মূল উপজীব্য তাতে কোনো সন্দেহ নে বিষয়টির বিবরণের সঙ্গে তৃতীয়বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আই. এম. এ (International Monctary Fand) বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচনের অর্থসহায় দেওয়ার ফাঁদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভুলিয়ে ভালিয়ে বশে আনতে পারলে অবশেষে সমূর্তি ধারণ–

> অভয় দিচ্ছি, শুনছো না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
> বসলে তোমার মুণ্ড চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা! (২০০৭ : ৩৫)

শক্তিমানের আর দুর্বলের এই চিরন্তন সম্পর্ককে সুকুমার মর্মান্তিক কৌতুকের মাধ উপস্থাপন করেছেন যা নিত্যই আমাদের সামাজিক জীবনে ব্যবহারযোগ্য অনুষ 'লড়াই ক্ষ্যাপা'-তে পাগলা জাগাইয়ের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অহেতুক লম্ফ-ঝ তুলনীয় হয়ে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অমিত শক্তিধর আগ্রাসী জার্মানির বিরু ব্রিটিশরাজের ঘোষণা, 'চেঁচিয়ে বলে, ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?/ স জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।' (২০০৭ : ০৯) এর সঙ্গে আরো তুল হতে পারে মিগুয়েল দ্য সারভেন্তিসের (১৫৪৭-১৬১৬) বিখ্যাত কাহিনি *ডন কুইকসে* এ বর্ণিত দূর থেকে হাওয়াকলকে অদৃশ্য শত্রু মনে করে যুদ্ধ ঘোষণার আস্ফাল রূপকে নাইটদের বীরত্বের মিথ্যা বাহাদুরি। (আলী ইমাম ২০১০ : ৯০) 'ছায়াবাজি বিচিত্র ধরনের ছায়ার সন্ধানে দিকবিদিক ছুটে চলা ব্যক্তির একান্ত উদ্দেশ্য অবশে আমরা জানতে পারি–

> মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুয়ে
> ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!

পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি । (২০০৭ : ১৪)

এছাড়া আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনে বৃধৃত বিদেশি দ্রব্য বয়কট করা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কিন্তু বিদেশি দ্রব্যের তুলনায় দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের মান অনুন্নত এবং মূল্য অধিক হওয়ায় দেশের সর্বত্র 'স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য' এই শ্লোগান সাদরে গৃহীত হয়নি। সুকুমার রায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে একাত্মতা পোষণ করে স্বদেশী পণ্যরূপী নানা ধরনের 'ছায়া'র গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন। তাই রাজনৈতিক ডামাডোলে 'ছায়াবাজি'র সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়, 'A reference to the Swadeshi-hunters and the Brahmos trying to capture life in their degmas.-Andrew Robinson, Miscellany' (শঙ্খ ঘোষ ২০১২ : ২২)। 'কাঠবুড়ো'তে 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত'- আপাত দৃষ্টিতে এখানে একটি অর্থসম্পর্কহীন বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনে আজগুবি ও উদ্ভট কৌতুকপূর্ণ অতিরেক এক জগতের উদ্ভাসন সত্ত্বেও 'অপ্রাকৃত' বা 'অসম্ভব'-এর ধারণার সঙ্গে সমান্তরালভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরম পর্যায়ে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয়দের মধ্য থেকে সৈন্য নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। এই সময়ে ভারতে নিযুক্ত ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের সেক্রেটারি এবং এক সময়কার সেনসাস কমিশনার হারবার্ট হোপ রিসলের (H.H.Risley) ওপর দায়িত্ব পড়ে সৈন্য বাছাইয়ে। তিনি সৈন্য নিয়োগে 'martial races' তত্ত্ব প্রয়োগ করে 'caste' অনুযায়ী অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথাকে গুরুত্ব দিয়ে সৈন্য নির্বাচন করেন। সৈন্য নির্বাচনের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং দেশীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের তাচ্ছিল্য মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে রূপকভাবে-

জানি কোন কাঠ কিসে হয় জব্দ
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি তা পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন কাঠ পোষ মানে, কোন কাঠ শান্ত
কোন কাঠ টিমটিমে কোন কাঠ জ্যান্ত। (২০০৭ : ৩)

Risley ১৯০১ সালে সেনসাস কমিশনার থাকাকালে হিন্দু জনসংখ্যা নির্ণয়ে জাতিভেদ প্রথাকে গুরুত্ব দিয়ে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন। সৈন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই মনোভাবকে সুকুমার তীক্ষ্ন কষাঘাতে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। বাংলায় 'কাঠ' বা 'কাষ্ঠ'ই হলো জাতি অর্থে 'caste'এর উচ্চারণগত মিল। অন্যদিকে 'বুড়ো' অর্থে Risley স্বয়ং তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত ডামাডোলে রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের পাশাপাশি খাদ্যপরিস্থিতির ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এ সময়ে লন্ডনের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট

'W. H. Robinson' সমকালীন দূরাবস্থা নিয়ে *Some Frightful War Picture* (Duckworth London : 1915) শিরোনামে একটা কার্টুনের সংকলন প্রকাশ করেন। যাতে ভুক্তভোগী অসহায় মানুষদের দুরাবস্থার চিত্র এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারণ কিভাবে যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে তা দেখানো হয়েছে। (স্বর্ণালী দত্ত : https://mail.google.com). উক্ত সংকলনের একটা বিশেষ ছবির সঙ্গে 'খুড়োর কল' ছড়ার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ছড়ায় বর্ণিত কলের সামনে দড়িতে আটকানো খাবারের লোভে ছুটে চলা খুড়ো যেন হতভাগ্য-অসহায় নেটিভজন ব্রিটিশদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে, 'পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘন্টায় চলে'। 'ভালরে ভাল' ছড়ায় উচ্ছ্বসিত কৌতুকরস পরিবেশনের ছলে সুকুমার জগতের সবকিছু 'ভাল' ভাবতে চাইছেন। তাই 'আসল-নকল', 'গানের ছন্দ-ফুলের গন্ধ', 'ময়লা-ফরসা' সবকিছুকেই ভালো বলেছেন। কিন্তু ছড়ার শেষের চরণে যখন বলে ওঠেন 'কিন্তু সবার চাইতে ভাল/ পাউরুটি আর ঝোলা গুড়' (২০০৭ : ৫) তখন ছড়ায় প্রতিভাত হয়ে ওঠে ভিন্ন এক পরিস্থিতির অনুদ্ঘাটিত চিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন বিপর্যস্ত; তৃতীয় বিশ্বের জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা, 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান' পূরণে রাষ্ট্র গলদঘর্ম অবস্থায় উপনীত। এ সময়ে 'পাউরুটি আর ঝোলা গুড়' যেন হয়ে ওঠে নাগরিকদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের চাবিকাঠি। তাই সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রীক প্রেক্ষাপটে সুকুমার অর্থপূর্ণ শব্দ-ধ্বনি-ছন্দে-ভাষায় বস্তুতান্ত্রিক মাত্রাকে ননসেন্সের পরিকল্পনায় উপস্থাপন করেছেন। এসব ক্ষেত্রে উৎস ছিল তাঁর সমকালীনতা এবং তার সঙ্গে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, শিল্পীর বাস্তবতাবোধ ও শিল্পরসবোধের সূক্ষ্মতা ও অসম্ভবের উদ্ভাবন। 'গোফচুরি'তে সরকারি অফিসের বড়বাবুর কথা বলা হয়েছে, যিনি দিব্যি থাকেন তার চেয়ারখানি চেপে। কিন্তু বড়বাবু বড্ড দিশেহারা হয়ে আছেন কল্পনায় গোঁফ হারানোর ভয়ে। সমকালে ব্রিটিশশাসনপুষ্ট সুবিধাভোগীশ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে নিজের অবস্থান হারিয়ে ফেলার দুঃস্বপ্নই তাকে তাড়িত করেছে বারংবার, 'গোফজোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর'। এছাড়া ছড়াটিতে জাতিভেদ-শ্রেণিভেদের ওপরও আলো ফেলেছেন সুকুমার। 'শ্যাম' বর্ণের শ্যামবাবুর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং তাদের গয়লাদের প্রতি ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে নব্য অভিজাত শ্রেণির বড়বাবুদের–

> নোয়রা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা
> এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা। (২০০৭ : ০৩)

রবীন্দ্রনাথ '*খাপছাড়া*'তে কৌতুক-হাস্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক অসঙ্গতির চিত্র বাস্তবানুগভাবে তুলে ধরেছেন। একইভাবে উনিশ শতকের শেষে ভিক্টোরিয় যুগের মানসিকতায় শিক্ষিত বাঙালি স্বদেশী আচার-রীতি ছেড়ে উৎকট পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রবণতকে উপলক্ষ করেছেন। তাদের পোশাকী ভাবধারায় সাহেবী চালচলন,

সাংস্কৃতিক রুচির বালখিল্য প্রকট হয়ে ওঠে। সমকালীন এই বাস্তব পরিস্থিতিকে বিপরীতার্থ প্রতীয়মান সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় প্রেরণায় সুকুমারকে সমাজ ও জীবনকে নিগূঢ় অবলোকনে প্ররোচিত করে। ফলে বিভিন্ন ছড়াতে তার কশাঘাত, কৌতুকপ্রিয়তার ছাপ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'ট্যাঁশগরু' ছড়ায় দেখা যায় 'ট্যাঁশগরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে' এবং তাকে দেখতে পাওয়া যায় 'হারুদের অফিসে'। 'ফিটফাট কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত' তার চেহারাখানা হলো– 'চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত'। বাহারী চেহারার এই প্রাণীর খাদ্য–

> খায় না সে দানা পানি- ঘাস পাতা বিচুলী
> খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি;
> রুচি নাই আমিষে, রুচি নাই পায়েস
> সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে। (২০০৭ : ৩২)

সুকুমারের রচনায় এ জাতীয় অর্থপূর্ণ কেন্দ্রাভিমুখ প্রতিমানের ছাপ লক্ষ করা যায়। জগৎ-জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ 'কিম্ভূত', 'ট্যাঁশ গরু'র মতো প্রাণী-সমাজের প্রকৃত সমস্যার প্রতি উদাসীন; বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী 'রামগরুড়ের ছানা', 'কাঠবুড়ো' কিংবা ব্যাখ্যাতীত ইন্দ্রিয়াস্বাদনপূর্ণ 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'পালোয়ান' বা 'বোম্বাগড়ের রাজা'– এরা প্রত্যেকেই কাল্পনিক চরিত্র হলেও এদের বাস্তবজীবন বা সমাজের সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজের অনেক প্রথাকে সুকুমার মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি; সহ্য করতেও পারেননি। তাই 'ট্যাঁশ গরু'র মধ্য দিয়ে তিনি ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের কুলাঙ্গার সন্তানদের রীতি-প্যাশনকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। (সোমদত্তা ঘোষ ২০১৭ : ৯১)। লুইস ক্যারলের কল্পকাহিনি 'জ্যাবারওয়াকি'তে এ জাতীয় উদ্ভট চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। অভিনব-উদ্ভট কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী এই প্রাণীগুলো সমাজের রীতি-নীতির কোনো কিছুতেই মাথা ঘামায় না– মনে যা ইচ্ছে করে তাই করতেই সদা তৎপর থাকে, সেই আজগুবি অবাক করা রাজ্যে আহ্বান জানিয়েছেন সুকুমার। বাংলা লোক-শিশুসাহিত্যের এ ধরনের একটি উদ্ভট প্রাণী হলো 'হাট্টিমা টিম টিম'। লোকায়ত ছড়ার এই আজগুবি চরিত্রটি মনে করিয়ে দেয় আমাদের রূপকথা জগতের স্বপ্নময় মায়াবী পরিবেশ। বাংলার লোকমুখে প্রচলিত এ জাতীয় ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন, 'সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতকটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি বর্তমান লেখকের নাই।... এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে।' (রবীন্দ্রনাথ ২০১১ : ৭৪৯)। লোকছড়ায় স্বতঃস্ফূর্ত এই জাতীয় অসঙ্গতি ও অবাস্তব কল্পনার সঙ্গে কৌতুকরসের মিশ্রণে পাওয়া যায় সুকুমার রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমানুষী আর অনাবিল-হেতুহীন দারুণ সব ছড়া। অবশ্য এরকম আরও কিছু উদ্ভট প্রাণী *হ য ব র ল* এবং *হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি*-তেও পাওয়া যায়। উদ্ভট প্রাণীর নানারকম

উদ্ভট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সুকুমার তাঁর দৃষ্টি সমাজের অসঙ্গতির অন্তর্মূল পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন আমাদের নানারকম ব্যাধি, বিকারগ্রস্ততার ভ্রুকুটি এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি সীমাহীন বিতৃষ্ণা এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ বিরক্তি। আটপৌরে জীবন-যাপনেও রয়েছে তাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত অনাগ্রহ। তাই বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও সামাজিক জীবনের ব্যাখ্যায় রয়েছে গভীরতা– উদ্দেশ্যময়, সচকিত, গোচরলক্ষ্যভুক্ত অনির্দেশ্য প্রতিমান। ফলে, একইসঙ্গে আমরা পেয়েছি অফুরন্ত হাস্যরস, জীবন-বাস্তবতাবোধের সঙ্গে মমতাময় সংযোগের স্বারূপ্য আর বহুদর্শিতায় ভরা আনন্দময় জীবনালেখ্যের যথার্থ সামর্থ্য–

১. বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুঁৎ খুঁৎ।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান ঘ্যান আবদারে ঘন ঘন নালিশে
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না
কিযে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না। (২০০৭ : ০৩)

২. হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?
নাই তার মনে কি? কেই তাহা জানো কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ? ...
থপ থপ পায়ে সে নাচত সে আয়েসে,
গাল ভরা ছিল তার ফুর্তি
গাইতো সে সারাদিন সারে গামা টিম টিম
আহ্লাদে গদ-গদ মূর্তি! (২০০৭ : ২২)

সুকুমার অদ্ভুত, অসঙ্গত এমনকি উদ্ভট কল্পকাহিনি সৃজনের মধ্য দিয়ে আমাদের অতি চেনা দৈনন্দিন পৃথিবীকে আরো গভীরভাবে চেনাতে ননসেন্সের ছলে বস্তুতান্ত্রিক মাত্রাকে সম্ভব-অসম্ভবের আদলে উপস্থাপন করেছেন। নিতান্ত আজগুবি ঘটনার আগাগোড়া আগডুম-বাগডুম তালে, নেহাত হালকা ও খোলা চালে বাস্তববিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও অসম্পৃক্ত থাকার বা সংযোগ-অসংযোগের অনুষঙ্গে এক সাবয়ব জগৎ নির্মাণকল্পে গভীর ভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেখানে বর্ণাঢ্য ও পারিপাট্যে চিরচেনা জগতটাকে পেছনে ফেলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাস্তবের পরিস্ফীত বা বাস্তবের বিপ্রতীপ প্রতিমান জগতের চিত্র। ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের সময়ে ১৯২১ সালে রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানার্থে ঘোষিত যে উপাধির তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে অনেক অখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তির নাম দেখে রাজা ক্ষুব্ধ হন। রাজা প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন 'মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?' তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেন। এমনকি পাত্র, মিত্র, বদ্যি, কোটাল, পালোয়ানসহ রাজার শ্যালকও এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন। এখানে ঘটনার অন্তরালে রয়েছে মন্ত্রীসহ

ক্যাবিনেটের স্বার্থসিদ্ধির এবং দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র। প্রধানমন্ত্রী লয়েড এবং তার ক্যাবিনেট নতুন উপাধি তৈরি করে অর্থের বিনিময়ে তা প্রদান করেন। এমনিভাবে তৈরি 'order of British Empire' উপাধিকে লোকে উপহাস করে বলতে থাকে, 'order of the bad egg' এই bad egg বা পঁচা ডিমের গন্ধ থেকে লেখা 'গন্ধবিচার'। (স্বর্ণালী দত্ত : https://mail.google.com)। ছড়ার শেষাংশে নব্বই বছরের বৃদ্ধ নাজির গন্ধ সহ্য করে নিজ তেজে টিকে গেলেন–

> জামার পরে নাক ঠেকিয়ে- শুকলো কত গন্ধ,
> রইলো অটল দেখল লোকে বিস্ময়ে বাক্ বন্ধ।
> রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
> বাপরে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে অক্কা। (২০০৭ : ২৪)

বুড়ো নাজির আন্ড্রিট বোনার্ড ল'কে রাজা পঞ্চম জর্জ নতুন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। 'বোম্বাগড়ের রাজা' নিয়েও আছে মজার এক কাহিনি। ১৯২০ সালের কোনো এক সময়ে আলোয়ার মহারাজা জয় সিং লন্ডনের মে ফেয়ারের রোলস রয়েসের গাড়ির শো-রুমের পাশ দিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেখানে রোলস রয়েসের নতুন মডেলের গাড়ির প্রদর্শনী চলছিল। মহারাজার নতুন নতুন গাড়ির খুব শখ ছিল। কিন্তু গাড়ি দেখতে ভিতরে ঢুকতে গেলে সাধারণ পোশাক পরিহিত মহারাজাকে দোকানের কর্মচারী পাত্তা দেয়নি। ফলে মহারাজা খুব মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি কিছু না বলেই ভিতরে ঢুকে ৬টি গাড়ি একবারেই কিনে ফেলেন। তবে শর্ত ছিলো যে, গাড়ির সঙ্গে সেই কর্মচারিকেও ভারতে পাঠাতে হবে। দেশে ফিরে মহারাজা গাড়িগুলোকে রাজ্যের আবর্জনা সংগ্রহের কাজে ব্যবহারের আদেশ দেন। খবরটি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোলস রয়েসের বিক্রয় কমে যায়– সুখ্যাতি ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ে। ঘটনাটি তৎকালীন লন্ডনের *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় নিবন্ধ-আকারে প্রকাশিত হয়। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে খ্যাত রোলস রয়েস ভারতে আবর্জনা বহনের গাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সকলকে যেমন চমকে দিয়েছিল, ছড়ায়ও তেমনি বোম্বাগড়ের রাজার অদ্ভুত কাজকর্ম আমাদেরও চমকে দেয়–

> রাত্রে কেন ট্যাঁক ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে
> কেন রাজার বিছানা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে?
> সভায় কেন চেচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' বলে?
> মন্ত্রী কেন কলসী বাজায় বসে রাজার কোলে?
> সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
> কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী? (২০০৭ : ১৪)

সুকুমার তাঁর চারপাশের জগাখিচুড়ি সমাজজীবনের কিম্ভূতরূপ সম্বন্ধে সচিত্র মশকরা করেছেন। শিশুসাহিত্যের মোড়কে ননসেন্সের সাহায্যে সমাজের প্রতি তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। 'নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার' ছড়ায় চেককোট-পাতলুন পরা,

মাথায় মুকুটধারী রাজবেশ কিন্তু হাতে শ্লেট এবং বগলে তলোয়ারের মতো প্র
পেন্সিলসমেত বুড়ো রাজা নেড়ার বেলতলায় গমনাগমনের জটিল সমস্যা নিয়ে গলদ
অবস্থা তৈরি হয়েছে। রাজা তার সভা ছেড়ে রৌদ্রতপ্ত ইস্টকপুঞ্জের ওপর ব
বাদামভাজা খেলেও তা গলাধঃকরণ করছেন না। ছড়াটিতে প্রত্যাশিত নিয়
শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রকথিত 'ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা' প্রকা
একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। এই উপলব্ধির সঙ্গে শব্দ-ছন্দ-ছবি মিলে এক আ
নতুন অনুভূতি আমাদের কৌতুকের জগৎ থেকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়।

'চোর ধরা'তে কোষমুক্ত নাঙ্গা তলোয়ার হাতে এক বীর পুরুষের আস্ফালনের প
'কি মুস্কিল'-এ কেতাবের পাতায় ভর করে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে মত্ত হতে গিয়ে আটপৌ
জীবনযাপনে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'বুড়ীর বাড়ী' ছড়ায়
কোনো প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বা অসঙ্গতির আয়োজন, নেই হাসির কোনো আড়াল। হতদ
বৃদ্ধার জীর্ণ ঘরের ছবিটি নিঃসন্দেহে অবহেলিত মানুষে প্রতি তথাকথিত সুধী সমাজ
কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের নিদারুণ ঔদাসীন্য সূচিত করে– চিহ্নিত করে সামাজিক অসা
সংকট এবং উৎপীড়ন। আবার 'দাড়ে দাড়ে দ্রুম' ছড়ায় অহেতুক ব্যস্ততা বর্জন ব
সুন্দরভাবে, সহজ চালে জীবনটাকে কাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সুকুমার। 'প্যাঁচা
প্যাঁচানী' ছড়ায় সুকুমার জীবনে আপেক্ষিকতার প্রশ্নটিকে সামনে এনেছেন। প্যাঁচা
কণ্ঠস্বরের লালিত্যে মুগ্ধ প্যাঁচার কাছে তা বড়ে গুলাম আলী বা বেগম আকতারের
নয় প্যাঁচানীর কণ্ঠই তার কাছে মধুর। এমনিভাবে 'কাতুকুতুবুড়ো', 'শব্দকল্পদ্রু
'ঠিকানা', 'সাবধান', 'গল্পবলা', 'কাঁদুনে', 'ভুতুড়েখেলা', 'হাতগণনা', 'হুলোরগা
'পালোয়ান', 'ফসকে গেল', 'নোট বই' প্রভৃতি ছড়ায় রয়েছে সমকালীন জীবন
বাস্তবতার মিসেলে অসঙ্গতি ও অবাস্তব কল্পনার সঙ্গে কৌতুকরসের মিশ্রণে বহুদর্শী
ভরা আনন্দময় এক জগৎ। ছড়াগুলো পাঠান্তে পাঠকের মধ্যে অনেকগুলো ঘ
একসংগে ঘটতে সাহায্য করে। কোনোটির মধ্যে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমা
কোনোটিতে অনাবিল হেতুহীন খেয়ালভরা আনন্দরস যেমন আছে তেমনি পাশাপ
আছে তীব্র পলিটিক্যাল স্যাটায়ার, সামাজিক অসঙ্গতি; ব্যাখ্যাতীত রসে জারিত হ
মিষ্টি মোড়কে রাখা তেতো ওষুধের মতো। প্রত্যক্ষ ভাবনা থেকে, সাংস্কৃতিক অভি
থেকে, সাংসারিক বাস্তব জ্ঞান থেকে সর্বোপরি নিজের বোধের মধ্য দিয়ে তিনি উন্মো
করতে চেয়েছেন মূল সত্যকথনকে।

আবোল তাবোলকে সুকুমার রায় খেয়ালরসের বই বলেছেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত জী
আর রচনাকীর্তি মিলিয়ে নিয়ে আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এ
প্রবহমান খেয়ালরস কল্পখেয়ালের নয়, সমাজ ও জীবনের ভূয়োদর্শন থেকে এর জ
'ছড়া লেখার উপকরণ আসে সমসাময়িক ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে।' (অন্নদাশঙ্কর
১৯৯৫ : ২৪)। এই মন্তব্যে সুকুমার রায়ের সমাজসচেতনতা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভ

স্বচ্ছতা স্বীকৃত হয়ে যায়। তিনি বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা পেরিয়ে চিন্তাশক্তির ওপারে কল্পনা-প্রতিভার দৌরাত্ম্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটি কেবল তাঁর ছড়ার সাধারণ কুললক্ষণ নয়, তাঁর সমগ্র শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য। তবে তাঁর ছড়া-সৃষ্টির পেছনে জড়িয়ে থাকা সামাজিক পটভূমিকে লক্ষ্যভেদ হিসেবে গণ্য করা মোটেই অবান্তর নয়; শব্দকৌতুকের উদ্ভ্রান্ত ছটায় ছড়াকে তিনি একেবারে কোনো বিশৃঙ্খল নিরর্থকতার দিকেও চালিত করেননি। তিনি আমাদের ফেরাতে চেয়েছেন জীবনের নিরেট বাস্তবতার উল্টোমুখী খেয়ালখুশির স্ফূর্তিভরা ছাঁদে। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে উপনিবেশিত বাস্তবতায় এক সাংস্কৃতিক খিচুড়িপর্বে 'মেঘ মুলুকের ঝাপসা রাতে রামধনুকের আবছায়া'তে যে প্রতিমান জগৎ তিনি আনন্দে-খেয়ালে পেরিয়েছেন, 'হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা, নাইরে বাঁধন নাইরে বাঁধা'– কঠিন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা মানুষের মূঢ়তার গণ্ডি পেরিয়ে স্থাপন করেছেন এক কল্পময়-আনন্দময় পৃথিবী।

হ য ব র ল : নাবালক-আখ্যানে সাবালক-দুনিয়া

'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট এবং যাহা অসম্ভব' তাদেরও সৃষ্টির পেছনে একটি জটিল প্রক্রিয়া আছে, সুকুমার-কথিত সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লেখকের নানা অভিজ্ঞতা, সময় ও সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং ফলত বিচিত্র কূটাভাসের সমাবেশ-সংশ্লিষ্ট সৃজনভাবনা– জুড়ে থাকে নানা দৃষ্টিকোণে বিধৃত আত্মবিদারক দ্বিবাচনিকতা। উনিশ শতকে উপনিবেশিত সমাজ-সভ্যতায় ব্যক্তি যখন 'অপর' অস্তিত্বে নির্বাসিত ও প্রত্যাখ্যাত, পিছুটানে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন মুখোশাবৃত সমাজের অভ্যাস-জর্জর যথাপ্রাপ্ত বেশি চেনা আদলকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবল তাড়নায় নিজেদের অস্তিত্বের আশ্রয়কে ভেঙে ফেলতে চান; আত্ম-উন্মোচনের সূত্রে অবচেতনায় মথিত সামাজিক অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এ কথা ঠিক যে, যুক্তির বাঁধাধরা নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করতেই সুকুমার আজগুবি উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন– ননসেন্স রাইমের প্রাথমিক শর্ত এটাই। আমেরিকান কবি ও তাত্ত্বিক সুজান স্টুয়ার্ডের মতে, 'Nonsense is a means of seeing the world alright.' (Lyon Arabella 1998 : 120)। অর্থাৎ ননসেন্স ভার্সে কল্পনাশক্তি যুক্তির কাঠিন্যকে চুরমার করে দিয়ে অনাবিল হাসি-আনন্দের চেনা জগৎ বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণকল্পে নতুন ভাষ্য নিয়ে, ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'ননসেন্স আর কিছুই নয়; আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহ ঘোষণা। সুকুমার রায়ের জগৎটাতেও এই বিদ্রোহের আভাস দেখা যায়।' (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ২৬)। শিল্পবিপ্লবের পরে যন্ত্রযুগের অনতিক্রান্ত চক্রব্যূহ যখন ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্যে সব মানুষকে সমান্তরাল বর্গের প্রাধান্যে গ্রাস করতে তৎপর তখন এডওয়ার্ড লিয়র উদ্ভট কবিতা সৃষ্টির মধ্যে অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জোনাথন সুইফ্‌ট (১৬৬৭-১৭৪৫) গ্যালিভারের ভ্রমণের উদ্ভট কাহিনিগুলোর (১৭১৬) মধ্য দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের

তথাকথিত হিতবাদী উপযোগিতাবাদের কদাচার ও ভণ্ডামিকে। একই মানসিকতার স্বতঃসিদ্ধতায় স্রোতের উপান্তে দাঁড়িয়ে সুকুমার রায় রচনা করেন *হ য ব র ল*সহ অন্যান্য রচনা। পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন অস্বাভাবিক, চারদিকে আদর্শচ্যুতির আয়োজন, জীবনযাপন উদ্ভট-কিম্ভূতকিমাকার, তখন অসঙ্গতির যোগ্য বাহন হিসেবে একটা থাপ্পড়, একটা মোক্ষম ঘায়েল করা ধাক্কা দিতে তিনি *হ য ব র ল*-এ প্রতীক ও রূপকের সাদৃশ্যে অ্যানিমেল মোটিফে ফ্যান্টাসির এক অসম্ভবের দুনিয়ার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন। তাঁর নিবিড় বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সঙ্গে যথোচিত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ব্যবহারে তাঁর ছড়াগ্রন্থ *আবোল তাবোল*[৩]-এ অদ্ভুত সব জীবের কল্পরূপে নানা তত্ত্বের ইঙ্গিত যেমন আছে তেমনি *হ য ব র ল*-তেও বেড়াল, কাক, ছাগল, কুমির প্রভৃতি প্রাণী এবং উধো-বুধো, হিজিবিজবিজ প্রভৃতি উদ্ভট-কল্প মানুষের বিচিত্র মিছিলের ভিড়ে এবং কল্পজগতের আচ্ছাদনের আড়ালে জীবন ও বাস্তবতার চেনা জগৎ প্রতিমান-সন্দর্ভের নতুন তাৎপর্যে বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

'অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো'– এই কারিগরি বা বাঁধুনি সম্বন্ধে সুকুমার গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন। কেননা তাঁর উদ্ভট কল্প-খেয়ালের প্রাকৃতায়ন জনসংযোগের বিস্মৃত প্রকরণরূপে একেবারে কোনো বিশৃঙ্খল নিরর্থকতার দিকে নিয়ে যায় না– সমাজ-অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য বাংলা সাহিত্যে এর আগে থেকেই কম-বেশি ননসেন্স ভাবে শিশুসাহিত্য রচিত হলেও সুকুমার তাঁর রচনায় বালকের ছদ্মবেশে কল্পকথার প্রতীকী ভুবনে পরাবাস্তব-ভাবনার সাবালকত্ব দেখিয়েছেন। সুকুমার সেনের ভাষায়–

> শিশুসাহিত্যিকের অন্তরালে ছিলেন প্রকৃত বয়স্ক সাহিত্যিক। উদ্ভট নাবালক-সাবালকের মধ্যবর্তী মূঢ়তার গণ্ডি ভেঙে, নিয়ম-বেনিয়মের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে এক বিচিত্র সরল সত্যের জগতে টেনে নিয়ে গেছেন মানুষকে। তিনি এবং অকাট্য মিল দিয়ে তিনি যেমন শব্দের খিল, জংধরা ভাষার দরজা খুলে দিয়েছেন, তেমনি তার আবোল তাবোল, উলটাদর্শন, উদ্ভট চিত্রকল্পমালা ননসেন্সের চিকের পেছনে দাঁড়িয়ে এমন এক জীবনকে তুলে ধরেছেন, যা সব বয়সের সম সময়ের– চিরকালের। (সুকুমার সেন ১৯৯৭: ১৬৪)

হ য ব র ল গ্রন্থে খেয়ালরস শুধু নয়, প্রচলিত নীতি ও সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে নাবালক-সাবালকের গণ্ডি পেরিয়ে শিশু-মনস্তত্ত্বের ছাঁচে সর্বজনীনতার স্বাদ পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন সুকুমার। এই গ্রন্থে সংগঠিত বিভিন্ন আজগুবি ঘটনার স্রোতে অসম্ভব ও অবিশ্বাসের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও শিশু পাঠক যেমন বাঁধাধরা বাস্তবের বাইরে নতুন এক কল্পনার পৃথিবী নির্মাণ করে নেয়, তেমনি বয়স্ক পাঠক সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বাস-সংস্কারের অচলায়তন ভেঙে দিয়ে উদ্ভট কল্পনার আদলে প্রতিমান বাস্তব- রহস্যের অন্তর্নিহিত সত্য ও তথ্য উন্মোচনে সচেষ্ট হন।[৪] এই দুই শ্রেণির পাঠকের কাছেই সুকুমার বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হয়ে উঠলেও প্রত্যেকই যথাসম্ভব

মেধা ও হৃদয়ের আবহমান যুগলবন্দির স্বারূপ্যে নতুন অদ্ভুত রস-ব্যঞ্জনে আপ্যায়িত হয়। শিল্প-প্রকরণের নির্যাস বিষয়ে এ ক্ষেত্রে গিয়র্গ লুকাসের মন্তব্যের উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য, 'A specific form of a genre must be based upon a specific truth of life.' অর্থাৎ শিল্পের মূলধারার উপযোগিতা ও বিন্যাস জিজ্ঞাসু আর সংবেদনশীল হয়ে ওঠে 'truth of life' বা অন্তর্বিত্তের সত্যমূলকতায়। (তপোধীর ১৯৯৯ : ৪৪)। আর 'তাই *হ য ব র ল* গ্রন্থের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের আড়ালে লেখকের যে অভিপ্রায় মুদ্রিত তার স্বরূপ অন্বেষণে অগ্রসর হলে এর রূপ ও রসের অনুধাবন কিছুটা হয়তো বাধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু জীবন ও শিল্পের সম্পর্ক নিরূপণের এই প্রয়াস থেকে আমরা সুকুমার রায়কেই অন্যভাবে ধারন করতে শিখি।' (তারেক রেজা ২০১৬ : ৮৮)

হ য ব র ল-র পরিকল্পনার সঙ্গে লুইস ক্যারলের *Alice in Wonderland* বইয়ের কল্পনাগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[৫] সত্যজিৎ রায়ের মতে–

> বাংলা গদ্যে ননসেন্স এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানেও সেই ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সেই স্বপ্ন, সেই সব চেনা-আধচেনা জানোয়ার ও মানুষ চরিত্রের মিছিল, ভাষা নিয়ে, সামাজিক আচার নিয়ে, আইন-কানুন নিয়ে সেই তির্যক রসিকতা, আর সবশেষে ঘুম ভেঙে স্বপ্নের জগৎ থেকে সেই বাস্তবে ফিরে আসা। তফাৎ এই যে, *হ য ব র ল*-র মেজাজে একেবারে ষোলআনা বাঙালি, এতই বাঙালি যে, অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনাই করা যায় না। (সত্যজিৎ রায় ২০০৯ : ভূমিকাংশ)

ভিক্টোরিয়া যুগের নিয়মনিষ্ঠা, যান্ত্রিকতাবোধ, খ্রিস্টীয় গোঁড়া রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গড়ে উঠেছিল ক্যারলের যে ফ্যান্টাসির জগৎ, একইভাবে তা উপনিবেশিত মানসিকতায় আচ্ছন্ন শিক্ষিত বাঙালির পোশাকি ভব্যতা, সাহিত্যরুচির সীমাবদ্ধতা, আত্মরতি-মগ্নতা প্রভৃতি প্রাধান্য বিস্তারকারী জীবনচর্যাকে সুকুমার ব্যঙ্গ ও শ্লেষময় তির্যক দৃষ্টিতে দেখতে উদ্বুদ্ধ হন। ক্যারলের মতোই তিনি শিশুসাহিত্যের মোড়কে ননসেন্সের সাহায্যে সমাজের মিথ্যা-তস্কর-ছদ্ম দৃষ্টিকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। *হ য ব র ল*-এ অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছে। কোনোটার মধ্যে আছে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমানুষী আর অনাবিল হেতুহীন উচ্ছ্বলিত কৌতুক। পাশাপাশি নাগরিক-চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্য-ভনিতার মিথ্যা অহং-এর প্রতি বর্ষিত হয়েছে তীব্র স্যাটায়ার– মিষ্টি মোড়কে রাখা তেতো ওষুধের মতো।

বাস্তব পৃথিবীতে জীবনে-ভাবনায়-কর্মে যে বিচিত্র অসঙ্গতি *হ য ব র ল*-র কাহিনিতে সুকুমার ধরতে চেয়েছেন। বাস্তবকে সরলপথে বা বিপরীত দিক থেকে খুঁজে নিতে এখানে যে সমস্ত প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে, তারা প্রায়ই সব কাল্পনিক জগতের। বেড়াল, দাঁড়কাক, দেড়হাত লম্বা উধো, উধোর বোঝাসহ বুধো, হিজিবিজবিজ, ছাগল, ন্যাড়া, সজারু, কুমির, কোলাব্যাঙ, হুতোম প্যাঁচা, ছুঁচো, শেয়াল– এই তেরোটি চিরচেনা চরিত্রের বিন্যাসের আড়ালে ধরা পড়েছে আমাদের চির-পরিচিত মুখোশধারী পৃথিবী।

বেড়ালের 'ম্যাও' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে কাহিনির গতিপথ। এ বেড় আবার অন্যদের মতো নয়, রূপান্তরবাদের রহস্যময়তার মাধ্যমে এর জন্ম। চৈ মধ্যদুপুরে গাছতলায় শুয়ে থাকা ক্লান্ত পথিকের পাশে রাখা ঘামে ভেজা রুমালটি হ 'ম্যাও' শব্দে বিড়ালে রূপান্তর শিশুচিত্তে সহজেই বিস্ময়ের কপাট খুলে দেয়। অ মানুষের জীবনে যে বিচিত্র রকমের অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত যুক্তি-শৃঙ্খলাকে চ্যালেঞ্জ ক চলেছে তারই বিকল্প বাস্তব ফুটে উঠেছে ঘটনাটিতে। ফলে প্রকৃত বাস্তবতার স সমান্তরাল প্রতীকধর্মী ছদ্ম-বাস্তবতার রূপকল্পে স্বীকৃত যুক্তি-কাঠামোকে একেবা তছনছ করে দিয়ে রুমাল হয়ে যায় বেড়াল। বেড়াল নিজের পরিচয়কে পাকাপে করতে যুক্তি দেখায়, 'ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁস। তো হামেশাই হচ্ছে' (সুকুমার রায় ২০০৭ : ২০৪)। ফলে ঘটমান বাস্তবের স সমান্তরাল মিথ্যা বাস্তবের গ্রন্থনাকে অবারিত করতে নিজের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলে এই মুহূর্তে সে বেড়াল, পর মুহূর্তে সে চন্দ্রবিন্দু, পূর্বমুহূর্তে সে ছিল রুমাল। ফ অন্তঃসারহীন যুক্তির চাতুর্যে কল্পনা ও বাস্তবের দ্বিবাচনিকতায় কাকে বলবো বেড়া কাকে বললো রুমাল আর কাকেই বা বলবো চন্দ্রবিন্দু! 'চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের রুমালের মা– হল চশমা'– ব্যাকরণের কোন নিয়মে কী কী বর্ণে মিলে হলো চশম কোনোটারই হিসেব আমাদের স্বীকৃত যুক্তি-কাঠামোয় মেলে না। এরপর গরম এড়া তিব্বত যাওয়ার পরামর্শে বেড়ালের স্বভাবসিদ্ধ চালিয়াতি, 'কলকেত্তা, ডায়মন্ড হারব রানাঘাট, তিব্বত– ব্যাস! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ, গেলেই হলো'! (২০০ ২০৫)। তিব্বত যাত্রাপথের দিশা সম্পর্কে অবগত অভিজ্ঞ গেছোদাতার অবস্থান নি তৈরি হয়েছে গোলক ধাঁ-ধাঁ। এখন জানা গেল, গেছোদাদার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তি মতিহারি পৌঁছুতে পৌঁছুতে গেছোদাদা চলে যাবেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গে দেখা যাবে তিনি চলে গিয়েছেন কাশিমবাজার– এই লুকোচুরি খেলা চলতেই থাক এরপর স্বভাবসিদ্ধ মিথ্যা ভড়ং-এর দীপ্তচালে কথককে বোকা বানিয়ে বেড়া 'ফুসকায়িত' হাসি দিয়ে লেজ উচিয়ে পগার পার হওয়ার মধ্য দিয়ে যথার্থ হয়ে উনিশ শতকের বাংলার নব-উদ্ভূত ভুইফোঁড় বিত্তশালী 'বাবু'শ্রেণির সামাজিক অভ্যাস তাদের মিথ্যা-ভড়ং বা বাগাড়ম্বরময় জীবনযাপন, চাল-চলন। সুকুমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূ কশাঘাতে সেই কৃত্রিম অভ্যাস ও আন্তরিকতাবিহীন বাহুল্যকে আঘাত করেছেন।

Alice in Wonderland-এ দিনের সময় জানা যায় ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের মাপে ন দিনের হিসেবের মধ্যেই সমস্ত ঘটনার গতিপথ– সময় যেন সেখানে থেমে আ সমকালীন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে জট-পাকানো *Ethos* নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে *Alice*- *হ য ব র ল*-এ এরপর আসরে আবির্ভূত কাকের সঙ্গে কথক বালকের সময় হিসেবের বোঝাপড়াটা অন্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কথকের দেশে 'সময়ের নেই' শুনে হিসাববিশারদ কাক 'ভারি অবাক হয়ে যায়'। সমকালে সুকুমার

চারপাশের সেইসব কোজো লোকদের Time is money-র ধাঁ-ধাঁয় সবজান্তা তত্ত্বজ্ঞানীদের মতো নির্বিশেষ কর্তৃত্বের অবয়বে ক্ষমতার যথার্থ্যকে সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়ার অভ্যাসকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। কাক তাই বলে ওঠে, 'আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করার যো নেই।' (২০০৭ : ২০৭) কাকের এই গুরুগম্ভীর ভাষণের মাধ্যমে সময়জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের নির্বিকল্প ফিরিস্তি দিয়ে আমাদের অতিচেতন-আধোচেতন দৈনন্দিন পৃথিবী কীভাবে তত্ত্বজ্ঞানীদের হাতিয়ারে পরিণত হয় তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন সুকুমার। সময়ের বাজে খরচ একদমই পছন্দ নয় বলেই তত্ত্বজ্ঞানী কাক আবার হিসেবে মনোযোগ দেয়। তবে তার হিসেবেরও রকমফের আছে–'খাটি' এবং 'জল মেশানো'। তাই কাকের বয়ানে সময়জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের নীতিনিষ্ঠ ফিরিস্তি সত্ত্বেও তার উপদেশ অবশেষে গলাবাজিতে পর্যবসিত হয়েছে। কেননা সে নিজেও সময়ের অপচয় করেছে। উচ্চবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি দেড় হাতি, লম্বা দাঁড়ি, টাক মাথা উধো বুড়ো কাকের নিয়োগকর্তা হিসেবে কাককে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'উনিশ দিন পার হয়ে গেল এখনও হিসেবটা হয়ে উঠল না।' (২০০৭ : ২০৭)। এই উনিশ থেকে ক্রমশ বিশ, একুশ, বাইশ, তেইশ, সাড়ে তেইশের দিকে এগিয়ে চলা এক বিরামহীন নিলামের ডাক, যেন উঞ্চিপরা কেজো মানুষের এক শোভাযাত্রা। আবার দরজির ফিতে দিয়ে কথককে পরিমাপ করা, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।' (২০০ : ২০৭)-তেও বিবৃত হয়েছে সকলকে এক কাতারে বিচারের নীতি। পুরোনো একটা ফিতায় সমস্ত দাগ মুছে নিয়ে কেবল ছাব্বিশ ইঞ্চি দাগটিই অবশিষ্ট আকারে চিহ্নিত থাকায় সকল পরিমাপে এই অবিশ্বাস্য উল্লেখ যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে সকলে উর্দিপরা বা স্ট্রেটজ্যাকেট পরা একরকম দেখতে অজস্র মানুষের এক শোভাযাত্রা তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে বহুক্ষেত্রেই একজন হুবহু আরেকজনের নকল বা বহুজনের মধ্যে নিজস্বতা হারানো একজন। শিল্পবিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে যন্ত্রযুগের সর্বগ্রাসী দাপটে গণতন্ত্রের নামে আওয়াজ উঠেছিল সকলে সমান, বোতাম আঁটা ইস্ত্রিকরা রজকপোষ্য জামার তলায় এক ছাঁটে, এক মাপে– ঠিক যেন কলে তৈরি করা জীব। কনভেয়ার বেল্ট থেকে যেমন সব জিনিস একইরকম বেরিয়ে আসে, হুবহু অবিকল একরকম। They নামক এই অগণন সংখ্যা তৈরির বিরুদ্ধে ক্যারল ছিলেন মহা খাপ্পা। আর তাই যুক্তি আর জ্ঞানকাণ্ডকে উল্টে দিয়ে তৈরি করেছেন ব্যঙ্গ-কৌতুকের বাতাবরণ। সুকুমার রায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কল্পনা কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না, 'ছুটলে কথা থামায় কে/ আজকে ঠেকায় আমায় কে'– তৈরি হয় গতি, নানারকম মোচড়, জটপাকানো বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও নতুন চেনা অধিবাস্তব। বাস্তববিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও সংযোগ-অসংযোগের প্রতিস্পর্ধী নিছক আমোদ বা 'অবিমিশ্র হাস্যরসের' মহল্লা পেরিয়ে সাবয়ব হয়ে ওঠে সমাজেরই অনর্থ আর অসঙ্গতির কেন্দ্রগুলো। যেমন–

> বুড়ো বললো, 'তাহলে লিখে নাও– ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'
> আমি বললাম, 'দুৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'
> বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়তি না কমতি?'
> আমি বললাম, 'সে আবার কী??'
> বুড়ো বলল, 'বয়সটা এখন বাড়ছে না কমছে?'
> আমি বললাম, 'সে আবার কমবে কী?'
> বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি?'
> 'তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখবো বয়সটা বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!' (২০০৭ : ২০৭)

শরীরের ওজন পরিমাপ বিষয়ে বুড়োর ভাষ্যকে নিছক রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করলে বয়স সম্পর্কে তার বক্তব্য আপাত যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সামর্থ্যে পাল্টা বয়া যৌক্তিক হয়ে ওঠে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্মগ্রহণ অন্তে বহমান জীবনপ্রবাহে প্রতিমুহূর্তে নির্ধারিত জীবন-পুঁজি থেকে সময় হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বয়স কমে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বয়স বাড়া বা কমার এই দার্শনিক প্রমূল্যের বয়া Illogicality কে অস্ত্র করে এখানে আপাত যুক্তিকে আক্রমণ তথা যৌক্তিকতাবাদী বীক্ষণের প্রখর সমালোচনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক অর্থ ও বিত্ত কৌলিন্যের জোরে সমাজজীবনে প্রচুর মত ও পথের তত্ত্ব ও ধারা তৈরি হয়েছিল নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শকে তারা যুক্তির সমীকরণে প্রতিমান-সন্দর্ভে পরিণত করতে তৎপর হয়েছিল। ফলে অন্তহীন-অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জগতে বাস্তবতার চলতি ভাষ্যগুলোকে নানাভাবে ওলটপালট করে তৈরি হয়েছিল সমাজের উচ্চবর্গীয় শ্রেণি আত্মতৃপ্তি, নিশ্চয়জ্ঞান ও অহমিকার প্রতিষেধক। এই জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বাস্তবতার নানা অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাস্তবের বাড়িয়ে তোলা, ফেনিয়ে তোলা নানা বিজ্ঞাপন। হিসাববিশারদ কাকের ব্যক্তিগত প্রচার প্রচারণায় তৈরি 'হ্যান্ডবিল' বর্তমান বস্তুবিশ্বের চটকদারিত্বকে কটাক্ষ করা হয়েছে আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন আমাদের মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ভেজালের আড়ম্বরে আসল আর নকলের পার্থক্য করাই এখন কঠিন। বিজ্ঞাপনের জগ পুরোটাই প্রতারণার মোড়কে আচ্ছাদিত। কারণ, অধর্মে যাদের অগাধ আস্থা তাদেরকেই বেশি বেশি ধর্মের কথা বলতে হয়। (তারেক রেজা ২০১৬ : ৯২-৯৩ সুকুমার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ননসেন্সের মুখোশের আড়ালে আমাদে চিরপরিচিত অন্তঃসারশূন্য জগৎকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। আবার 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই নি'র মতো আত্মস্বীকৃতির বিজ্ঞাপনেও এ বিষয়ে কঠো সাবধানতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে–

> আমরা সনাতন বায়সবংশীয়, দাঁড়িকুলীন অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানা শ্রেণির পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না। (২০০৭ : ২০৮)

উনিশ শতকে নব্যসৃষ্ট অতীত-ঐতিহ্যহীন অভিজাতশ্রেণির হঠাৎপ্রাপ্ত বিত্তকৌলিন্যে জীবনযাপন ও জীবনাচরণে প্রতিফলিত অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারে ধরা পড়েছে সমকালীন বিশ্বাস-মূল্যবোধহীন কৃত্রিম মুখোশধারী জীবনধারা; কৃত্রিম অভ্যাস ও আন্তরিকতাবিহীন এক দর্পণ। এখানেই শেষ নয়, কাকের চূড়ান্ত হিসেবের মুসাবিদায় উল্লিখিত হয়েছে, 'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বেও অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কাবুলিওয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদি সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিংবা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়–' (২০০৭ : ২০৯)। মোঘল আমল থেকেই পরিচালিত কোর্ট-কাছারিতে উপস্থাপিত দলিল, চুক্তিনামা বা ডিক্রীজারি সংক্রান্ত বিষয়ে অযাচিত, অর্থহীন, দুর্বোধ্য সংস্কৃতঘেষা শব্দভারে আপাত অসঙ্গতির ক্রিয়া-জাত ভাবানুষঙ্গ মূল আখ্যানের বক্তব্যকে জটিল করে তোলার প্রথাগত রীতিকে আঘাত করেছেন সুকুমার। কিংবা ত্রৈরাশিক-ভগ্নাংশ বা 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে'র উদ্ভট খেয়ালি ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতাকে যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞানের অসামঞ্জ্যতাকে উল্টে দিয়ে নানারকম ব্যঙ্গের মোচড়ে খুলে দিতে চেয়েছেন সমকালীন বঙ্গ-সমাজের অনর্থ আর অসঙ্গতির কেন্দ্রগুলোকে। আর তাই, বাঙালি-উজ্জীবনের ঘোরে আচ্ছন্ন সর্বত্র সাধুশব্দ ব্যবহার, অহেতুক সমাসবদ্ধ শব্দরূপ-ধাতুরূপের বিশুদ্ধতার কড়াকড়ির বেড়াজাল ছিন্ন করে সুকুমার বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়া, উপখ্যান, প্রবচনের ভাষার সরল-পরিস্বচ্ছ রূপটিই অবলীলায় ধারণ করেছেন।

বাঙালিজীবনে ভাবনায় ও কর্মে বিচিত্র অসঙ্গতি আর এটিকেট মানা অস্বাভাবিকতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিজিবিজবিজ প্রসঙ্গে। গ্রন্থমধ্যে এর পরিচয় সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে, 'একটা জন্তু– মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না– খালি হাত পা ছুড়ে হাসছে, আর বলছে এই গেল গেল– নাড়ি ভুঁড়ি সব ফেটে গেল।' (২০০৭ : ২১০)। চরিত্রটি বহুমাত্রিক। সুকুমার অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রথমত, এর নামকরণ– 'হিজিবিজি' এবং 'বিজবিজ' শব্দের সংমিশ্রণে সংগঠিত হয়েছে নিরর্থকতা ও অস্পষ্টতাবোধক অর্থের দ্যোতনা। তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় *আবোল তাবোল*-এর অনেক ছড়ার সঙ্গে। 'গোফ চুরি', 'কাতুকুতু বুড়ো', 'লড়াই ক্ষ্যাপা', 'ছায়াবাজি', 'হাতুড়ে', 'টাশগরু', 'রামগরুড়ের ছানা' প্রভৃতি ছড়ায় প্রবহমান প্রচ্ছন্ন ভাবনাটাই খেলা করেছে হিজিবিজবিজ চরিত্রে। তবে স্বভাবের দিক থেকে অবোধ্য রামগরুড়ের ছানার একেবারে উল্টো ভাবনায় অবস্থান তার। বিচিত্র কারণে সে দুনিয়া ফাটিয়ে হাসে। কিছুই ঘটেনি, কিন্তু যা ঘটতে পারতো, সেইসব উদ্ভট-অস্বাভাবিক কথা ভেবে সে হাসিতে ফেটে পড়ে। 'পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত,আর

ডাঙার মাটি সব গুলিয়ে প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে–হোঃ হোঃ হো–' এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।' (২০০৭ : ২১০)। সভ্যসমাজের নিয়ম-কানুন, ভদ্রতা-সহবত সব ভাসিয়ে দিয়ে সে উদ্দাম হাসে। তার ভাবনায় বিচিত্র সব কল্পকাহিনির সমাবেশ, অসম্ভবকে সম্ভাবনার খেয়ালে আপাত অসঙ্গতির আড়ালে সব কেমন জট পাকিয়ে আছে, তার সদুত্তর মেলে না। *আবোল তাবোল*-এর এক স্থানে সুকুমার বলেন–

> শুনছি দাদা! ঐ যে হেথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
> সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
> শুনেছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
> চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে? (২০০৭ : ০৯)

উনিশ শতকে ভিক্টোরিয় নিয়মতান্ত্রিকতার আদলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কেতাদুরস্ত আদবকায়দায় সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, অসামঞ্জস্যতা স্থানভেদ-কালভেদে বা ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন পরিচয়ে নিত্য-নতুন ডাইমেনশন পায়, যা সমাজেরই ভেতরকার চাপা উগ্র টানাপোড়েন থেকে উঠে আসে। অরাজক অর্থলোলুপ ও ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তির বাগাড়ম্বর-আস্ফালনে চারিদিক প্রকম্পিত। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগে পুনর্বিন্যস্ত হয় জীবন ও জগতের প্রত্ন-ইতিহাস ও আন্তঃসম্পর্কের নানা পরম্পরা–বহুস্বরিক তাৎপর্যে নির্ধারিত সামাজিক বিধি-বিধান। হিজিবিজবিজের কথায়–

> আমার নাম হিজিবিজবিজ। আমার ভায়ের নাম হিজিবিজবিজ, আমার বাবার নাম হিজিবিজবিজ, আমার পিসের নাম হিজিবিজবিজ' –আমি বললাম 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিশুদ্ধ সবাই হিজিবিজবিজ।'
> সে আবার খানিক ভেবে বলল, 'তা তো নয়, আমার মামার নাম তকাই। আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেসোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই–'

এই কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যান্ত্রিক জীবনযাপনের উদ্দাম আগ্রাসনে সকলকে এক ছাঁচে ফেলে বিবেচনার মিথ্যা আড়ম্বর আর সৌখিন মজদুরির গোলকধাঁধাঁ; সাকার হয়ে ওঠে বাখতিন কথিত, uniqe and unified event of being-এর নিরাবয়ব অভিজ্ঞতাপুঞ্জ। (Bakhtin,1984 : 192)। ব্যঙ্গ ও তির্যক দৃষ্টির মাধ্যমে মানবচরিত্রের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন সমাজ-প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ব্যবচ্ছেদ করেছেন সুকুমার। শিবরাম চক্রবর্তী এবং সুকুমার রায় প্রসঙ্গে সমালোকের ভাষ্য–

> শিবরাম এবং বিশেষভাবে সুকুমার রায়ের লেখায় ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে চলে আত্ম-বিনির্মাণ। তাঁদের অন্তর আত্মবিদ্ধি ভেঙে দেয় শব্দব্যূহ, আখ্যানের ভেতরে অবারিত করে দেয় 'পালিয়ে যাবার মাঠ'। ... সমাজে যেসব বিধান অকাট্য বলে চালু, তাদের সম্পর্কে সন্দেহ ঘুচিয়ে তোলা, সন্দিহান করাই তাদের কাজ। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় যা প্রমাণিত বা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়, তার অন্তরস্থ গলদগুলো দেখায় তারা– আর এভাবেই উদ্ভটের মধ্যে আবিষ্কার করে বসে 'সত্য'। (শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩ : ৩২৪)

সুকুমার উদ্ভট-অসম্ভবের বাহনে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সরস পরিবেশনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে 'প্রকৃত' ও 'সম্ভব'-এর ধারণা দুই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনে বাস্তবরূপ পরিস্ফুট করেন, তখন তা হয়ে *ওঠে* বাস্তবের বিপ্রতীপ বা প্রতিমান রূপ নয়, একেবারে বাস্তবের বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত নগ্নরূপ। চারিদিকে নানামুখী বিপর্যস্ত বাস্তবের আয়োজন; চাকচিক্যময়, মেকি, ভণ্ডামিতে ভরপুর; সকলই unpredictable যা একান্তভাবেই চরিত্রের আচরণ, কল্পনার প্রকৃতি, ধরাবাঁধা বাচনরীতি ও বাচনরীতির নির্মোক। অর্থাৎ বাখতিন কথিত, 'To voices is the minimum for life, the minimum for existance.' (Bakhtin 1984 : 252)– সর্বজনীন উচ্চারণে ব্যক্ত হয়েছে অপরতার প্রত্যয় এবং অপরতার সঙ্গে দ্বিবাচনিকতার সত্য ভাষণ। এরপর আসরে উপস্থিত ছাগল নিজের পরিচয়ের ঢোল নিজেই বাজিয়ে জানায়, 'আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আমার নাম শ্রী ব্যাকরণ শিং, বি.এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরেজি লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা কোনটা খাওয়া যায় না তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্য বিশারদ।' (২০০৭ : ২১১)। গলায় সার্টিফিকেট ঝোলানো 'ব্যাকরণ শিং', 'খাদ্যবিশারদ' ছাগলের আপাত অবান্তর কথায় প্রতিভাত হয়ে *ওঠে* সমকালীন শিক্ষিত-পদস্থ অথচ অকর্মণ্য শ্রেণির প্রগল্‌ভতায় ভরা অহং ও আত্মপ্রচার এবং তা নির্মল হাস্যরসের উপজীব্য হয়ে ওঠে শিষ্টসমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ও আচার-আচরণের মধ্যে নিত্য আধিপত্যের লৌকিক আখ্যানের অসংলগ্নতায়। পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন উদ্ভট, অসঙ্গতির নানারকম মোচড়ে দিশেহারা তখন এক যুক্তিপট থেকে আরেক যুক্তিপটে সরে গিয়ে, পরখ করার বদলে যুক্তি দিয়ে, যাচাই করার বদলে নিশ্চেষ্ট ও নিরঙ্কুশভাবে সবকিছু মেনে নেওয়াই হলো এ যুগের সত্যপ্রকাশকদের অভ্যাস।

সুকুমার রায় *হ য ব র ল*-এর রম্যগদ্যের মাঝখানে গানের আবহে ঝলক দিয়ে উঠেছেন নেড়া চরিত্রের মাধ্যমে। 'যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পাজামা পরা' নেড়ামাথার একমাত্র এই মানব চরিত্রটি কথকের ভাষায় 'বেহায়া' এবং তার কথা শুনলে 'গা জ্বলে যায়'। তার গান না শুনতে চাইলেও জোর করে গান শোনাতে 'কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান' করে বলতে লাগল, 'রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?' (২০০৭ : ২১৩)। তবে গায়ক নেড়ার গাওয়া গানগুলোতে প্রবাহিত হয়েছে ছড়ায়-ছন্দের আরাম আর আনন্দ অবগাহনের তৃপ্তি। সুকুমারীয় ননসেন্সের একান্ত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই গানগুলোর ব্যঞ্জনা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমাদের নিয়ে যায় স্বপ্নঝরা কৈশোরে। নেড়ার চিকন সরু গলায়, 'লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ'- এই একটি মাত্র পদ একে একে দশবার গাওয়ার রীতিতে ভারতীয় শাস্ত্রসংগীত-ঐতিহ্যের আবহ ইঙ্গিতবহ হয়ে *ওঠে* হ

য ব র ল-র নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে আমাদের চিন্তাচেতনা, বোধ-বুদ্ধি, মূল্যবোধের ওলটপালট সকলই একের পর এক উদ্ভট চিত্রকল্পমালায় প্রকাশিত হয়ে চলে। 'শিখিপাখার গানে' প্রকাশিত হয়েছে–

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলোভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে
সরু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে। (২০০৭ : ২১৩)

মাথামুণ্ডহীন এই গানের নিরর্থকতা ও অস্পষ্টবোধকতায় 'গানটা ভারি শক্ত' বিবেচিত হলেও মেজাজটা একেবারেই নির্ভেজাল আনন্দের। উৎসে ফেরা তুমুল আবেগে যতটা সম্ভব তৎসম শব্দের উচ্ছেদ ঘটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে দেশজ শব্দের নিবিড় আয়োজন। আবার সাহিত্যে অধিকারবোধের প্রশ্ন এড়িয়ে সুকুমার শব্দসম্ভারকে নিয়ত জড়িয়েছেন স্ব-উদ্ভাবিত শব্দোৎসবে। ফলে মর্জিমাফিক বিন্যাস-সংহতির মধুর বন্ধনে ঝলমল করে উঠেছে শব্দের আতশবাজি। *সে*-তে রবীন্দ্রনাথ সর্তক করে বলেছেন, 'অদ্ভুত কথা বলার মধ্যেও কারিগরি থাকা চাই।' আমাদের পরিচিত দিনযাপনের বাইরে, 'এলোমেলো অসম্ভব তো সেই বানাতে পারে', যার রয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহার-উপযোগী ভাষার ওজস্বীতাজ্ঞান। এ ব্রতযাত্রায় নেড়ার মুখে পরবর্তী গান–

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু
আজকে রাতে দেখবো একটা মজারু।
আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি
দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি। ... (২০০৭ : ২১৩-২১৪)

জয়বাবা ফেলুনাথ চলচিত্রে সত্যজিৎ রায় এই গানটিকে সময়োপযোগী যাত্রায় প্রয়োগ করে রহস্যের এক আবহ নির্মাণ করেছেন। গানের আবহে এই শিশুতোষ রচনায় সুকুমার মজার কিছু শব্দের প্রয়োগ-সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন। যাতে একজন ছড়াকারের অনুপম কীর্তির সফলতা উন্মোচিত হয়েছে। কথকতার মেজাজে ভদ্রভাষার বদ্ধতা ভেঙে দেশজ-চলিত শব্দের বিন্যাস-সংহতি লেখাকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে *হ য ব র ল*সহ সুকুমারের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে।

'সামাজিক পৃথিবীতে প্রায়ই যে বিচারের নামে প্রহসন হয়, তা কৌতুকের সঙ্গে দেখানো হয়েছে' *হ য ব র ল*-র কাহিনির এই পর্যায়ে। (সোমদত্তা ঘোষ ২০১৭ : ১৫৩) 'বিচারের নামে প্রহসন' নয় বরং বলা যায় 'বিচার বিচার খেলা'র কৌতুকপ্রিয়তা উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। সুকুমার রায় লুইস ক্যারলের *Alice in Wonderland*-এর

বিচার বিষয়ক কবিতার 'বিচার' নামে অনুবাদ করেছিলেন, যার ছায়ায় তৈরি হয়েছে *হ য ব র ল*-র বিচারসভা। সেই বিচারসভায় আছে 'ফোৎ ফোৎ করে' কান্নারত সজারু, শামলাপারা কুমির, 'তকমা আটা পাগড়ি বাঁধা' কোলাব্যাঙ, 'কালো ঝোললা পরা' বিচারক হুতোম প্যাঁচা। বিচারককে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকা মস্ত ছুঁচো, উকিলদের প্রতীভূ শ্যামলা মাথার ধূর্ত শেয়াল, নেড়া এবং হিজিবিজবিজ। 'কোলাব্যাঙ রুল উচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল-মানহানির মকদ্দমা।' (২০০৭ : ২১৪) 'ঘোলা ঘোলা চোখ করে তাকিয়েই তক্ষণি আবার চোখ বুজে' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বিচারক প্যাঁচা হুকুম দিলেন, 'নালিশ বাতলাও'। (২০০৭ : ২১৪-১৫) বলতেই আসামীপক্ষের উকিল কুমির অনেক কষ্টে 'চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খামচিয়ে' জল বের করে (Crocodial tear বা কুম্ভীরাশ্রু অর্থাৎ চতুরতাপূর্ণ কান্না– অর্থ নির্দয়তা) 'কাঁদো কাঁদো মুখ করে' 'সর্দিবসা মোটা গলায়' বলতে শুরু করে, 'ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে? মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার যথা– মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে। সুতরাং বিষয়টা একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।' (২০০৭ : ২১৫) এটুকু বলতেই বিবাদী পক্ষের উকিল শেয়াল 'তড়াক করে লাফিয়ে উঠে' এ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'হুজুর কচুঁ অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুটকুট করে। কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক থুঃ'। (২০০৭ : ২১৫) মামলা সম্পর্কে চূড়ান্ত দলিল-দস্তাবেজ খুঁজতেই কুমির নেড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে পড়তে শুরু করে। একে একে পড়তে থাকে উদ্ভট, অর্থহীন, হেয়ালি ভাবসংবলিত বিচিত্র বিষয়-আহরিত ছড়া, যার সঙ্গে এই মোকদ্দমার কোনো সম্পর্ক নেই। সুকুমার শিশুচিত্তের কৌতূহলের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের বাস্তববোধ ও চিন্তাশীল বিবেচনাবোধকে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। ওটা নয় বলে কুমির আরেকটি কাগজ বের করে পড়তে শুরু করে–

> চাঁদনি রাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজনা রে–
> থ্যাঁৎলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ ভোজ মারে।
> চালতা গাছে আলতা পরা নাক ঝোলানো শাঁকচুনি
> মকড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, আমায় তো কেঁউ ডাঁকছনি!
> মুণ্ড ঝোলা উলটোঝুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে
> বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংশ খাব তুলতুলে। (২০০৭ : ২১৫)

এই ছড়াটিতেও মোকদ্দমা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই– আছে হেয়ালি, দুর্বোধ্য, অর্থহীন ভাষার মোচড়। নেড়ার গানের কাগজের তাড়া থেকে এক একটা কাগজ নিয়ে পড়তে থাকে, 'দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল', 'নিঝুম নিশুত রাতে একা শুয়ে তোতালাতে, খালি খালি খিদে কেন পায় রে?', 'রামভজনের গিন্নীটা, বাপরে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্ঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম' ইত্যাদি। বোঝা

যাচ্ছে মামলা ঠিক পথে এগুচ্ছে না, অনর্থক বিষয়ের অবতারণায় শুনানীকে অহেতুক প্রলম্বিত করা হচ্ছে। মামলার শুনানীতে এসবের কোনো উপযোগিতা না থাকলে কার্যকারণসম্পর্কহীন বিষয়ানুষঙ্গের অদ্ভুত কৌতুকরস বিচিত্র শব্দ ও ছন্দের খেলা শিশুচিত্তে আনন্দ সঞ্চারের সংযোগ-সেতু তৈরি হয়েছে। যাতে বিচিত্র মনোমুগ্ধক বিষয়ের অবতারণায় শিশুমন মোকদ্দমার জটিল ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল আনন্দে মন ভাসানোর সুযোগ পেয়েছে। কুমির আরো একটি কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে থাকে–

> খুস খুসে কাশি ঘুষঘুষে জ্বর, ফুসফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর
> মাজরাতে ব্যাথা, পাঁজরাতে বাত আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাৎ (২০০৭ : ২১৬)

উকিলের এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় (নাকি ইচ্ছাকৃত প্রলম্বনের দুর্বুদ্ধিতায়) সজারু বিপন্ন বোধ করে। 'হায় হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল। কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না।' অবশেষে সাক্ষীর প্রয়োজনে সাক্ষ্য দিতে বাদুড় গোপালকে (সাক্ষী গোপাল!) খুঁজে পাওয়া গেল না। কুমির চারআনা পয়সার বিনিময়ে হিজিবিজবিজকে সাক্ষী দিতে রাজি করায়। কিন্তু শত শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পরেও এবং মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার সামূহিক বিপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেও হিজিবিজবিজ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সবকিছু ওলটপালট করে ফেলে। অবশেষে মোকদ্দমা সম্পর্কে জানতে শিয়ালের প্রশ্নের জবাবে হিজিবিজবিজ বলে–

> তা আর জানিনে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমায়, প্যাঁচা বলল, 'কক্ষণো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখের ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' হিজিবিজবিজ বলল 'আরও অনেক জজ দেখেছি তাদের সকলের চোখের ব্যারাম। বলেই সে ফ্যাক ফ্যাক করে ভয়ানক হাসতে লাগল।' (২০০৭ : ২১৭)

নিদ্রাচ্ছন্ন বিচারকের দৃষ্টান্ত হিসেবে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬৫) নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চপরিকল্পনায়, 'পর্দা উঠলে দেখা যায় বিচারকের আসনে জজ নিদ্রাচ্ছন্ন। মাথা পিছনের দিকে হেলানো; মুখটা কিছুটা খোলা।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬ : ৭৫)। বিচারকের এই যে চোখ বন্ধ করে থাকা বা ঘুমিয়ে থাকার বিষয়টি পাঠকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আবার প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্যে প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় বিচারকের অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়েছে 'বিচারকের সামনে দিয়ে দিনের পর দিন আসামির মিছিল যায়, কিন্ত আসল দোষীকে ত্রিসীমানায়ও দেখা যায় না' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬ : ৯৪) উক্তিতে। কাজেই ঘুমন্ত বিচারকের প্রতীকে-ব্যঞ্জনায় ঘুমন্ত বিচারব্যবস্থায় ন্যায়বিচারে আস্থা বা বিচারের রায় বিশেষ কোনো তাৎপর্য বহন করে না। সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ; অর্থের বিনিময়ে নিরাপরাধ ব্যক্তি আসামী বনে যা

সেখানে বিচারব্যবস্থার অন্তর্গত অসুখ-বিসুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন সুকুমার। এ প্রসঙ্গে সুকুমারের 'উকিলের বুদ্ধি' শীর্ষক গল্প এবং 'ঝালপালা' শীর্ষক নাটকের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বিচারব্যাবস্থার গলদ নিয়ে সুকুমারের তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়েছে।

হ য ব র ল-এর বিচারদৃশ্যে আরো কৌতুকর বিষয় হলো, মূল বিষয়কে থামিয়ে রেখে 'শুনানী'তে অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করে বিচার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করা এবং কার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আসামী কে, সাক্ষী কোথায় এসব না দেখেই বিচারের রায় দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠা এক আশ্চর্য প্রতীকে সুকুমার রায় বিচারব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করেছেন। চারআনা পয়সা দিয়ে সাক্ষী কেনা যায়, নেড়ার মতো গোবেচারা পয়সার লোভে আসামী বনে যায়, বিচারের ব্যাকরণ অনুযায়ী জজ, উকিল, সাক্ষী, বাদী ও আসামী– সব ঠিক থাকলেও বিচারের রায় যেখানে পূর্ব-নির্ধারিত, আদর্শ যেখানে বাধাগ্রস্ত, ন্যায়নীতি-নিয়মকানুন যেখানে ক্ষমতাবানের কুক্ষিগত সেখানেই জ্বলে উঠেছেন সুকুমার, ঝলসে উঠেছে তাঁর ব্যঙ্গের ছুরি। আর তাই বিচারব্যবস্থার নামে অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, অর্থ ও কালক্ষেপণের সংস্কৃতিচর্চা এবং পরমত-সহিষ্ণুতার সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রভৃতি গভীর ও গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞানের ইঙ্গিতময়তায় মহৎ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্যকর্মের সম্পদ হয়ে উঠেছে। হ য ব র ল শব্দটি যেখানে বিশৃঙ্খলার দ্যোতক হিসেবে সংকলিত সুকুমারের গ্রন্থপাঠে তা অনুধাবন করা যাবে না। কথার ভাঁজে ভাঁজে, নানা রূপক-প্রতীকের আঁড়ালে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতি, নৈরাজ্য, ত্রুটি ও সংকটের রেখাচিত্র আঁকলেও সবকিছুর ওপর ছড়িয়ে দিয়েছেন শিশুমনের নির্মল হাস্যকৌতুক ও আনন্দ-বিনোদনের বিচিত্র উপকরণ। তাই যুগপৎ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পীর দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েও শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুকূলে শিশুর কল্পনারাজ্যের প্রসারণে নানা অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই–

> তাঁর সাহিত্য যথার্থভাবে ছোটদের জন্য লেখা হয়ে ওঠেনি। সেইসঙ্গে বড়োদের তৈরি ব্যাকরণের বিপরীতে তিনি তৈরি করেছিলেন এক উলটো ব্যাকরণ; সে প্রতিবিম্বের মর্ম, উদ্ভটরসের ভোক্তা একমাত্র তারাই, যারা ছোটোদের সগোত্র, এখনও যারা ভরসা করে বাস্তবতাকে সাজিয়ে নিতে পারে নতুনভাবে। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩ : ৩৩১)

আর তাই *হ য ব র ল*-এর কথক বালকের ঘুম ভেঙে গেলে বয়স্ক সমাজের প্রতিনিধি মেজমামা তাকে ব্যাকরণ না পড়ে ঘুমোনোর জন্য বকাঝকা করেন। আসলে 'ব্যাকরণ' মেনে চলা যেন ভদ্রসমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার বাঁধাধরা নিয়মের code– যেখানে পদে পদে খড়গহস্ত বিধি-নিষেধের শত পথ, শত মত সেখানে আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে চেয়েছেন সুকুমার। আসলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের খুশির আয়তন কমে আসে। ক্রমে সে দেখে তার পেছনে বয়সী-মিছিল হুঁকো মুখ করে মস্তমানে বসে পরম

বিজ্ঞভরে ঝিমুচ্ছে। কাজেই বাস্তবের বাঁধাধরা নিয়মের ঘেরাটোপে অভ্যস্ত জীবনে স্ব ও কল্পনা,আরাম ও আনন্দ কার্যকারণপরম্পরাহীন বলেই 'মানুষের বয়স হলে এম হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না' (২০০৭ : ২১৯) তাই পাণ্ডিত্যের চাপে আধমরা মানুষদের মনের শিশুটিকে পুনর্জীবিত করতে শিশুমনে অর্থহীন আনন্দময় জগতের অসম্ভব-সম্ভবের প্রচলিত চৌহদ্দি অতিক্রম করে প্রতিমান প্রতীতির ভুবন নির্মাণের প্রয়াসও বাধাগ্রস্ত হয় না।

জীবন ও বাস্তবতার সামগ্রিক প্রাপ্তি : কালোত্তীর্ণ লেখমালা

আবোল তাবোল শব্দটি যথাক্রমে 'এলোমেলো কথা', 'অর্থহীন বাক্য', 'অসংল উক্তি', 'প্রলাপ' প্রভৃতি অর্থদ্যোতক হিসেবে বাংলা অভিধানে সংকলিত হলেও এব সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* পাঠে তার যাথার্থ্য অনুধাবনীয় না হলেও ননসেন্সে মুখোশের আড়ালে আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবী ও তার চেনা চরিত্রগুলো বাস্তবে দর্পণে ধরা পড়ে। সৎ ও সচেতন সাহিত্যশিল্পী সুকুমার রায় শিশুদের মনোজগ অধিকারে শিশু-মনস্তত্ত্বের মোড়কে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের অচলায়তন ভে দেওয়ার মন্ত্রে সমাজের ভেতরেই দেখিয়েছেন নানা বাস্তব সত্য। এ প্রসঙ্গে হাসা আজিজুল হকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে–

> লেখার ভিতর দিয়ে তৈরি হয় বাস্তবের সমান্তরাল বাস্তব, জীবনের প্রতিরূপ জীবন। যে বাস্তব থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করি, সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই নির্মাণ করি দ্বিতীয় বাস্তব। এই দ্বিতীয় বাস্তব লেখার মূল বাস্তবের প্রতিরূপ, কিন্তু ছায়া নয়, অলীক নয়, মিথ্যা নয় বা মায়া নয়। তা মূল বাস্তবের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, নতুন নতুন মাত্রা নির্মাণ করে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় বাস্তবের ভিতরেই। (বিজ্ঞাপনপর্ব ১৩৯৫ : ৪০-৫০)

ফলে তাঁর রচনাপাঠে জায়মান হয়ে উঠে স্বকালের বিবিধ সামাজিক-রাজনৈতি জীবনের সঙ্গতি-অসঙ্গতির নানা বাস্তবতা-প্রতিবাস্তবতা। 'লেখক বা শিল্পীরা সচেত মানুষ– বাইরের চোখের মতো তাঁদের মনের চোখও সবসময় খোলা থাকে। শুধু চো নয়– পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁদের হয় দেখতে।' (আবুল ফজল ১৯৭৪ : ৩০)। অ তাই একজন বড় লেখক নানা অসঙ্গতির মধ্য দিয়েই, হোক না তা নির্মল হাস্য-কৌতু বা উদ্ভট-অর্থহীনতার আয়োজনে ভরপুর– গড়ে তোলেন শিল্পসম্মত ইমারত।

উনিশ শতকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবসংঘর্ষে আহরিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধে ক্রমপরিণতি হয়ে উঠেছিল কৃত্রিম অভ্যাস ও আন্তরিকতাবিহীন জড় উচ্চারণে ভরপু সুকুমার রায়ের লেখায় আছে এক সচেতন মনের ভূয়োদর্শন। বহুদর্শিতায় ভ সমকালীন সমাজকেই কেবল তিনি উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেননি তার সম সমাজদৃষ্টিকেই অন্তর্মূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন সমাজস্থ নানারকম ব্যা অস্বাস্থ্য এবং অন্তঃসারশূন্যতা। ইতোমধ্যে ১৯০৫ সালে সংগঠিত হয়েছে বঙ্গভ নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভেদ প্রকট হয়ে উঠেছে, অযাচিতভাবে কলকাতা থেকে রাজধা

দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে; ক্ষমতার কেন্দ্র স্থানচ্যুত হয়েছে বাংলাভাষীদের নাগালের বাইরে। দেশে রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে নানাবিধ অরাজকতা-অস্থিরতা উত্তাল হয়ে উঠেছে। ফলে প্রতিদিনকার অপ্রত্যাশিত অসঙ্গতির জন্য জীবনের সঙ্গে মমতাময় সংযোগবোধের আয়োজনে অনুভব করেছেন করুণা, অসহায়ত্ব। আর তাই অসম্ভব-উদ্ভটের নিরিখে পাঠককে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন– ছড়িয়ে দিয়েছেন অফুরন্ত কৌতুকরাশি, উল্টো খেয়ালের সেতার-তরঙ্গ। ভিক্টোরিয় মাপাজোকা আদব-কায়দার আদলে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের জীবন-যাপনে কেতাদুস্তা-অন্তঃসারশূন্যতা এবং সম্পর্কের যান্ত্রিকতা সুকুমারকে অসহায়-হতবিহ্বল করে তুলেছিল। সুকুমার লিখেছেন : 'অনেকদিন থেকে মনে মনে অনুভব করছি যে সমাজের কাজকর্ম ইতাদি কোনো জিনিসের সঙ্গে আমার মনের কোনো মিল নেই, তাতে আমার কোনো লাভ নেই এবং লোকসান (real লোকসান) যথেষ্ট' (সুকুমার রায় ১৩৮৯ : ১৭০) কেননা যার জীবনের একান্ত সাধনা ছিল 'কাজ আর পরমব্রতের দীক্ষা', বা সমাজের পক্ষে 'কল্যাণকর service দেওয়া', সেটির পক্ষে ইতিবাচক কোনো ফলাফল দৃশ্যমান না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণ হয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন–

> আসলে মনে মনে যা বিশ্বাস করি, তা ঠিক উল্টো– rampant, morbid, out and out pessimism। বলতে চেয়েছিলাম, মানুষের পক্ষে জীবনের প্রসন্নতা রক্ষা করা কত সহজ ও স্বাভাবিক। ... heard myself saying যে, এই যুগের মানুষের মন থেকে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে। মানুষের আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেউ আশা করতে জানে না, কেউ ভবিষ্যতের কিছু ভরসা রাখে না– ইত্যাদি। ... কি অদ্ভুত কথা বলছি, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথা আমার পক্ষে সত্য কথা। ... feel করলাম যে, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগ ছিল সেটা ভেঙে গিয়েছে। (১৩৮৯ : ১৭১-১৭২)

মানুষের জীবনে ও কর্মের বিচিত্র অবলোকন ও ভাবনাগুলো সবসময়ে সরলরেখায় সুসজ্জিত হয়ে আসে না। স্থানভেদে-কালভেদে, ভিন্ন পরিচিত আখ্যানে তৈরি হয় নিত্য-নতুন dimensions। আর তাই যৌক্তিকতাবাদী বীক্ষণের প্রখর আত্মসমালোচনা বা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মকথার খসড়াটুকু সমাজের ভেতরকার চাপা অসন্তোষ ও টানাপোড়েন থেকে উঠে আসে। *আবোল তাবোল*-এ যা সত্য হয়ে ফলভারে স্ফীত হয়ে উঠেছে তা আমাদের চারপাশের চেনাজানা পৃথিবী বা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য। এগুলোতে ননসেন্সধর্মী, ফ্যান্টাসী, আষাঢ়ে বা খেয়ালি সমাজের যত অসঙ্গতিগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠুক না কেন তার মধ্যে এমন সব বক্তব্য আছে যাতে সীমারেখা তৈরি হয়েছে সমাজের শক্ত জমিনের ওপর, যা কেবল সমকালে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ কালেও আধুনিক প্রজন্ম যে 'virtual world'-এ পরিভ্রমণ করছে তা-ই যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সুকুমার রায়ের সৃষ্ট অসম্ভব-উদ্ভটের জগতে।

সুকুমার রায় বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিশুবিশ্বের অধীশ্ব শিল্পী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন এই বিশাল সাম্রাজ্য এ কালে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা-অসহিষ্ণুতার ঘেরাটোপে সাংস্কৃতিক আধার ও আধেয়তে যখন অবক্ষয়ের যাবতীয় আয়োজন স্পষ্ট তখন রূপকথা-কল্পকথার মায়াবী জগতের আকর্ষণ হারিয়ে শিশুমন যেন অদৃশ্য কোনো হ্যামিলনের বাঁশির সুরে দিকবিদিক ছুটে যাচ্ছে প্রকল্পনা ও ঐন্দ্রজালিক মায়াবী কার্নিভালের টানে; তাদের চিন্তা ও কল্পনায় নোঙর করেছে ভিনদেশী জাহাজ। যন্ত্র ও প্রযুক্তির নোনাজলে ভেসে যাচ্ছে জনপদ ও শষ্যক্ষেত্র; যন্ত্রের আধিপত্যে হ্রাস পাচ্ছে মহিমান্বিত মন্ত্রসমূহের কার্যকারিতা। 'দেশের গরীব সাধারণ মানুষ ছন্নছাড়া, গতিহারা, লক্ষহারা; মধ্যবিত্ত আর বড়োলোকেরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যক্তিগত কোটরে ঢুকে বসে আছে সেখানে কারও জায়গা নেই, বিশাল বিশাল বহুতল আকাশচুম্বী বাড়ি স্বার্থ আর লালসার রসে চুবানো। কোথাও কোনো আহ্বান নেই।' (হাসান আজিজুল হক ২০০৮ : ১৩০) কারণ, 'সমাজ থেকে হাসি-আনন্দ উধাও হয়ে গেছে।' 'হাসির মধ্যে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে যে শিশু বড়ো হতে পারে না,তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে?' যে মহান ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন শিশুর কল্পনায় চিত্রায়িত হয়ে ওঠে প্রজাপতির পাখনা পাখির গান আর নদীর কল্লোলে যান্ত্রিকতা আর বণিক সভ্যতার ফলভারে তা সুদূরপরাহত।[১] ব্যাগভর্তি বইয়ের ভারে এবং অভিভাবকদের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাপে ন্যূজ হয়ে পড়েছে আমাদের শিশুরা– হাসিহীন নিরানন্দের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের মায়াবী শৈশব। আনন্দহীন পাঠদানের মাধ্যমে শিশুর মনোজগতের আনন্দময় বিকাশের পথ রুদ্ধ করার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির তাৎপর্যে আক্ষেপ করেছেন তিনি। পরিবর্তমান এই সমাজবাস্তবতা সত্ত্বেও শিশুদের মায়াবী রাজ্যের অবিচল অধিপতি সুকুমার রায় নির্মল হাস্যরস সৃজনে, অসম্ভবের ছন্দের দোলায় ভাবনার অভিনবত্বে আর কল্পনার চমৎকারিত্বের উদ্ভাসনে এক মজার, বিদ্রূপহীন মায়াবীভুবন নির্মাণ-দক্ষতায় একক, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন: তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণ বাংলা শিশুসাহিত্যের অক্ষয় সমৃদ্ধি। 'সুকুমার রায় একটা জেনেটিক এনডাওমেন্ট, যা সকলের জন্য নয়। ... তাকে গ্রহণ করার জন্য আলাদা ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। ... উনি একজন বিরাট বড় 'না'। উনি একজন প্রাউড মাইনরিটি। ভয়ংকর গর্বিত এবং সংখ্যালঘু।' (কবীর সুমন ২০১৩ : ৩)। তাঁর সাহিত্যকীর্তি সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য– যেখানে নেই কোনো নির্দিষ্ট বয়সের বন্ধন, নেই কোনো দেশ-কালের সীমারেখা। অসম্ভব ও অবিশ্বাসের চৌহদ্দি অতিক্রম করে প্রাণময় ও সম্প্রীতির ভুবন নির্মাণের প্রয়াসে আপন স্বপ্ন-কল্পনা-আনন্দের ডানা বিস্তারের জন্য নির্মাণ করেছেন এক বিরাট মায়াবী আকাশ। তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিঃসন্দেহে বর্তমানে বিবর্তিত দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরকালের প্রজন্মের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

টীকাপঞ্জি

১. ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে 'ছড়াসাহিত্য' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেয়েলি ছড়া' (পরবর্তীতে এর নাম 'ছেলে ভুলানো ছড়া') প্রবন্ধে 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে ১৩০৬ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *খুকুমনির ছড়া সংকলন* গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ছড়াসাহিত্য' ও 'শিশুসাহিত্য' শব্দ দুটির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১), 'মেয়ালি ছড়া', *সাধনা* আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১; *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ৭৫০

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৩০৬, ১৬শ সং.), যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত, *খুকুমনির ছড়া*, ভূমিকাংশ, সিটি বুক সোসাইটি, কলকাতা, পৃ. ১১-১২

২. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছিলো পুত্রকন্যাদের মধ্যে, বিশেষত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমারে। মাত্র ৮ বছর বয়সেই মুকুল পত্রিকায় তাঁর 'নদী' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর পরেই তাঁর 'একটি বর' নামে প্রকাশিত একটি কৌতুক-কাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যরচনার মূল গতিপথ নির্ধারিত হয়ে যায়। কৈশোরের ঐ রচনার মধ্যে কৌতুকরসের মিশেল দেওয়া বুদ্ধির ছটা মাখানো আবোল তাবোল ভাবনার মাঝে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে গভীর জীবনবোধের ক্যালাইড্যাস্কোপ। ক্যালাইড্যাস্কোপ হলো এক ধরনের লম্বা চোঙওয়ালা খেলনা, যা সামান্য ঘোরালেই ভিতরের ছবি বদলে যায়; সৃষ্টি হয় নতুন নতুন ছবি। তেমনি সুকুমারের লেখার পরতে পরতে খুঁজে পাওয়া যায় নতুন অর্থ, নতুন স্বাদ, নতুন ব্যঞ্জনা। অশোককুমার মিত্র, 'উত্তরাধিকার : মসুয়ার রায় পরিবারে', তাপস ভৌমিক সম্পা. (২০২০), *নানা সুকুমার*, কোরক, কলকাতা।

৩. কাকে বলে 'আবোল তাবোল'। মূল অর্থে এর মানে অবোধ শিশুর উচ্চারণ বা পাগলের অর্থহীন প্রলাপ। কিন্তু শিল্পের আবোল তাবোল বা ননসেন্সের অর্থ ভিন্ন। *The Dictionary of world literature ferms* (Edited by T.J. Shiply) জানাচ্ছেন যে শিল্পের কোথাও লেখক সচেতনভাবেই অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেন। এই প্রসঙ্গে Hugo Blummer এবং Getrude steln যে ধ্বনিতরঙ্গগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁদের কবিতায় সেইসব উদাহরণও স্মরণযোগ্য।এছাড়া সত্যিকারের ননসেন্স লিটারেচারকেও এখানে দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। (a) Earnest (এই পর্যায়ে এলিসের কাহিনীর হামটি ডামটির কথা আলোচিত হয়েছে) ও (b) playful Nonsense চেস্টারসনের A defence of nonsense in the defendant-এও এ ব্যাপারে শিক্ষাদর্শনগত আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'সুকুমারের আবোল তাবোল', তাপস ভৌমিক সম্পা. (২০২০), *নানা সুকুমার*, কোরক, কলকাতা, পৃ. ৭৭

৪. পরশুরামের *গড্ডালিকা*-র ভূমিকায় গ্রন্থভুক্ত গল্পের বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনের অঙ্কনকৃত ছবির দারুণ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ-বিশিষ্টতার উল্লেখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত মন্তব্য করেন। মন্তব্যটি একইসঙ্গে সুকুমার রায়ের ছড়া ও ছবি প্রসঙ্গে সমান প্রযোজ্য। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'সুকুমারের আবোল তাবোল', পৃ. ৬৮

৫. বুদ্ধদেব বসু শিশুসাহিত্যিকে মূলধারার সাহিত্যকর্ম থেকে আলাদা করে ভাবতে চাননি। তাঁর মতে, 'এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, কেননা তা সাহিত্য হলে বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক– এমনকি আবহমান সাহিত্যের একটি অনতি ক্ষুদ্র বিচিত্র অংশের ছোটোরাও উত্তরাধিকারী। যে-সব গ্রন্থ চিরকালের আনন্দভাণ্ডার, ছোটোদের প্রথম দাবি যেখানেই–সেই *মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, আরব্যোপন্যাস, বিশ্বের পুরাণ, বিশ্বের রূপকথা,*

আর সেই সঙ্গে আধুনিককালের ভাস্বর চিত্রাবলি- ডন কিহোটে, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার। শিশুসাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়েই এরাই আছে: এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ শিশুদের আদ্যকৃত। পক্ষান্তরে মৌলিক শিশুগ্রন্থ তখনই উৎকৃষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। অতএব, অন্তত তর্কস্থলে, সাহিত্যে এই 'ছোট-বড়ো' ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করা সম্ভব।' বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯), 'বাংলা শিশুসাহিত্য', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, নবার্ক, কলকাতা, পৃ.৪০

৬. খিচুড়ি কবিতায় সুকুমার রায়ের উদ্ভট কল্পনায় সৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারের নামকরণের ক্ষেত্রে চিত্ররীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন : হাস+সজারু। এই নামকরণরীতি শব্দবিদ্যাসম্মত। এগুলোকে বলে জোড়কলম বা পোটম্যান্টো (postmanteau) শব্দ। জোড়কলম করে তিনি 'হাসজারু', 'হাতিমি', 'জিরাফড়িং' ইত্যাদি শব্দ খেয়ালরসের স্ফূর্তিতে তৈরি করেছেন। সুকুমার সেন (১৯৯৭), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম সং.পুমু., আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, পৃ.২৩৭

৭. লুইস ক্যারলের *Though thw looking glass*-র 'looking glass insesects' অধ্যায়ে horse-fly থেকে Rocking horse-fly করেছেন, Dragon-fly থেকে Snap-Dragon-fly বানিয়েছেন। তেমনি বানিয়েছেন Bread and Butter-fly। কিন্তু সুকুমারের 'বকচ্ছপ', 'হাতিমি' তা থেকে আলাদা। লুইস ক্যারল শব্দের অনুষঙ্গ থেকে করেছেন নতুন সৃষ্টি, অন্যদিকে সুকুমার বিশেষ দুটি পৃথক শব্দ একসঙ্গে জুড়ে কলম করে প্রাণীটির শাব্দিক রূপ দিয়েছেন। তিনি সেই ধরনের প্রাণীকে বেছে নিয়েছেন যাদের নামের অন্ত্যবর্ণ এবং অন্যটির আদ্যবর্ণ একই হওয়ায় জোড়কলম সৃষ্টিতে নতুন ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। হাস আর সজারু, বক আর কচ্ছপ বা হাতি আর তিমিতে যোগ-সাজশ ঘটিয়ে অদ্ভুত সব জীবের কল্পনা করেছেন। আবার তাদের বিবিধ গুণপণা অর্থাৎ প্রবণতা আর শরীরী রূপ জুড়ে দিয়ে ভানুমতির খেলা স্বরূপ তাদের চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিতে ছবিও এঁকেছেন। যে কারণে মিলে গিয়েছে খাদ্য ও খাদক, ভক্ষক ও ভক্ষ্য (সিংহ ও হরিণ)। তাই ধ্বনিতরঙ্গে অমিলের কারণে 'আড়ি' কবিতায় বাঘ আর ছাগলে বা সাপে আর নেউলে জোড়কলম তৈরি সম্ভব নয়, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন :

> কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে
> বাঘে-ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে
> শেয়াল সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি
> সাপে আর নেউলে তা চিরকাল বৈরী।

৮. 'বাপুরাম সাপুড়ে' প্রকাশের পর ১৯২২ সালে *সন্দেশ* পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'একুশে আইন'। এর নামকরণের মধ্যেই রয়েছে নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'ভারত রক্ষা আইন ১৯১৫' বাতিল হয়ে গেলে ব্রিটিশ সরকার দমন-পীড়নের মাধ্যমে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে এবং তীব্র হয়ে ওঠা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে বিচারপতি স্যার সিডনি রাউলাটের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের সিডিশন কমিশন গঠিত হয়। ভারতীয়দের হিংসাত্মক আন্দোলন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে কমিশনের করা সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ ব্রিটিশ সরকার এক সন্ত্রাসবাদবিরোধী এবং দমনমূলক আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন প্রচারিত হয় 'রাউলাট আইন' নামে। এই আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যা সংগঠিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের হুমকি দেন। বহু বাদ-প্রতিবাদ, সমাবেশ-আন্দোলনের পর এই আইনের বাইশটি ধারার মধ্যে অন্তত তিনটি দমনমূলক ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯২১ সালে। সুকুমার রায় ১৯২১ সালকে মুখ্য করে পরের বছর 'একুশে আইন' নামে আইনের দমন-পীড়ন প্রসঙ্গকে ননসেন্স ভার্সের মোড়কে পরিবেশন করেন।

অন্যদিকে বণিক সভ্যতা বা যান্ত্রিকতা বিষয়ে আহসান হাবীবের ভাবনা ভিন্নতর, 'যান্ত্রিকতা আজ তার জয় ঘোষণা করে সগর্বে অগ্রসর– কিন্তু যান্ত্রিকতা আমাদের গ্রাস করুক, মানবাত্মার মূল আবেগ নিশ্চিহ্ন করে বণিক জগতের পত্তন করুক, এমনও আমরা চাই না। আমরা চাই যন্ত্রজগত আমাদের জাগতিক জীবনে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিকাশেও সহায়তা করুক– আর তার জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে পদ্ধতির মাধ্যম হচ্ছে জীবনের শুরুতে সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ, মানবিক মূল্যবোধের পরিচ্ছন্ন বিকাশ, মৌলিক মানবিক গুণাবলীর সংগঠন। শিশুসাহিত্য– সৎ এবং সচেতন লেখকের রচনা এই বিকাশ ও সংগঠনে সর্বাধিক সহায়ক, বরং বলা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।'

আহসান হাবীব (২০০১), *আহসান হাবীব রচনাবলী*-২, আহমদ রফিক সম্পা., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.৩৫৯

ায়ক গ্রন্থপঞ্জি

াদাশঙ্কর রায় (১৯৯৫), *উড়কী ধানের মুড়কী*, ৭ম সং. ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা

াবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বাবুরাম সাপুড়ে', অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা.) (১৯৮১), *কবিতা পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা আতোয়ার রহমান (১৯৯৮), *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ুল ফজল (১৯৭৪), 'ব্যঙ্গকৌতুকের সপক্ষে', *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুক্তধারা, ঢাকা

ী ইমাম (২০১০), *খেয়াল খুশির রাজা সুকুমার রায়*, দি ইউনিভার্সিটি একাডেমী, ঢাকা

ার সুমন (২০১৩), 'ভয়ঙ্কর গর্বিত এক সংখ্যালঘু', রবিবারোয়ারী *এই সময়*, ৩ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা

্যাণ মণ্ডল, 'এসো বোসো আহারে', তাপস ভৌমিক সম্পা. (২০২০), *নানা সুকুমার*, কোরক, কলকাতা

ারূপ চক্রবর্তী, 'সুকুমারের আবোল তাবোল', তাপস ভৌমিক সম্পা. (২০২০), *নানা সুকুমার*, কোরক, কলকাতা

রক রেজা (২০১৬), '*হ য ব র ল*-এর সুকুমার রায় : সবার তিনি এক বয়সী', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

াধীর ভট্টাচার্য (৯১৯৯৫), *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা

– (১৯৯৯), *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

ল মুখোপাধ্যায় (১৯৯৬), *সাহিত্যের নানা চিত্র : দ্বীপ থেকে মহাদেশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ন সরকার (২০১১), 'সুকুমারের উত্তরসাধক সুকুমার', *অনোমা : ছড়া সাহিত্যিক সুকুমার বড়ুয়া*, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম

ান আজিজুল হক (১৩৯৫), রবিন পাল সম্পা. *বিজ্ঞাপনপর্ব*, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, শ্রাবণ, কলকাতা

– (২০০৮) 'শিব্রাম চকরবরতির ব্যাপারস্যাপার', *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অনন্যা, ঢাকা

দব বসু, (১৯৫৯), 'বাংলা শিশুসাহিত্য', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, নবার্ক, কলকাতা

দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১), *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

ঘোষ, 'ফুর্তিভরা প্রাণ', শিশির দাশ সম্পা. (২০১২), *শতায়ু সুকুমার*, কারিগর, কলকাতা

ুর রাহমান (১৯৯৮), 'প্রাককথন', *ছড়াসমগ্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

জী বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৩), *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা

ন সোম, 'সুকুমার রায়ের ছবি', শিশির দাশ সম্পা. (২০১২), *শতায়ু সুকুমার*, কারিগর, কলকাতা

সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পা.) (২০০৯), *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র* ১ম খণ্ড, 'ভূমিকা', আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা

সুকুমার রায় (১৯৮৩), *আবোল তাবোল*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

— (২০০৭), *সুকুমার রচনাসমগ্র*, সাহিত্যমেলা, ঢাকা

— (১৩৬৩ ব.), *বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ*, কলকাতা

— (১৩৬৮৯ ব.), 'বিলেতের চিঠি ও আর একটি', শারদীয় *এক্ষণ*, কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৯৭), *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস* ১ম সং., পু. মু., আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা

সোমদত্তা ঘোষ (২০০৭), *সুকুমার রায় : স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯৯৬), 'তরঙ্গভঙ্গ', *নাট্যসমগ্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, (সম্পা. হায়াৎ মামুদ) প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা

Bakhtin Mikhail (1984), *Problems of Dostoevsky's Poetics*, University of Minnesota Press Minnesota.

স্বর্ণালী দত্ত : https://mail.google.com

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মশতবর্ষ
(১৯২২-১৯৭১)

ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মশতবর্ষ ও সাম্প্রতিক ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চার ধারা

শামসুদ্দিন চৌধুরী*

১.

শতবর্ষ পরে

দেখা গেছে সফল কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের শতবর্ষ অতিক্রম করা যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করে তা হলো তার রচনাসমূহ সাহিত্য ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়; সমালোচকের বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করে; তা হতে পারে পুরস্কার বা সম্মাননা বিশেষ; বিভিন্ন সংকলনভুক্ত হওয়া থেকে পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পায়; পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; এভাবে ক্যানন বা অনুশাসনভুক্ত হওয়া থেকে ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য হয়; স্পষ্টই তার রচনার উত্তরাধিকার গড়ে ওঠে। সবার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম একই না-ও থাকতে পারে; কেউ বিস্মৃত অবস্থা থেকে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসতে পারেন হয়ত। এইসব পর্যায় কম-বেশি আমাদের পরিচিত; রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ'র ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত সবার পরিচিত; তারা নিজের নিজের মতো করে এই পর্যায়গুলো অর্জন করেছেন।

দেখতে দেখতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মশতবর্ষ শেষ হতে চলল। এই শতবর্ষে পেছন ফিরে লক্ষ করা যাবে তার ক্ষেত্রে রচনার প্রকাশের শুরু থেকেই স্বীকৃতি মিলেছে ও তার সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়েছে। সেই সূত্রে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন; পুরস্কারের ক্ষেত্রে আদমজি, বাংলা একাডেমি, পিইএন এবং একুশে পুরস্কার পেয়েছেন পরপর; সমালোচক নন্দিত হয়েছেন; ইংরেজি অনুবাদগুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের অনেক ভাষাতে প্রকাশ পেতে যেন বিশ্বজয় করে ফেলে।

---

*অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

দেশে তার জীবদ্দশায় যতটা মৃত্যুর পরে এই স্বীকৃতি প্রবলতর হয়েছে; স্বাধীন দেশে তার রচনার তাৎপর্য যেন বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; *লাল সালু*র পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া একে বাংলাদেশে সর্বাধিক পঠিত উপন্যাসের তালিকায় নিয়ে আসে; অন্যান্য উপন্যাস-নাটকও দেশে-বিদেশে সাহিত্য বিভাগগুলোর পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়; আর থিম ও আঙ্গিকগত অর্জনের সূত্রে সাহিত্য ইতিহাসেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মঞ্চে অভিনীত হয়েছে ও চলচ্চিত্রে রূপ লাভ করেছে। বলতে গেলে প্রকাশের পর থেকে তাঁর রচনা কখনই এই স্বীকৃতির বাইরে থাকেনি।

আরো তাৎপর্যের যে উত্তর প্রজন্মের সাহিত্যিকদের রচনায় তার অনুসরণে, শ্রদ্ধাপূর্ণ নিবেদনে উত্তরাধিকার স্পষ্ট। আহমদ ছফা, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির প্রমুখের উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যেমন, বিভিন্ন গল্প লেখকের গল্পে তাঁর গল্পের মনঃবিশ্লেষণ ও চৈতন্যস্রোতে অবগাহনের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। বেশি করে চিহ্নিত করা যাবে আমাদের কথাসাহিত্যে গল্পপ্রধান, কাহিনি-নির্ভর উপন্যাসের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকামী ঔপন্যাসিকদের সকলেই প্রায় তার ভাষাভঙ্গির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। বলা যায় প্রাক-আধুনিক মুসলমান সমাজের চিত্র ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার উৎস থেকেই তাদের আগ্রহের বিষয় হয়েছে। তার সমসাময়িক কোনো লেখকই এতটা প্রবলভাবে উত্তরকালের লেখকদের রচনায় উপস্থিত নন। এভাবে দেশের সাহিত্যের মূল্যবান ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়েছেন তিনি।

বিদেশী প্রভাব, ফরাসি সৌরভ

তাঁর মূল্যায়ন এক পর্যায়ে তীর্যক দৃষ্টিতে খণ্ডিত হতে শুরু করে। তা হলো ওয়ালীউল্লাহ্‌ চর্চার অন্যতম বাঁধাগৎ পশ্চিমা প্রভাব বা ফরাসি পরিগ্রহণ; বহু আলোচনায় এমন স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া হয়েছে ফরাসি সাহিত্যের থেকে উপাদান অবাধে গ্রহণ করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌; প্রকৃত তা অতিকথা বা মিথের বেশি কিছু নয়। এই আন্দাজকে আরো প্ররোচিত করেছে অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র ফরাসি নাগরিক হওয়া এবং এক দশক ধরে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ফ্রান্সে চাকরিসূত্রে বাস করা; বাস্তবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ফরাসি সংস্কৃতির প্রতি সমীহপূর্ণ মনোভাবের সূত্র ছিল চিত্রকলায় ফরাসি-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য; ১৯৯৯-১৪ পর্যন্ত পারীর আর্ট নিয়ে রচিত একটি বই পাঠে [২৬ নভেম্বর ১৯৫৪ এর পত্র] তাঁর মন্তব্য–

> This period seems to be so young and violently vital. I wish I could read French… I don't think any country in the world ever produced such a scintillating artistic group. I love France for it'
>
> (Syed Waliullah : My husband as I saw him, Anne-marie Waliullah, 2022, p. 158]

এই স্বপ্নপূরণ হয়েছে ১৯৬১ সালের পরে এসে, পারীতে থিতু হয়ে দুই বছর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ফরাসি শিখেছেন; তারপরে ফরাসিতে একটা বক্তৃতাও করেন এবং ভারতীয় বর্ণপ্রথা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন 'ল্য সিস্তেম দ্য কাস্ত' নামে নেফ সম্পাদিত পত্রিকায়

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৪ সংখ্যায়। অর্থাৎ মূলভাষায় ফরাসি সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেওয়ার মতো উপাত্ত নেই। ইংরেজি অনুবাদে বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো ফরাসি সাহিত্যও পাঠ করেছেন; অন্যদিকে ফরাসি অহংম্মন্যতার উন্মোচন করা *হাউ টু কুক বিনস–অ্যান এশিয়ানস অ্যাডভেঞ্চার ইন ফ্রান্স* নামের রচনায় ফরাসি ইউরোকেন্দ্রিকতার প্রতি তাঁর মনোভাব ফুটে উঠেছে। ফলে ফরাসি সাহিত্যের থেকে প্রতিগ্রহণে তাকে মধুসূদনের সঙ্গে মেলানো যাবে না, যিনি স্পষ্টই ফরাসি উপাদানকে বিশেষ করে লা ফঁতেন এর আদলে নীতিকবিতা রচনা করেন; সেই প্রতিগ্রহণের প্রেক্ষিত ছিল স্বতন্ত্র। মধুসূদন প্রসঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্র মন্তব্য, 'তার আর্থিক দেনা হয়তো ছিল কিন্তু আমাদের মত জীবনের ঋণ ছিল না'; ওয়ালীউল্লাহ্ নিজের দেশের, স্বাতন্ত্র্যকামী স্ব-সমাজের অধঃপতিত অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

এভাবে তার রচনায় 'কথিত' বিদেশী প্রভাবের তালিকা এমনই দীর্ঘ হয়েছে যে কারো পক্ষে এরপরেও মৌলিকত্ব অর্জন সম্ভব কিনা সে প্রসঙ্গ বিবেচনা করা হয়নি। ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষকদের একটা বড় অংশ এই পরকীয় প্রভাবের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। কেউ কেউ পূর্ব নির্ধারিত ধারণা থেকে অগ্রসর হয়ে পরস্পর বিপরীত ধারণাকেও ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায় আরোপ করেছেন; ইউরোপীয় মানদণ্ডকে সার্বজনীন হিসেবে গণ্য করে তারা প্রতীচ্য প্রভাবের সন্ধান করেছেন; প্রভাবের চেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রকৃত প্রতিগ্রহণ বা রিসেপশনের অনুসন্ধান করা হয়নি। যেমন বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের উপন্যাসে চল্লিশের দশকেই চৈতন্যপ্রবাহ সফল প্রয়োগ হলেও ষাটের দশকের ওয়ালীউল্লাহ্র রচনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

রচনার স্বত্ব, গ্রন্থস্বত্ব, ডিজিটাল সংস্করণ

অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬ সালে ওয়ালীউল্লাহ্র মৃত্যুর পরে প্রথমবার ঢাকায় আসেন; তার পরের বছর তার মৃত্যু হয়। দীর্ঘ সময় তিনি ওয়ালীউল্লাহ্র বিভিন্ন সুহৃদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; ঢাকায় এসে ওয়ালীউল্লাহ্র মামাতো বোন সুলতানা সারওয়াত আরা জামানের বাড়িতে ওঠেন। সেসময় ঢাকায় অনেককে তিনি সাক্ষাৎকার দেন; এসব প্রশ্নোত্তর-পর্ব ছাড়াও বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতা করেন; সে সবই ইংরেজিতে; ততদিনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বর্তমান গবেষক অবরুদ্ধ অবস্থাতে কয়েকবার সাক্ষাৎকার নেয়। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব* (২০০৭) গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেসব মুদ্রিত আছে। অ্যান-মারির বর্তমান গ্রন্থে সেসব সাক্ষাৎকার কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে মুদ্রিত হয়েছে; রচনাটির সঙ্গতির অভাবের পেছনে সেটি একটা বড় কারণ। প্রশ্নকর্তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন; যেজন্য হয়তো ইংরেজি, ফরাসি ও অপ্রকাশিত রচনা সম্পর্কে কোনো রকম প্রশ্ন ছিল না; ততদিনে সেসব কারো অধিগম্য হয়নি, ফলে সেসব প্রশ্নের বিষয় হয়নি।

এই সফরে অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র গ্রন্থস্বত্বেও প্রাপ্য অর্থ লাভের পথে প্রতিকূলতা লক্ষ করে হতাশ হন। *লাল সালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*সহ অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তানের স্বত্বাধিকারী আবদুল কাদির খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন (আনিসুজ্জামান, ভূমিকা, আমার স্বামী ওয়ালি)। পরের দিন কাদির খান আমিনাবাদ কলোনির বাড়িতে অ্যান-মারির সঙ্গে দেখা করেন এবং এ পর্যন্ত প্রাপ্য গ্রন্থস্বত্ব বাবদ চার লক্ষ আশি হাজার টাকার ঋণপত্র লিখে দেন; যা ভবিষ্যতে শোধ করা হবে এবং আনিসুজ্জামান ও শওকত ওসমান তার গ্যারান্টর হিসেবে ছিলেন। দেশে ফেরার অর্থের সংকুলান না হওয়ায় অ্যান-মারির সঙ্গে আলাপে কোনো একটি প্রকাশনীর সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলি প্রকাশের চুক্তির প্রস্তাব করি। এ সূত্রে প্রতীক প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী আলমগীর রহমান উপন্যাস, গল্প, নাটক আলাদা করে প্রকাশের অনুমতি নেন; এবং এককালীন আনুমানিক সাতষট্টি হাজার টাকা প্রদান করেন। এটি এখন বাজারে সুলভ সংস্করণ, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত রচনাবলি আরো এক দশক আগে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত প্রতীক সংস্করণকেই প্রামাণ্য ও সুসম্পাদিত হিসেবে দেখা হয়; কিন্তু একেও স্টান্ডার্ড সংস্করণ বলা চলে না; মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে ও পাঠান্তর দেওয়া নেই। এ ছাড়া গল্প, উপন্যাস ও নাটক এর বাইরে প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনা পাঠকের নাগালে পাবার জো নেই। জন্মশতবর্ষে বিচ্ছিন্নভাবে অপ্রকাশিত রচনার 'সম্পাদিত' প্রকাশনা রয়েছে। কোনো প্রামাণ্য রচনাসমগ্র নেই।

এ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রকাশনাই অননুমোদিত; বাংলাদেশ ও ভারতের যত ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার সংস্করণ ও মুদ্রণ সমস্তই গ্রন্থস্বত্ব না দিয়েই অযত্নে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর ষাট বছরে গ্রন্থস্বত্ব আইনের আওতামুক্ত হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল স্টান্ডার্ড রচনাবলি প্রকাশের মাধ্যমে এর টেক্সটের বিশুদ্ধতাকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ২০১৭ সাল থেকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দুর্লভ রচনাসমূহ আপলোড করে তা ঘটার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অগ্রন্থিত, অপ্রকাশিত রচনা সমগ্রের বিচার

প্রস্তাবিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলিতে কী কী অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ওয়ালীউল্লাহ্‌ জীবনী (১৯৮৮) ও রচনাবলি (দুই খণ্ড, ১৯৮৬, ১৯৮৭) স্পষ্টই তার মৃত্যুর সময়ের পরে জানা তথ্যকে পরিবেশন করেছে। বর্তমানে এই রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিচিত তিনটে উপন্যাস, দুটি গল্পগ্রন্থ, অপ্রকাশিত গল্পসমূহ, কয়েকটি গ্রন্থ সমালোচনা ও একটি প্রবন্ধ ছাড়াও প্রায় বিপুল পরিমাণ রচনা এর বাইরে থেকেছে; লেখককৃত *লাল সালু*র অনুবাদ ছাড়াও তার করা বেশ কিছু গল্পের ইংরেজি অনুবাদ, মূল ইংরেজি রচনা, *লাল সালু*র ফরাসি অনুবাদ, *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস*, *দ্য আগলি এশিয়ান*, 'ল্য সিস্তেম দ্য কাস্ত' নামের ফরাসি প্রবন্ধ, একাধিক আর্ট ক্রিটিসিজম,

ফিচার প্রবন্ধ, দিনপঞ্জি, চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত বাংলা উপন্যাসের খসড়া, বাংলা প্রবন্ধ 'বাহার দা', বিভিন্ন সময়ে করা স্কেচ, বইয়ের প্রচ্ছদ, পেইন্টিং এই রচনাবলিতে অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত; গল্পের একাধিক পাঠান্তর রয়েছে বেশ কিছু; সেসবের টেক্সট গত সমালোচনা হওয়া উচিত। বহু গল্প গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে নাম পরিবর্তন হয়েছে। এমন কিছু গল্প এখনও অসংগৃহীত থাকতে পারে।

জীবনী তথ্য : চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত রচনা, তথ্যের অভাব

ওয়ালীউল্লাহ্চর্চার আরেকটি অন্তরায় পর্যাপ্ত জীবনে তথ্যের অভাব। তথ্যের অপ্রতুলতায় রচনাগুলোর রচনার সময়কাল ও প্রেক্ষিত স্পষ্ট করে জানা যায় না; প্রামাণ্য জীবনীর অভাবে অনুমান নির্ভর একাধিক তথ্য প্রচলিত থাকায় ভিত্তিহীন বিশ্লেষণের সম্মুখীন হতে হয়। সমগ্র রচনাবলি প্রকাশিত হলে লেখক মানসের সম্পূর্ণ চিত্র যেমন পাওয়া যেত ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যিক জীবনীর বিভিন্ন অংশে তথ্যের অভাব থেকে গেছে। যেমন, ওয়ালীউল্লাহ্র একাধিক গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও একাধিক চিত্রও, পরোক্ষ সূত্রের সেসব তথ্য প্রমাণিত নয়। তার চিঠিপত্রে উল্লেখ করা বিভিন্ন রচনায় যুক্ত থাকার উপাত্ত পরে সমর্থিত হয়েছে কিনা জানা যায় না। অ্যান-মারি বা বন্ধুদেরকে লেখা একাধিক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনার কথা থাকলেও সে সবের নির্দিষ্ট নাম জানা যায় না।

তার শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা একগুচ্ছ চিঠিতে; পূর্বাশা প্রকাশনীর সত্যপ্রসন্ন মজুমদারের গ্রন্থ থেকে *নয়নচারা* প্রকাশের বিবরণ পাওয়া যায়। জয়নুল আবেদিনের আঁকা *লাল সালু*র প্রচ্ছদ তার পছন্দ হয়নি, পরবর্তীতে চট্টগ্রাম নিয়ে আঁকা জয়নুলের ছবির সমালোচনা করেন। জয়নুল-সফিউদ্দিন-ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কের সঠিক চিত্র সন্ধান করবার মতো; পরবর্তী সময়ে রশিদ চৌধুরী, নভেরা আহমদরা অনেকেই তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেসবের বিবরণ কোনো পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। তাঁর চিত্রকলাচর্চার প্রসঙ্গে সেসব তাৎপর্য বহন করতে পারে।

বিভিন্ন রচনার কালের মতো স্থানও অনির্ণীত থেকে গেছে; পারিবারিক সূত্রে জানা যায় ময়নসিংহের কাছে মধুপুরে যাওয়ার পথের মোড়ে থাকা সালু কাপড়ে ঢাকা মাজারটি ছিল *লাল সালুর প্রেরণা*; সাতক্ষীরা অঞ্চলে থাকা পরিত্যক্ত নীলকুঠিকে অপ্রকাশিত 'একটি বিচারকের কাহিনী'র প্রেক্ষাপট হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চট্টগ্রামের ষোলোশহরে থাকা বাকুলিয়া নদীটি *কাঁদো নদী কাঁদো*'র ভিত্তি মনে করা হয়। এসব ভৌগোলিক তথ্য তার রচনার উপভোগকে প্রাণবন্ত করতে পারে।

ওয়ালীউল্লাহ্র বংশলতিকায় মাতৃকুলের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়; তার পিতা নোয়াখালি অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে এসে বাস করেন; *লাল সালু*তে নোয়াখালির উপভাষা

ব্যবহার নিয়ে এর রচনাকালে কলকাতায় বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় সরস আলোচ হয়েছে। *লাল সালু* ১৯৪৩ সাল থেকে কলকাতায় রচিত হওয়ার শুরু হয়। *নয়নচারা* দুর্ভিক্ষপীড়িত গল্পের সঙ্গে অভাবের তাড়নায় মাজার আবিষ্কার করা মজিদের ক্ষী হলেও সূত্র থাকতে পারে।

কৃষ্ণনগরের কলেজের সহপাঠীকে ওয়ালীউল্লাহ্ নিজের 'মুসলিম লীগ' সমর্থক হওয় পরিচয় দেন, দাঙ্গার প্রকোপে ঢাকায় এসেও নিভৃতে সময় কাটান; ১৯৫৪ সা কায়েদে আজমের কবরের দিকে যাওয়া নিরন্ন মানুষের মিছিলের একটা স্বপ্নদৃশ্য ম করিয়ে দেয় হৃষীকেশ লাহিড়ীর চিঠিতে লেখা কায়েদে আজমের গুরুত্ব ফিকে হ এসেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ততদিনে দুঃস্বপ্ন হতে শুরু করেছে। একটি বিচারকে কাহিনী এই পর্বেই খসড়াকৃত হওয়া সম্ভব। কারণ চরিত্র সৃষ্টির এই পর্ব থেকে *চাঁদে অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে চরিত্র বিকাশের চেয়ে এক একটা টাইপ নামহীন চারিত্রিক ধরন এসেছে কাহিনির প্রয়োজনে, পুরোপুরি টাইপও নয়; মানি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চতুষ্কোণের* রচনারীতি মনে আসতে পারে : 'রাজকুমারকে 'টাই বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এ 'অনেক' যারা তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হলো। (ভূমিব *চতুষ্কোণ*) *কাঁদো নদী কাঁদোর* বিচারক মুস্তফা ও তার বাগদত্তা খোদেজাও এম অনেককে ধারণ করে। তবারক ভূইঞা অবিশ্বস্ত কথকের প্রতিরূপ; ফলে সাধারণ গ্রা শিক্ষক বা মফস্বলের হাকিমের সঙ্গে বাস্তবের আরেফ আলী বা মুহম্মদ মুস্তফাদের মি না পেয়ে সমালোচকরা দিশেহারা বোধ করেন।

তার উপন্যাসে গল্পরস ততটা নয় বরং বর্ণনার সৌকর্যে এক রকম স্থাপত্য সৌব আয়ত্ত করে। চৈতন্যপ্রবাহ ছিল তার প্রিয় বিষয়। এই দুই উপন্যাসে বিষয়ের প্রয়োজ গল্প, চরিত্র পেছনে ফেলে নিজস্ব আখ্যানরীতি গড়ে তোলেন; প্লট নির্ভর পরিণাম মং উপন্যাসের চেয়ে স্বতন্ত্র আখ্যানরীতি গড়ে তোলেন। তার বিশেষ ভাষা এ আখ্যানতত্ত্বের অপরিহার্য অংশ। উত্তরকালে এই দিকগুলোর অনুকরণের চেষ্টা হয়েছে পরের ধাপে ষাটের দশকে এসে ওয়ালীউল্লাহ্ অনেক বেশি উত্তর-ঔপনিবেশি দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করেছেন এবং জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জাতিকতার অভিলাষী হ তৃতীয় বিশ্বের, এশিয়া, আফ্রিকার বাস্তবতার সঙ্গে যে পরিস্থিতির প্রতিফলন রয়ে তাতে।

ওয়ালীউল্লাহ্চর্চা

সচরাচর ওয়ালীউল্লাহ্র সমালোচনা-মূল্যায়ন যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, বিবেচক নয়। বাঙা কূপমণ্ডুক সমালোচক তাকে অবলীলায় প্রতীচ্য প্রভাবিত হিসেবে চিহ্নিত করে, সেসম প্রতিগ্রহণ বা রিসেপশনকে বিবেচনা না করেই। ওয়ালীউল্লাহ্র রচনাকে দেশকাল বিচারে তিন অংশে বিভক্ত করা যায় : *লাল সালু*, *নয়নচারা*, *দুই তীর* রচিত হয়ে

কলকাতায় ও বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গে; *চাঁদের অমাবস্যা* এবং *কাঁদো নদী কাঁদোসহ* নাটকগুলো রচিত হয়েছে পরবাসে। এ ছাড়া ইংরেজিতে অনুবাদ করা ও রচিত রচনাগুলো ইউরোপীয় পাঠকের উদ্দেশে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে; এখনকার মতো বিশ্বায়নের পরিস্থিতি ছিল না। যখন ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেকে নির্বাসিত মনে করছেন না, 'ইমিগ্রান্ট হয়েছি দেশান্তরী হইনি'। জীবনের শেষে ঢাকায় বাড়ি করেছেন ফিরে আসার জন্য। ১৯৬৯ সালে দেশে আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সভায় দেওয়া বক্তৃতায় এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন বলে উপস্থিত শ্রোতারা মনে করেন। পশ্চিমা সমাজে মিশে যাবার পরিবর্তে নিজের শেকড়ে ফিরতে প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

পরবাসে কোনো লেখক যেভাবে নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে কল্পনায় নিজের দেশকে গঠন করে, বিস্মৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের সৃষ্টির মধ্যে দেশটাকে নির্মাণ করেন; হয়ত সম্পূর্ণ বাচিক হয় সেই নির্মাণ। লেখকদের রচনার উৎস শুকিয়ে আসে, অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে সেই বাধা। চারপাশের বৈরী পরিবেশের দরুণ মাতৃভাষায় কিছু লেখার অভ্যাসও কমতে থাকে। মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় রচনা করে পাঠককে আকৃষ্ট করার সম্ভাবনাও সহজসাধ্য থাকে না।

লেখকের ভাবনা হিসেবে সচরাচর গণ্য হওয়া এসব রচনাকে তার ধর্মভিত্তিক শোষণ বা উপনিবেশ-বিরোধী চিন্তার পরিচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এখন পর্যন্ত সেসবকে লেখকের দৃষ্টিকোণে না বিচার করে পাঠক বা টেক্সটের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপরে আরোপিত প্রতীচ্য প্রভাবের বিপরীতে আমার নিজের গবেষণা (২০০৭) রয়েছে; অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ তারই অন্যতম সাক্ষী। যেভাবে তার রচনাকে 'টেস্টিমনি' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিয়ে প্রকাশিত রচনারাশির মধ্যে স্পষ্টই কয়েক ধরনের রয়েছে; পরিমাণে সবচেয়ে বেশি স্মৃতিচারণ, জীবনী উপাত্ত, তথ্য, গালগল্প পূর্ণ তার সহপাঠী, বন্ধু, সুহৃদ, পরিচিতদের বয়ান। যাতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেয়ে রচয়িতার উপরেই ফোকাস বেশি। এরপরের ধাপে রয়েছে সাবজেক্টিভ ক্রিটিসিজম বা ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণে সমালোচনা। সমালোচকের ভালো লাগা ও মন্দ লাগার উপরে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর এই মূল্যায়ন। তৃতীয় ধরনের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মধ্যে তাকে নিয়ে রচিত প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভ রয়েছে এবং সন্দর্ভোপম রচনাও রয়েছে। প্রথম ধরনের পিএইচডি সন্দর্ভ সংখ্যায় হাতে গোনা : জীনাত ইমতিয়াজ আলী (১৯৯২), শামীমা হামিদ (২০০১), শামসুদ্দিন চৌধুরী (২০০৭); সেসব প্রত্যেক গবেষণাও পূর্ণাঙ্গ রচনাকে আলোচনা করতে সমর্থ হয়নি। এ ছাড়া অন্যান্য এমএ শ্রেণীর সন্দর্ভ রয়েছে, যেসব বক্তব্যেও মৌলিকতাহীন ও তার ফলে পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন মিটিয়ে ছাপার অক্ষরে দেখা দেয়নি। বেশির ভাগ সন্দর্ভ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিকে বিবেচনায় না নিয়ে

আংশিক, খণ্ডিত রচনাকে উপজীব্য করে সারমর্ম উপস্থাপন করেছে। মৌলিক প্রতিপ
প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চার ক্ষেত্রে সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৮১, ১৯৮৩), নূর-উল-করিম খ
(১৯৮৩), তানভীর মোকাম্মেল (১৯৮৭), সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৮), মোহা
জয়নুদ্দীন (১৯৯০), জীনাত ইমতিয়াজ আলী (১৯৯২), খালেদা হানুম (১৯৯২), ত
রুশদ (১৯৮৮), আবিদ রহমান (১৯৮৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৬), রীপা ঘে
(২০২২), যীনাতুন নেছা (২০২১) প্রমুখ রয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষকরা ছাড়াও ত
সুহৃদ পরিচিতদের অনেকেই জীবনী উপাদানের সন্ধান করেছেন; তার ম
উল্লেখযোগ্য লন্ডনপ্রবাসী সাংবাদিক আবদুল মতিন, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, সৈ
আলী আহসান, সানাউল হক, এ কে নাজমুল করিম, আবুল হোসেন, আসাদ চৌধু
শওকত ওসমান, মোহাম্মদ নাসির আলী, মাহমুদ শাহ কোরেশী, কবীর চৌধুরী, অ
ইসলাম, শিবনারায়ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে গবেষণার নামে যে ধরে
রচনা প্রকাশিত হয় তার পরিমাণ বিপুল; এসবকে রবীন্দ্র সমালোচনা ও রবীন্দ্র জীব
মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যের দ্বারা চমৎকার প্রকাশ করা যায়–

> বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর জীবনীকার বা সমালোচকদের অনেক সময়ই সংগ্রাহকমাত্র মনে হয়– কি
> জোর সম্পাদক, অর্থাৎ তারই রচনা আর চিঠিপত্র থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি, এবং সেই উদ্ধৃতিরই রোম
> পেরিয়ে' আমাদের চর্চা বেশিদূর এগোয় না। কারণ 'সংকলনের নৈপুণ্যে সমালোচকের কাজ ফুরোয়
> যে লেখা লেখককে চিনিয়ে দেবে, 'তাঁর বই পড়ে যা পাওয়া যায়, তার উপরে আরো কিছু যোগ কর
> সেরকম সমালোচনায় সিদ্ধি বড়ো দুরূহ। ['রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা', সুমন গুণ সম্পাদি
> ২০১১, পৃ ৪৭]

ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিয়ে রচিত অন্যান্য রচনা অর্থাৎ ওয়ালীউল্লাহ্ অধ্যয়ন প্রায় সমস্তই
ধরনেরই প্রেম বা ভক্তির প্রকাশ বলা চলে; তাতে কোনো প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠা করা
না বা সাহিত্য সমালোচনার নিয়ম কানুনকে অনুসরণ করা হয় না।

অন্যদিকে রয়েছে লেখকের চিন্তার সঙ্গে পাঠকের উপলব্ধির সেতু নির্মাণের ম
অ্যান-মারির গ্রন্থের মতো বিশ্বস্ত প্রতিবেদনটি; যা একই সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠিপ
প্রবন্ধের অভাব পূরণ করতে পারে। অ্যান-মারির এর বাইরে আরো অনেক চিঠি
রয়েছে, অনেক ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষককে লেখা সেসব পত্ররাশি সংকলিত হলে জী
উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত লেখকদের সহধর্মিনীর ক্ষে
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধারিক্ত, আমজনতার বেশি নয়; লেখকের প্রতি
অলৌকিক প্রতিভা আরোপ করি লেখকপত্নীকে সৃষ্টির উপভোগে অনধিকারী মনে ক
হয়, এমনকি তার ব্যক্তিগত বিবেচনার অধিকারও বরাদ্দ করা হয় না। সে ক্ষেত্রে অ্যা
মারির দৃষ্টিকোণকে দেখা যেতে পারে ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপের উন্মো
হিসেবে; এই দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে তার মরণোত্তর প্রকাশিত রচনাসমূহের মূল্যায়নে নি

যায়, স্পষ্টই তা অন্য স্তরের। তার বিস্তারে যাবার জন্য ওয়ালীউল্লাহ্ মানসের পরিচয় নেওয়া যাক।

ওয়ালীউল্লাহ্-মানস

লেখক জীবনের সূচনায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানস গঠন কেমন ছিল। হাবিবুল্লাহ বাহারের প্রেরণায় সাহিত্যচর্চা করতে আসেন; পাশে পাশে তার ছবি আঁকারও চর্চা চলে। সেই সূত্রে চিত্র-সমালোচনা করেন, চিত্রকলা নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; তার পাশে ছোটগল্প রচনায় হাত পাকিয়ে ফেলেন; উপন্যাস রচনা করে সাফল্য অর্জন করেন; তথ্য অফিসারের চাকরি নিয়ে অন্য দেশে যাবার আগেই এই পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সে সময়ের শুরুতেই তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন–

> আমরা মুসলমান। হয়তো-বা মাত্র কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে। তাছাড়া যে-বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে-সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন রয়েচে কী? এবং সে-সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে-ব্যর্থতা হবে সেই রকম–ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছেড়ে কিছুরও মধ্যস্থতা না নিয়ে এক লাফে সুররিয়ালিজম শুরু করার যে ব্যর্থতা। আমার তো তাই মত।' [২৯ আষাঢ়, ১৩৫০, কাজি আফসারউদ্দিনকে লেখা চিঠি]

> 'আই ওয়ান্ট টু রাইট' মুসলমান সমাজ নিয়ে– আমার সমগ্র মনের ইচ্ছা সেদিক পানে; এও একরকম প্যাশন থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়ত অজ্ঞ নয় : কিন্তু অধঃপতনের এই যে চূড়ান্ত অবস্থা– এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই। ... আমি আমার আঁকা ছবিতে সে সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায়। পশ্চিম জগত আজ যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছে। ... যে সাহিত্যে কিছুটা হয়তো ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছড়িয়ে থাকলো। [২৬.৭.৪৩, কাজি আফসারউদ্দিনকে লেখা চিঠি]

মুসলমান অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান, পূর্ববঙ্গের মুসলমান তাঁর লেখার বিষয়; অবিভক্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশিক পরিবেশ থেকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জোটনিরপেক্ষ অবস্থানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা– সব মিলিয়ে ইউরোপের বিপরীতে 'উপনিবেশিত' এক 'অপরে'র ইউরোকেন্দ্রিকতা অবিনির্মাণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার কেন্দ্রীয় থিম। বিয়াল্লিশের মন্বন্তর নিয়ে গল্পগ্রন্থ নয়নচারা, দাঙ্গা, দেশভাগ উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে গ্রামবাংলার গল্প মনশ্চৈতন্যের আলেখ্য *দুই তীর*, ধর্মের উপর ভর করে এক ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণ নিয়ে *লাল সালু*, 'ইসলামি' রাষ্ট্রে সংঘটিত অপরাধের জ্ঞানের অধিকারী 'ক্লিন ম্যান' যুবক শিক্ষকের আখ্যান *চাঁদের অমাবস্যা*, এবং ঔপনিবেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিচারের সিস্টেমের প্রতি মানসিক উপনিবেশায়ন এবং বাঁকাল নদীর কিনারে স্টিমার ঘাট উঠে যাওয়ায় নদীর কান্না, বিচারকের আত্মহনন নিয়ে *কাঁদো নদী কাঁদো*। এর পাশাপাশি শুরু হয়েছে

বৃদ্ধ পীরের থিম নিয়ে *বহিপীর*, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে *তরঙ্গভঙ্গ* নাটক। *লাল সালু*র থিমকে পরিবর্তিত ও বিস্তৃত করে ইংরেজি ও ফরাসিতে *ট্রি উইথআউট রুটস* ও *লা'রবর্ সঁ রাসিন*। রচনাটি অনুবাদ বলার চেয়ে ট্রান্সক্রিয়েশন বলা চলে; অন্য ভাষায় পুনঃসৃজন করা হয়েছে। ততদিনে ফরাসি সংস্কৃতির ইউরোকেন্দ্রিক মনোভাবের সমালোচনা *হাউ টু কুক বিনস–অ্যান এশিয়ানস* অ্যাডভেঞ্চার ইন ফ্রান্স; এবং দক্ষিণ এশিয়ার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পটভূমিতে এক সম্ভাবনাময় দেশের জাতীয় মুক্তির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের আখ্যান *দ্য আগলি এশিয়ান*। শেষের রচনাগুলো ইংরেজি ও ফরাসিতে রচিত।

প্রাথমিক ছাঁচ হিসেবে ইউজেন বারডিক ও উইলিয়ম লেডারারের *দ্য আগলি আমেরিকান* (১৯৫৮) নামের মার্কিন সমাজতন্ত্র-জুজুর বিরোধিতার কাহিনির উপরে ভিত্তি করে রচিত। নোংরা, অন্যের বিষয়ে নাক গলানো বিশ্বের উনষাটটি দেশে থাকা মার্কিনিদের কমুনিজম-ফোবিয়ার স্যাটায়ারমূলক কাহিনিকে ওয়ালীউল্লাহ্ মার্কিনিদের বিশ্বমোড়লীপনার উন্মোচন করেছেন এশীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণে; দরিদ্র, নিরন্ন এশীয়দের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে 'আগলি' প্রতিভাত হওয়ার পেছনের কারসাজি উন্মোচন করেন।

উল্লেখ করার মতো *লাল সালু* প্রায় ডজনখানেক ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ততদিনে; ইংরেজি অনুবাদে এশীয় সাহিত্যের পাঠকের কাছে ওয়ালীউল্লাহ্ পরিচিত হয়েছেন; আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে *লাল সালু*র অনুবাদ প্রশংসিত, মূল্যায়িত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেই নিজের রচনা অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে : কায়সার সাইদ ছদ্মনামে *ট্রি উইদ আউট রুটস*, 'দ্য টেল অফ টুলসি ট্রি' বাংলা থেকে, 'কেরায়া' গল্প 'কার্গো' নামে, 'দ্য লাইফ, দ্য টেস্ট', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' প্রভৃতি অনুবাদ করেন; মূলে ইংরেজিতে গল্প লেখেন 'নো এনিমি' (১৯৫৯), 'এস্কেপ' (১৯৫০) নামের গল্প। পাকিস্তানের তথ্য অফিসার হিসেবে বিভিন্ন ফিচার রচনা করেনঃ পাকিস্তানি ওমেন গেইন ইকুয়ালিটি উইথ মেন, মিউজিক প্রভৃতি শিরোনামে; এছাড়াও ফরাসি পত্রিকায় ভারতীয় বর্ণপ্রথা বিষয়ে ফরাসিতে প্রবন্ধ রচনা করেন 'ল্য সিস্তেম দ্য কাস্ত' (১৯৬৪) একমাত্র ফরাসি রচনা ওয়ালীউল্লাহ্র।

অন্যভাষার রচনা : কোন প্রেক্ষিতে, কার উদ্দেশ্যে

এই সূত্রে প্রশ্ন উঠবে এই বিপুল পরিমাণ অন্য ভাষার রচনা কোন মানদণ্ডে বিচার হবে; কী প্রণোদনায়, কার জন্য এসব রচিত হয়েছে; এসবের উদ্দিষ্ট পাঠক কারা। বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যচর্চা বা শেক্সপীয়র-মিল্টন নিয়ে লেখালেখির চেয়ে আলাদা। নিতান্ত শখে একটি বা দুটি নয়, পরিকল্পিতভাবে দীর্ঘসময় ও শ্রমে রচিত এসব রচনাকে কোন বিবেচনায় দেখতে হবে; পরবাসে থাকাটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা নয়; আমাদের প্রবাসী লেখকরা নিয়মিত মাতৃভাষায়ই রচনা করেন ও দেশে সেসব ঐ ভাষাভাষী পাঠকের

জন্য প্রকাশিত হয়; সে তুলনায় ভিন্ন ভাষায় রচিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র এসব সাহিত্যকে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য বা বাংলাদেশী ইংরেজি রাইটিংসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অথবা অমিতাভ ঘোষ, সালমন রুশদি, ভারতী মুখার্জি অথবা মনিকা আলী, তাহমিনা আনামদের রচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। যে কারণে ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চায় এসব রচনার মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত লক্ষ করি। আমাদের ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষকরা এই অংশে ততো ভূমিকা রাখেন নি।

তাই ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় এই রচনারাশি অন্যতর বিশ্লেষণ অধ্যয়ন দাবি করে। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যভাষায় লেখালেখির চর্চা (বিশেষ করে সৃজনশীল রচনা)কে 'এক্সোফোনি' নামে বোঝানো হয়। বহুকাল ধরে চলে আসা এই চর্চাকে, জর্মন 'একসফোনি'র সমতুল্য, অপেক্ষাকৃত নতুন এই নামে লিটেরারি ও কালচারাল স্টাডিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এসব এক্সোফানিক লেখকদের কেউ দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক হতে পারে তাদের শৈশবে, এমনকি পলিগট, যেখানে কেউ আয়ত্ত করা ভাষায় লিখতে পারেন; কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষাটি কৈশোরে, অভিবাসনের মাধ্যমে, আয়ত্ত করতে পারেন; তাকে নন-নেটিভ লেখক হিসেবে বর্গীকৃত করা হবে কিনা স্পষ্ট নয়; অন্যভাবে নির্বাসন বা অভিবাসনের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। ইউরোপ জুড়ে শ্রম অভিবাসনের দরুণ এই দ্বিতীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা ক্রমেই বাড়ছে।

এটি এখনকার বিশ্বে ট্রান্সন্যাশনাল লিটেরাচার এর এক ফর্ম; জাতীয় শৈলীগত বা সাংস্কৃতিক সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া রাইটিংকে তা ধারণ করে অপর একটি ভাষায় লিখিত হওয়া ছাড়াই। আর "এক্সট্রা টেরিটরিয়ালিটি' ও 'এক্সোফোনি' অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, কেবল তুলনামূলক সাহিত্যই নয়, বরং সাধারণভাবে ২১ শতকের লিটেরারি টেক্সটের মর্যাদার সাধারণ প্রশ্নের মধ্যেও পড়ে।' বহুরকম প্রণোদনা থেকে এক্সোফোনিক লেখক হয়ে উঠতে পারে : 'রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে, বিশেষ ভাষার শৈলীগত উপাদান খাপ খাওয়াতে, পরিহার করতে, অনুবাদের মধ্যে হারিয়ে যাবার ঝুঁকি এড়াতে, বা বিস্তৃত পাঠক লাভ করতে। কিছু কিছু এক্সোফোনিক লেখক অনুবাদক হয়ে থাকেন, তাদের নিজের রচনাসহ। তাই এক্সোফোনিক রচনার অনুবাদ 'শৈলীগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন ভাষার 'বিপরিচিতিকরণের' দরুণ সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই বিবেচনা ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি, ফরাসি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ন্যারেটিভসমূহের, প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত মনে করি।'

ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চাকরি সূত্রে, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, তথ্য অফিসারের দূতাবাসে চাকরির পাশে পাশে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বাংলা থেকে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি মূল হিসেবে রচনা করেছেন। অনুবাদে, মূল ইংরেজিতে রচনাতে সেসব ইংরেজি-ভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ধরে নেওয়া যায়; ষাটের দশকে বিশ্বে উপনিবেশ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ছিল; ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের বহু ভাষায় অনুবাদ ও সংবাদপত্রে সমালোচনা সেই আগ্রহের প্রকাশ; অথবা পাশ্চাত্যের স্বীকৃতির জন্যও নয়। বাঙালি মুসলমান সমাজ নয়, এশীয় দেশের উপনিবেশের মননগত স্বরাজ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নিয়ে আসেন ইংরেজি রচনাসমূহে; কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৩১ সালের তার প্রবন্ধ 'মননে স্বরাজ'-এ একই বক্তব্য রাখেন–

> ইতিহাস, দর্শন অথবা নৈতিক অনুশাসন–এখন যা কিছু বিদ্যা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে সচেতনভাবে অথবা অজ্ঞাতসারে একটা উদ্দেশ্য ও প্রচারমূলক মত ঢুকে থাকে। এর মধ্যে থাকে বৈদেশিক মানে আমাদের মূল্যায়ন, আমাদের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির নিরীক্ষা। এগুলির প্রতি আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত বিচারমূলক, সানুগত স্বীকৃতির নয়। ...বিনা সমালোচনায় স্বীকৃতি তো দাসত্বেরই নামান্তর। [কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ সংকলন, ২০১১, পৃ ১৩১]

এই দৃষ্টিকোণেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র-পরবর্তী রচনার অধ্যয়ন হতে পারে। এই অংশকে কোনোভাবে জাতীয় সীমানা বা জাতীয় সাহিত্যের সীমানায় বাধা যায় না। তার স্বতন্ত্র অধ্যয়ন দাবি করে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় এই সাহিত্যচর্চাকে মধুসূদন দত্তের রচনায় ফরাসি সাহিত্যের বাঙালি পরিগ্রহণ বলা যাবে না। বরং এতে যে দৃষ্টান্ত তাকে এক্সোফোনি নামের অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করা বেশি যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশের সাহিত্যের বা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিস্তৃত পরিধিতে রয়েছে এই ভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের আবেদন; নেশন বা ন্যাশনালিটির গণ্ডিতে সেসবকে আবদ্ধ না থেকে 'ট্রান্সন্যাশনাল লিটারেচারে'র বিবেচনা করতে হয়। এখনকার যুগে সাহিত্যের অধ্যয়ন কেবল জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে খণ্ডিত, সীমিত হয়ে পড়তে বাধ্য। বরং দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বে ইন্টারলিটেরারি ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি অধ্যয়ন করা হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে থেকে এই পদ্ধতি আরো বিস্তৃত হয়েছে। আন্তর্জাল এবং অন্যান্য ভিশুয়াল মাধ্যমসহ যোগাযোগের-বিনোদনের মাধ্যম লিটেরাচারের সীমানাকে লিখিত, মুদ্রিত সাহিত্যের সীমানার মধ্যে অনড় প্রাচীরের টিকে থাকতে দেয়নি। গত শতকে পুরনো জাতীয় সাহিত্যের বিপরীতে বিশ্বসাহিত্য ছিল তুলনার প্রেক্ষাপট। এখন আর একটা বিশ্বমাত্র নয়, ওয়র্ল্ডস অর্থাৎ বহু বিশ্বের অস্তিত্ব গণ্য করতে হচ্ছে। অভিজাত, জনপ্রিয়, ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকা, এশীয়, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, প্রান্তিক, মাইনর লিটারেচার, মৌখিক– এমন কোনোটি একক সার্বজনীন নয়, বিচিত্র ও বহু লিটারেচারকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে; একের সঙ্গে বহুর সম্পর্ক খুঁজতে হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক; ভাষাগত সংযোগে অনুবাদ, ক্রেওল, মিশ্রভাষা, পিজিওন এর মতো প্রসঙ্গ বিবেচনা করা হয়; কোনো কিছুকে একক, বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন, স্বয়ম্ভূ, দ্বীপের মতো গণ্য করা হয় না। আমাদের নেশনভিত্তিক সাহিত্য বিবেচনা বেশিদিনের নয়। নেশন বা রাষ্ট্রভিত্তিক লিটারেচারে নির্বাচনের রাজনীতি থাকে, শাসকের স্বার্থে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। নেশন

বা স্টেট এর আগেও সাহিত্য ছিল, ক্যানন বা অনুশাসনের ভুক্ত করার বালাই ছিল না। এখনকার সময়ে নেশনের সংজ্ঞা সাহিত্যের সমস্তকে ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্র বা নেশনভিত্তিক বিবেচনা থেকে লিটেরাচারকে বিবেচনায় আমরা অভ্যস্ত বলে কসমোপলিটান দৃষ্টিভঙ্গিকে লক্ষ করি না। তাই ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায় সীম বা নীল চাষের প্রসঙ্গের দেশকাল অতিক্রমী প্রেক্ষিত রয়েছে, ট্রান্সন্যাশনাল আবেদন রয়েছে, অনেক ব্যাপ্ত, বৃহত্তর তাৎপর্য থাকা গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

২.

অ্যান-মারির জীবনচরিতে প্রবেশ

এই নিবন্ধের অন্যতম উপলক্ষ অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্র সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : মাই হাজব্যান্ড অ্যাজ আই স' হিম* (২০২২); বিস্ময়করভাবে আন্তরিক, অকপট, জাতিবৈরতা হীন, ফরাসি অহংমন্যতা আবিল নয়। তাঁদের যাপিত জীবনের অসামান্য দলিল। আবার একে ওয়ালীউল্লাহ্ সৃষ্টিসম্ভারের এস্টেট গড়ে তোলার আর্কাইভকরণের সূচনা বলা যায়। বর্তমান ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির যুগে এই গ্রন্থ যেমন, তার সন্তানদের উদ্যোগে তাঁর নামের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এই চর্চায় নতুন বাঁক তৈরি করেছে। তাই ওয়ালীউল্লাহ্র জন্মশতবর্ষ পালনই নয় অ্যান-মারির অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ইমেজ, আলোকচিত্র সমন্বিত অ্যান-মারির এই টেক্সটটি ওয়ালীউল্লাহ্র রচনা মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পারে; প্রাথমিকভাবে অনুবাদে সম্পৃক্ত থাকা রচনাসমূহের অনুবাদকের অনুধাবনও বলা যায় একে। লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক জীবন মিলিয়ে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক একজন ফরাসিনী, বৃহত্তর অর্থে ইউরোপীয়; যার বিপরীতে ভারতীয় বা এশীয় বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের বি-উপনিবেশিক প্রয়াসের সাক্ষ্য মেলে অ্যান-মারির রচনায়। বিভিন্ন ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষক, সাংবাদিক, অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্নের জবাব হিসেবে এর সূত্রপাত। ওয়ালীউল্লাহ্র মৃত্যুর ২৫ বছর পরে ১৯৯৬ সালে অ্যান-মারি বাংলাদেশে আসেন। এর আগে বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সে যাওয়া অনেক ওয়ালীউল্লাহ্ সুহৃদকে চেনেন যাদেরকে আতিথ্য দিয়েছেন; এ পর্যন্ত হওয়া ওয়ালীউল্লাহ্ মূল্যায়নকে সংগ্রহ করেছেন; একাধিক রচনার অনুবাদ করার পাশে পাশে অপ্রকাশিত রচনাগুলোর প্রকাশের চেষ্টা করতে চান। বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় সেসব রচিত।

এই আগমনে বিভিন্নজনের সঙ্গে আদান-প্রদানে জন্ম নেয় এই গ্রন্থের মূল টেক্সটটি; ১৯৯৬-২০০৫ সালের বাংলা একাডেমি জার্নালে প্রকাশিত হয়, প্রশ্নোত্তরের প্রশ্নগুলো

বাদ দিয়ে উপশিরোনামসহ, *মাই হাজব্যান্ড ওয়ালি* নামে; পরে প্রথম আলো ২০০৩ সালের সংখ্যায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় ও ২০১২ সালে প্রথমা প্রকাশন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে আনিসুজ্জমানের ভূমিকাসহ। এর অনুবাদে কোথাও কোথাও অংশবিশেষ বর্জন করা হয়েছে। ২০২২ সালে সামসাদ মুর্তজার সম্পাদনায় এটি বিভিন্ন ইমেজ সমন্বিত হয়ে প্রামাণ্যকৃত হিসেবে প্রকাশিত হয় *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: মাই হাজব্যান্ড অ্যাজ আই স' হিম*: ওয়ালীউল্লাহ্ পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্র ভূমিকা ও কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্র গ্রন্থসজ্জাসহ। এর সঙ্গে যুক্ত আলোকচিত্রসমূহ দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠতে পারে। এই টেক্সটটির রচিত হবার পরের বছরই মাদাম ওয়ালীউল্লাহ্ মারা গেছেন।

মোট ৭টি প্রসঙ্গে এই স্মৃতিচারণ রয়েছে : দেখা হওয়া, ইউরোপ, বাঙালি মুসলমান, সর্বগ্রাসী পাঠক, পেইন্টার, লেখক, মানুষ। প্রাথমিকভাবে এটি ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যিক জীবনীর উপাদান ও তাঁর অনুপুঙ্খ জীবনী রচনার কাজে অমূল্য উপাদান হতে পারে। দ্বিতীয় বিবেচনা হতে পারে এটি ওয়ালীউল্লাহ্র রচনার অনুবাদকের করা বিশ্লেষণ বা অনুবাদকের ভূমিকা। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এই বর্ণনাকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে; তার অনুবাদ করা রচনাতেই এই মন্তব্য সীমাবদ্ধ রয়েছে। *লাল সালু*র ফরাসি অনুবাদ এবং *চাঁদের অমাবস্যার* ফরাসি অনুবাদের সূত্রে মজিদ ও আরেফ আলী চরিত্রের পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৫২ সালের থেকে হওয়া পরস্পরের আলাপের পরে ইউরোকেন্দ্রিকতার বিপক্ষে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়কে উপস্থাপন করেছেন; ইতিহাসের ক্রুসেডার বনাম মুসলমান সংঘাত থেকে এই অরিয়েন্টালিজমকে অবিনির্মাণ করেন; কীভাবে মুসলমান সমাজ 'আদার' হিসেবে উপনিবেশায়িত, স্টেরিওটাইপকৃত তারই প্রকৃতচিত্র ওয়ালীউল্লাহ্র রচনার উপজীব্য– কীভাবে তার প্রেক্ষিত বদল হয়েছে ও আগ্রহের ফোকাস সরে গেছে বৃহত্তর পরিধির দিকে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন বাঙালি মুসলমানের অধঃপতিত পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে। ওয়ালীউল্লাহ্র চিঠিপত্র দিনপঞ্জি থেকে এই যুক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করেন। তাদের যুগলের ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান ভ্রমণের পশ্চাদপটে উপস্থাপিত হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ। ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এশীয় দেশগুলোতে কীভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে, কীভাবে সেসব দেশের মানুষদেরকে মানবেতর জীবন-যাপন করায় প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি অনুভব করেছেন।

ইউরোপীয় ও অন-ইউরোপীয় বাস্তবতার প্রতিতুলনা ছাপিয়ে তারা বিশ্বসাহিত্যের সেরা রচনাগুলোও পাঠ করেছেন, নিজেরা মিলে আলোচনা করেছেন। এই জীবনযাপন ষাটের দশকের বিশ্বের নাম করা রাজধানীগুলোতে বাস করা ঔৎসুক পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়। তারই ফসল ওয়ালীউল্লাহ্র রচনার বিষয়বস্তুর অনন্যতা ও জঁরের অগ্রসরতা। যেভাবে চৈতন্যপ্রবাহকে আখ্যানের বিষয় করে অবরুদ্ধ সামরিক শাসনের অধীনে দিশাহীন নব-উপনিবেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। নদীর মৃত্যুতে

কান্না ধ্বনির মতো প্রাক-আধুনিক সংস্কারকে উপজীব্য করে নদীমাতৃক জনপদটির চেতনাকে বিউপনিবেশায়ন করে উপস্থাপন করেছেন। একাধিক উপন্যাসে নাটকে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করেন।

ইউরোপীয় মানদণ্ডকে বিশ্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের অনুকরণের পরিবর্তে ইউরোকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস*-এ, এবং *দ্য আগলি এশিয়ান*-এ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাকে; 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে স্বল্পায়তন রচনায় বালকের কল্পনায় নীল চাষী অত্যাচারী নীলকরদেরকে বিচারের সম্মুখীন করান।

এ ছাড়া অ্যান-মারি চিত্রকর, প্রচ্ছদ শিল্পী, ডিজাইনার, কিউরেটর, চিত্র সমালোচক ওয়ালীউল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন; শৈশবে অংকনের প্রতি আসক্তির জন্য শাস্তিভোগ করাই নয়, তাঁর আঁকা ছবি বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমদ, সাদেকুইন প্রমুখকে নিয়ে প্রবন্ধ ও চিত্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বৈশ্বিক আর্ট হিস্টরি তার অধিগম্য ছিল চিঠিপত্র, দিনপঞ্জিতে তার উল্লেখ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় বসে আঁকা কয়েকটি বিমূর্ত চিত্রকলার নিদর্শন টিকে রয়েছে।

লেখকসত্তার পরিচয় উঠে এসেছে কোন সময়ে কীভাবে লিখতেন, কোথায় কোন রচনাটি সম্পন্ন করেছেন; একাধিক রচনা সমান্তরালে লেখার তথ্যও রয়েছে। দীর্ঘ পরিকল্পনা ছিল রচনার ভাষা, আঙ্গিক ও উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী সম্পর্কে। উপলক্ষের লেখা বলতে তার রচিত নাটকগুলো। প্রকাশিত না হওয়া লেখার পরিমাণও কম নয়।

ওয়ালীউল্লাহ্র এই অপ্রকাশিত রচনাগুলোর সৃষ্টির সময়েই জানান লেখক হিসেবে জীবনধারণের সম্ভাবনা হীনতা সত্ত্বেও সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি দিয়ে জীবিকা অর্জনের ঝুঁকি নেবার কথা ভাবছেন; যাই কিছু ঘটুক লেখা চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তার কথায় 'লেখাই মূলশক্তি', তাই স্বীকৃতি পাবার চেয়ে পাঠকের পরিচয় পেলে সন্তুষ্ট হতেন।

তার মতাদর্শকে শেষ অংশে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমান হিসেবে; মুসলিম বিশ্বেও পরিচয় নেওয়া অজ্ঞেয়বাদী বা অবিশ্বাসী হিসেবে। পাশ্চাত্যের উন্নতির আগের মুসলিম সভ্যতার উন্নত অবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করতেন। ষাটের দশকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি ও দারিদ্র্যের কবল থেকে নিষ্কৃতির লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হন। সমাজের পরজীবী শ্রেণি নিজেদের ধূসর অস্বস্তিকর অতীতকে ভুলতে ইউরোপের ব্যবহারিক সমৃদ্ধিও অন্য পিঠে মুসলিম শাসনকে আলো তাপহীন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে স্থাপন করে। অনগ্রসর মুসলমান বাঙালি সমাজের সামনে এই অসত্য ইতিহাসের স্বরূপ উন্মোচন করতে লেখনী ধারণ করেন। তার কথায় সমাজের পিছিয়ে পড়া চৌদ্দআনাকে

নিয়ে নিজের রচনাকে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন; হাবিবুল্লাহ বাহার ছিল তরুণ সাহিত্যসেবী ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রেরণা। মৃত্তিকা সম্পাদক আফসারউদ্দিন ছাড়া তার বন্ধুদের মধ্যে হৃষীকেশ লাহিড়ী, সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দিন, এ কে নজমুল করিম, শওকত ওসমান, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, আবু সাইদ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে বহুবার এই আদর্শ ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ কি গোড়া ওয়াহাবি ইসলামি মতাদর্শের ভাষ্য রচনা করতে চান; তাকে প্রাকটিসিং মুসলমান বলা যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে জানান সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান হিসেবে গর্ববোধ করেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নয়। মুসলিম বিশ্বের পক্ষে তার যুক্তিতর্ক দাঁড় করাতে অক্লান্ত শ্রম প্রকৃত পশ্চিমা দৃষ্টিতে 'আদার' বা অপর হওয়ার বিপরীতে ছিল। এজন্য আলজেরিয়া যুদ্ধের পরে, বিদ্বেষের শিকার হওয়া মুসলিম দেশগুলো যেখানে মধ্যপ্রাচ্য তেল সম্পদে মালিক হবার ফলে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আরব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেডের ভিন্ন চিত্র দাঁড় করান। যদিও বাঙালি মুসলমানদের আরব ইরান থেকে আগত হিসেবে নিজের অবস্থা ভুলে গর্ববোধ করাকে সমর্থন করেন না।

৫০/৬০ এর দশকে ওয়ালীউল্লাহ্ বামঘেষা অবস্থান নেন; বান্দুং কনফারেন্সে এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশের একত্রিত মানুষদের আন্দোলন তাকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রগতির পথে মানবজাতির প্রতিশ্রুতির কাল, *দ্য আগলি এশিয়ান* সেই সম্ভাবনার বিপক্ষে মার্কিন আগ্রাসনকে উন্মোচিত করে। কমুনিজম বিরোধিতার নামে এশিয়ার দেশটির মানুষদেরকে অনাহারে রাখার ষড়যন্ত্র করে। পারিবারিক পরিসরে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়ে শেষ হওয়া এই টেক্সটটির কোথাও কোথাও দুএকটা তথ্যগত অসঙ্গতি রয়েছে (যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র এম এ করা); সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে স্মৃতি থেকে অনর্গল উদ্ধৃত করেছেন তিনি। লেখককে তার দেশকালের প্রেক্ষিতে বিচার করার জন্য প্রামাণ্য জীবনীর প্রয়োজন হয়। প্রামাণ্য ও পূর্ণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যিক জীবনীর অভাব মেটাবে এই গ্রন্থ।

টেক্সট, হাইপারটেক্সট, আর্কাইভ

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে একটা ফর্ম রয়েছে যাকে বলা হয় টেস্টিমনিয়ো; উপন্যাস, ইতিহাসতত্ত্ব ও আত্মজীবনীর এলাকার মধ্যে তা পড়ে। অনির্ধারিত আখ্যান জঁরের মধ্যে স্ফটিকায়িত ঐতিহাসিক স্মৃতি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে রেকর্ড করার রাজনৈতিক চর্চা রয়েছে। যেমন এদুয়ার্দো গালিয়ানোর *ডেজ অ্যান্ড নাইটস অফ লাভ অ্যান্ড ওয়ার* (৭০ র দশকের স্বৈরাচারের অধীনে লাতিন আমেরিকানদের সাক্ষ্য)।

এখন জিজ্ঞাসা হলো *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : মাই হাজব্যান্ড অ্যাজ আই স' হিম*– রচনাটি কোন জঁরের অন্তর্গত হবে। শিথিল অর্থে একে ওয়ালীউল্লাহ্ স্টাডিজ বলা যেতে পারে;

কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ, অরিয়েন্টালিজম, স্মৃতি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের মিশ্রণ। তার 'আনফিল্টার্ড' টেস্টিমনি। আবার অ্যান-মারি নিজে ওয়ালীউল্লাহ্র রচনার অন্যতম অনুবাদক; সেই সূত্রে তাঁর রচনার অনেক ব্যাসকূটও তার জানা; কিন্তু এ-ও মনে রাখতে হবে বাংলা পড়তে তত সড়গড় ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লক্ষ করি ওয়ালীউল্লাহ্র সম্পর্কে রচিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে তার সার্বিক ধারণা রয়েছে; কীভাবে তা সম্ভব হয় তার উত্তরে জানান ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর রুহুল আমিন এর সহায়তায় এসব সম্পর্কে অবহিত হতেন। তাতে ওয়ালীউল্লাহ্র মূল্যায়ন করা গ্রন্থগুলোর বক্তব্য তার অজানা ছিল না।

এই সঙ্গে সাহিত্যের শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্বের অন্য দেশের সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্র রচনার প্রাপ্য বিবেচনা করতে সমর্থ হয়েছেন অ্যান-মারি; বিশ্বসাহিত্যের পাঠক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্র সঙ্গে যৌথপাঠের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। ইংরেজি অনুবাদেও, ইংরেজির মধ্যস্থতায় ওয়ালীউল্লাহ্র রচনা ও তার মানস উপলব্ধি করতে পারেন; তার রচনাকে যেমন, এর ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক ভিত্তিকেও। প্রাচ্যের, এশিয়ার কোনো দেশের সাহিত্যকে ইউরোপীয়, বা উত্তর আমেরিকার মানদণ্ডে হেয়, নিম্নমানের করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি; ওয়ালীউল্লাহ্র সঙ্গে মিলে বাঙালি মুসলমান এর উপনিবেশিত 'অপরত্বে'র অবস্থাটিকে অনুধাবন করেছেন বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের সাহিত্যেও ইংরেজি অনুবাদে পড়ার মতো করে; ওয়ালীউল্লাহ্র বহু-বিস্তারী পাঠনের সঙ্গী হিসেবে তার কসমোপলিটান দৃষ্টিভঙ্গি অস্পষ্ট ছিল না। উদার বৈশ্বিকতা ছিল তাদের সাহিত্যদৃষ্টিতে।

এক সময়ে ফরাসিরা ইংরেজি জানলেও বলতে চাইত না, ফরাসি না-জানা কারো প্রশ্নের জবাব দিত না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরে তার বদল ঘটে। ফরাসিনী অ্যান-মারি ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করেন ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে চাকরি করতে আসেন। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজি সাহিত্য, ব্রিটিশ উপনিবেশের কমনওয়েলথ সাহিত্য, ইংরেজি অনুবাদে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। ফরাসি দেশে জন্মানোর সঙ্গে এই ইংরেজি মাধ্যম তার বাড়তি যোগ্যতা; অনুবাদকের আত্মবিলোপী ব্যক্তিত্বের ভূমিকায় নামেন; তার দ্বারা সম্পন্ন হয় ওয়ালীউল্লাহ্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার বিশ্বস্ত অনুবাদ, লেখক অনুমোদিত অনুবাদ। *ট্রি উইদাউট রুটস* এবং *নো অমরন্থ* থেকে; চারজন অনুবাদকের করা *ট্রি উইদ আউট রুটস* থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে *লা'রবর সঁ রাসিন* অনুবাদ করা হলে প্রথম তা স্পষ্ট হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যার হিসেবে *লাল সালু*র বাংলা, ইংরেজি, ও ফরাসি সংস্করণে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। যথাক্রমে ১১৬ পৃষ্ঠা, ২২৩ পৃষ্ঠা ও ১৯০ পৃষ্ঠা। এই অনুবাদে গ্রহণ-বর্জনে যে পরিবর্তন ঘটেছে লেখকের অনুমোদন ছাড়া সেই স্বাধীনতা নেওয়া সম্ভব হত না। লাল সালু কাপড়ে ঢাকা ধার্মিক শ্রাইন বা মাজার পাল্টে যায় শেকড়হীন

বৃক্ষের প্রতীকে: আউয়াল পীরের সঙ্গে বাহাসের প্রসঙ্গ বাদ পড়ে। মাদ্রাসা শিক্ষা বনাম ইংরেজি স্কুলে শিক্ষার বিরোধের প্রসঙ্গ কমে আসে। উপন্যাসের শেষে জলের তোড়ে মাজারটি ভেসে যাবার উপক্রম করলে মজিদ তার বানানো অলীক সৌধটিকে আঁকড়ে ধরে। বাংলা সংস্করণে ক্ষমতার কেন্দ্র মাজারটিতে ফোকাস করা, উপনিবেশিক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে কল্পিত 'মোদাচ্ছের পীর'র কবর শাসক মজিদের শক্তির উৎস। ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে মিথ্যার কাঠামোয় বাঁধা মজিদের উন্মূলতা মূল থিম হয়। বাংলা উপন্যাসটি ও এর ইংরেজি ট্রান্সক্রিয়েশনের মধ্যে দুই দশকের কাছাকাছি সময়ের ব্যবধান। ততদিনে ওয়ালীউল্লাহ্ পরিণত হয়েছেন এবং চারপাশের পরিবেশও অনেকখানি পাল্টে গেছে; উপমহাদেশের দেশভাগের আগে এর রচনা শুরু ও ভারতভাগের পরে শেষ হয় *লাল সালু*; ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সালু কাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজার আড়ালে চলে যায়, পরজীবী অস্তিত্বের চেহারা সামনে আসে; উপন্যাসের ফর্মের এই বিকাশ নতুন পাঠকশ্রেণির অস্তিত্বকে খেয়াল রেখে রচিত এবং চৈতন্যপ্রবাহকে অনেক বেশি কাজে খাটাতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির অনুবাদ প্রসঙ্গে অ্যান-মারির সূত্রে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জর্মন অধিকৃত ফ্রান্সের ল'উমানিতে সাময়িকীর সম্পাদক গাব্রিয়েল পেরিকে নাৎসি বাহিনী ঘুষ দিয়ে ও নির্যাতনে পক্ষ ত্যাগ করাতে না পেরে হত্যা করে। পল এলুয়ারের কবিতায় এই হার না-মানা উন্নত শির সত্যান্বেষীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আছে। একই আরেফ আলী একজন 'ক্লিন ম্যান'র ভূমিকায়, এক অপরাধের জ্ঞান তাকে নিষ্পাপ থাকতে যে ভূমিকায় চালিত করে; নব্য-উপনিবেশের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অধিকারহীনতা, বিচারহীনতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান; প্রান্তিক নারী হিসেবে মৃত মাঝির স্ত্রী, প্রাক্তন ভূস্বামী ও ব্রিটিশভক্ত সাবেক সরকারি কর্মচারী দাতা সাহেব, দরিদ্র শিক্ষক আরেফ আলীর আতরাফ পরিচয় শ্রেণিহীন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিকে উপহাস করে; দাদা সাহেব, কাদের, স্কুলের ধর্ম-শিক্ষক এই রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাহক; স্থানীয় পুলিশের সমর্থক, সম্পূরক ভূমিকা সামরিক শাসনের অধীনে নির্যাতিত পূর্ব-বাংলাকে নাৎসি অধিকৃত ফ্রান্সের সমান্তরালে স্থাপন করে। তথ্য কর্মকর্তার কাজে ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তানের 'সেল্‌সম্যান' এর দায়িত্ব পালন করতে করতে হাঁফিয়ে উঠছিলেন অ্যান-মারির বয়ানে জানা যায়। এই কাউন্টার ডিসকোর্স তারই প্রকাশ।

উপসংহারের আগে

অ্যান-মারি হয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র গৃহিনী থেকে সখা, সচিব, ললিত, কলা বিধৌ–আধুনিককালেও লেখকের স্ত্রী হিসেবে বহু দায়িত্ব তাকে সামলাতে হয়েছে। বেশির ভাগ লেখকের স্ত্রী রচনার স্বত্বের উত্তরাধিকারী হবার চেয়ে বেশি সম্মান পান না; তাও অন্যান্য উত্তরসূরিদের দাবিকে জায়গা দিয়ে।

সৃষ্টিশীল লেখকের অ-লেখক স্ত্রীর ক্ষেত্রে অনাহূত অনধিকারী হিসেবে গণ্য করাকে নিয়মিত, ন্যায্য মনে করা হয়। তলস্তোয়ের স্ত্রী বিশাল আকারের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিকে একাধিক কপি করার জটিল-শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন; গৃহকর্মের অপরিশোধিত শ্রম ছাড়াও লেখকের সৃষ্টির তত্ত্বাবধানও তার উপরে জমা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের স্ত্রী আমজনতা বা সাধারণ পাঠকের বেশি কেউ নয়। এইসব সাহিত্যের-বাস্তবের দৃষ্টান্তে দম্পতিরা একই সংস্কৃতির অন্তর্গত; সংস্কৃতিগত ব্যবধানে এই সম্পর্ক কী রকম হতে পারে সতীনাথ ভাদুড়ীর সত্যি ভ্রমণকাহিনীতে রয়েছে। লেখকের হোটেল পরিচারিকা অ্যানির প্রতি এক তরফা প্রেমে পড়া ও মোহভঙ্গ হবার কাহিনি।

বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসু যেমন অনন্য লেখক দম্পতি, যে দৃষ্টান্ত বেশি পরিমাণে নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'বৌ' গল্পগ্রন্থেও সাহিত্যিকের 'বৌ' নামের গল্পে দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুর্যকান্তের সঙ্গে অনুপযুক্ত সহধর্মিণীর পরিণতি ঘটেছে মৃগী রোগের আক্রমণে পরাজিত হিসেবে; মনে পড়তে পারে জীবনানন্দ দাশ-লাবণ্য দাশের দাম্পত্য এর অন্য পরিচয় বহন করে। এমন দৃষ্টান্ত কমই রয়েছে লেখক দম্পতির দুজনেই সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত এবং পরস্পরের রচনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও সশ্রদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। পরস্পরের সৃষ্টিশীলতাকে সমানতালে চালিয়ে নেওয়ার পরিস্থিতি থাকে না; বেশিরভাগই একজনের সারস্বতচর্চাকে অব্যাহত রেখে অপরজনকে আত্মত্যাগ করতে হয়। এই আত্মবিসর্জনকেও ভোলা উচিত নয়।

এছাড়া লেখকের জীবদ্দশায় লেখকের স্ত্রী বিশেষ মর্যাদা বা লোকসমাজে পরিচিত থাকেন না। তার নিজের মনস্বিতাও আড়ালে পড়ে যায়; লেখকের জীবনাবসানের পরে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী মনে করা হয়। যে দেশে লেখকরা নিজেই গ্রন্থস্বত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন তার উত্তরাধিকারীদের বেলাতেও তাই বর্তায়।

মাদাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মূল্যায়নকে বিবেচনার ক্ষেত্রে সরল অনধিকারী রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দেখার উপায় নেই। অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে অ্যান-মারি থিবোর সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আলাপ হয়; পরিচয় থেকে পরিণয়ে পৌঁছতে আরো কয়েকটা বছর দেরি হয়। জাতি, ভাষা, ভূগোলের দূরত্ব দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করে এসেছেন অ্যান-মারি ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে; পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া একজন এশীয় যুবকের ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান ও বিপুল জানাশোনা তাকে মুগ্ধ করেছিল। বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয়হীন, অনায়ত্ত অ্যান-মারি তার চেয়ে দশ বছরের প্রায় বয়সে বড় ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বিয়ে করেন ধর্মান্তরিত হয়ে,

আজিজা মোহম্মদ নাসরিন নামে কাবিন সম্পন্ন হয়। ফরাসি নাগরিকত্ব, ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক অ্যান-মারি চাকরিসূত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতোই পরবাসী; তার উপরে নিভৃতচারী, অন্তর্মুখী, সাহিত্যপ্রেমী, কলা-রসজ্ঞ হওয়াটা দুজনের মধ্যে সাধারণ মিল। অ্যান-মারির ক্ষেত্রে দেশে ফেরার টান ততোটা নয়, তবুও ষাটের দশকে পারীতে বসবাস করতে পেরে সুখীই হন; ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিদেশে স্থায়ীভাবে থাকবেন কিনা এমন দোটানায় ভুগেছেন। স্থায়ীভাবে অনাবাসী হওয়ার কথা ভাবেনও নি। আবুল ফজলের করা সমালোচনায় ব্যথিত হন। 'বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটেনি : মানে ইমিগ্রেন্ট-এর দলে ঢুকিনি', শওকত ওসমানকে চিঠিতে লেখেন। ঢাকায় বাড়ি কিনেছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে বক্তৃতায় আশাবাদ জানিয়েছিলেন। ততদিনে তার আগ্রহের ও চর্চার ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে। *নয়নচারা* (১৯৪৫), *লালসালু* (১৯৪৮) প্রকাশের পরে সাহিত্যিকের অনিশ্চয়তার জীবন অথবা কর্মসূত্রে বিদেশে থাকার মধ্যে টানাপড়েন লক্ষ করা যাবে। আক্ষেপ করবেন একটা পর্যায়ের পর নিজে জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করাটা শক্ত হয়ে পড়বে।

১৯৯৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রকাশনা, যোগাযোগ রক্ষা করেন প্রকাশকদের সঙ্গে। একাধিকবার স্বামীর সঙ্গে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন, বাঙালি সংস্কৃতির বহু দিক শিখে নেন। আমৃত্যু তাঁর রচনার অনুবাদ, সম্পাদনা, আর্কাইভকরণের দায়িত্ব পালন করেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র অকালমৃত্যুর পরে অপ্রকাশিত রচনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন ও প্রকাশে উদ্যোগী হন। একাধিক রচনার ইংরেজি ও ফরাসিতে অনুবাদ করেছেন। অ্যান-মারির করা *চাঁদের অমাবস্যার* ফরাসি অনুবাদ *লা লুন নোয়ার* প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন উপলক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। অথচ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তার জীবনের শেষ দশক ছাড়া অর্ধ-শতাব্দীর জীবনে ফরাসি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা হয়ে উঠবে না; যে সময় পর্বটি তার জীবনে অন্যতম ফলবাস বহুপ্রসূ হিসেবে দেখা দিয়েছে। *চাঁদের অমাবস্যা* রচিত হয় আল্পসের পাশে ফ্রান্সের ইউরিয়াজ অঞ্চলে; হল্যান্ডের লিসবন এর কাছে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে রচিত হয় *কাঁদো নদী কাঁদো*, যেখানকার সমতল ভূমি বাংলার নদীমাতৃক নৈসর্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। চট্টগ্রামের ষোলোশহরের নব্যতা হারানো বাঁকুলিয়া নদী বা খালটি বাঁকাল নদী হিসেবে কল্পনার উৎস ছিল বলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ গবেষকরা অনুমান করেন। দীর্ঘ চাকরি জীবন শেষে ইউনেস্কোর অফিসে করাচিতে বদলি না নেওয়ায় চাকরি হারান। কর্মহীন থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্সে ও লন্ডনে জনমত সংগঠন করেন। দেশ স্বাধীন হবার অল্প আগে মারা যান। কোনোরকম আর্থিক সুবিধা লাভ করেননি। এই দুরাবস্থায় অ্যান-মারি ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ এ

দক্ষিণ এশিয়ার স্টাডিজ বিভাগে চাকরি নেন। ১৯৮৫ সালে ওয়ালীউল্লাহ্ একুশে পদক পেলে তার সন্তানদের আসা-যাওয়ার ভাড়া তাদের মাতামহী জোটান। ১৯৯৬ সালে ঢাকায় এসে প্রাপ্য গ্রন্থস্বত্বের অর্থ-উদ্ধার করতে পারেননি।

উপসংহার

সমালোচকরা তাদের নিজের মতো করে লেখকের রচনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন; তাদের ছাড়াও বর্তমান সময়ে লেখকের অভিপ্রেত অর্থের পরিবর্তে পাঠকের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন শুরু হয়েছে। 'রচয়িতার মৃত্যু'র সুবাদে টেক্সটের স্বাধীনতা বিচার করে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। প্রেক্ষিত, আত্মপরিচয় অনুসারে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই শতবর্ষে এসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার সাবজেক্টিভ অর্থাৎ বিষয়ীগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাননের বাইরে পাঠক-টেক্সটভিত্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

সাধারণত লেখকের রচনা, চিঠিপত্র, দিনপঞ্জি, অন্যান্য ব্যক্তিগত স্মারকসহ লেখকের নামে সংগ্রহশালা বা আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়; লেখকের এস্টেট বা ফাউন্ডেশনও এমন সংগ্রহ পরিচালনা করে। যার সহায়তায় লেখকের রচনার অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে। অল্প কিছুদিন আগে তাঁর সন্তানেরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন; তাদের কাজেরই গোড়াপত্তন করে গেছেন অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্। এখনো ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলির প্রমিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, উপযুক্ত সাহিত্যিক জীবনীও নয়। ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ট্রাডিশনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই উপলক্ষে সেই গুণগ্রাহী মনস্বিনী নারীকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের চেয়ে ভাবীকালের জন্য দিশা হিসেবে তার কৃতীকে স্মরণ করা উচিত। আগামীতে নতুন নতুন আলোচক অনাবিষ্কৃত বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ মূল্যায়ন করবেন।

ওয়ালীউল্লাহ্‌চর্চার এই অনারব্ধ লক্ষ্য একদিন অর্জিত হবে আশা করি।

আকর গ্রন্থ

Anne-marie Waliullah, *Syed Waliullah. My husband as I saw him*, nymphea, Dhaka, 2022

Syed Waliullah, *How does one cook beans-An Asians adventure in France*, [under the penname Abu Sharya], 1965, typescript

Syed Waliullah, *The Ugly Asian*, [under the penname Abu Sharya] Niaz Zaman ed, Bangla Academy, 1969

Syed Waliullah, *Tree Without Roots*, Paris, 1967

Syed Waliullah, *L'arbre Sans racine*, Anne-marie Waliullah, tr. Paris, 1961

Syed Waliullah, 'Joynul Abedin: A Victim of Frank Criticism', Karachi, 1955

Syed Waliullah, 'Le System de castes', Paris, 1965

Syed Waliullah, *Diaries*, October, 1954, 10 november, 1954, 26 november, 1954

সয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা, ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৬, ১৯৮৭

সয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, 'একটি বিচারকের কাহিনী', (অপ্রকাশিত)

সহায়কপঞ্জি

আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা, ১৯৭৬
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, *প্রবন্ধ-সংকলন*, কলকাতা, ২০১১
জুলফিকার মতিন, *বাঙালি মুসলমান ও তার মন*, রাজশাহী, ২০১৭
সুমন গুণ সম্পা. *তুলনামূলক প্রযোজনা : একটি তীর্যক প্ররোচনা*, কলকাতা, ২০১১

[সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা ॥ বাংলা বিভাগ, বাংলা সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ পৌষ ১৪২৯, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২]

আবুল হোসেনের জন্মশতবর্ষ
(১৯২২-২০১৪)

নিরাভরণ মানবব্যক্তিত্ব কবি আবুল হোসেন

জুনান নাশিত*

১.

কবি কেন কবিতা লেখেন? কেউ তাকে বাধ্য করে? না লিখে কি উপায় নেই? তিনি কি মুক্তি খুঁজে পান না আর কোনো কিছুতেই? এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন করা যায় কবিতা নিয়ে। প্রশ্ন যাই থাক, শেষপর্যন্ত কবিতা লেখাই যে কবির অনিবার্য নিয়তি এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ থেকে তার ছাড় নেই, মুক্তিও নেই। মুক্তি কে দেবে তাকে? স্বয়ং ঈশ্বর? আমার অন্তত জানা নেই। মুক্তির উপায়ও কি আসলে তিনি খোঁজেন, খুঁজতে চান? মূলত চাইলেও তিনি তা পারেন না। তাই কবিতার রক্তক্ষরণের পথে কবি এক নিঃসঙ্গ, নির্জনও বেদনাবাহী যাত্রী। কবিতাতেই তার মোক্ষলাভ। কবিতাই তার আরাধ্য সারথী।

কবিতা উঠে আসে গভীর বোধ, আবেগ ও উপলব্ধি থেকে। আর উপলব্ধির প্রকাশ জরুরি। মানুষ গভীর অনুভবের বিষয়গুলো কবিতাতেই প্রকাশ করতে চায়। এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। ঠিক কি কারণে কোন প্রেক্ষিতে একজন কবি কবিতা লিখতে শুরু করেন তার সঠিক ব্যখ্যা দেয়া প্রায় অসম্ভব। কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ধরনের আকস্মিকতা থাকে। আবার কারো ক্ষেত্রে তেমন কিছুই থাকে না। তবে একটা বীজ নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে অংকুরিত হতে শুরু করে। তোলপাড় চলে সমস্ত সত্তায়। হঠাৎ কোনো ঘা এসে লাগায় তা স্ফুলিঙ্গ হয়ে ভাষার আকারে প্রকাশ পায়। কবি হয়ে ওঠা হয়তো তখন নিয়তি নির্ধারিতই হয়ে যায়–

---

*কবি ও সাংবাদিক

> কাঁটার জন্যে না,/বাঘের ভয় বা /দুর্গম বলেও নয়,/শুধু যদি জানতাম/এ পথ এমন নিঃসঙ্গ, নির্জন,/পিচ্ছল বৃষ্টিতে,/শুকিয়ে আমসি শীতে,/রোদে পুড়ে,/আজীবন মাথা খুঁড়ে/একাই হাঁটতে হয় সারাক্ষণ,/তা হলে কি সব ছেড়ে ছুড়ে/এই খেইহীন পথ কখনও নিতাম?/ নাকি, চাই বা না চাই/ এ পথে আসাই ছিল আমার নিয়তি।/ এ ছাড়া আমার ছিল না, ছিল না গতি। (*রাজকাহিনী* : নিয়তি)

কবিতাংশটি কবি আবুল হোসেনের। বিশশতকের চল্লিশ দশক যার উন্মেষকাল। তিনি আধুনিক মনন এবং নাগরিকবোধের কবি। কবি হওয়াই যার নিয়তি ছিল। মুক্তি খুঁজেছেন কবিতাতেই। তিনি তার কাব্যযাত্রার শুরুর ঘটনা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ স্বীকার করেছেন। রবিঠাকুরের 'গগনে গরজে মেঘ' পড়েই কবিমনে ভাবনার উদ্রেক ঘটে। তখন তিনি ক্লাশ ফোরের ছাত্র। শুরু করেন কবিতা লেখা। এটা কি নিয়তি নির্ধারিত? কবি অন্তত তাই মনে করেন। তাইতো উল্লিখিত 'নিয়তি' কবিতায় তিনি তার বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরেন। তবে কবি হওয়ার শুরুর দিকটা যতোই নিয়তি নির্ধারিত থাক, দিনে দিনে কবি হয়ে ওঠা যাকে বলে তাতে থাকে নিবিড় চর্চা, পঠন-পাঠন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং সর্বোপরি গভীর ধ্যান।

আধুনিক ও নাগরিক অভিধা যার কপালে জুটেছে সেই কবি আবুল হোসেন যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখনও রবীন্দ্র-নজরুলের প্রভাব বলয় শেষ হয়ে যায় নি। রবীন্দ্র-নজরুলের প্রভাব বলয়কে অস্বীকার করে তিরিশের আধুনিক কবিরাও সমান সক্রিয়। কেবল সক্রিয়ই ছিলেন না, পৌঁছে যাচ্ছিলেন শিখর চূড়ায়। তারা সমাজমনস্কতা থেকে দূরে থেকে আমিত্বের বলয়ে থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেন। কিন্তু শেষাবধি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দেসহ সকলকে এই বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল স্ব-সময়। কারণ চল্লিশের দশক ছিল মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা আর দেশবিভাগের নিঃসীম বেদনায় ক্ষতাক্ত। তাই তিরিশের কবিকুলকেও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছিল সময়। আর এ দশকেরই তরুণকবি আবুল হোসেনও সময়কে ধারণ করেছেন, বলা যায় সার্থকভাবেই, একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে। তিনি যে সময় এবং সমাজকে বোধের তীব্রতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় তারই লেখা 'আধুনিক সাহিত্যিক' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য কার জন্য? শিল্প কিসের জন্য? কেন লিখবো? বলার সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো– আর্টস ফর আর্টস সেক, যারা আরেকটু দুঃসাহসী তারা তো সোজাসুজি বললেন, আর্ট ফর মাই সেক– সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, আমার জন্যই সাহিত্য, সমাজকে জানি না, জানতে চাই না, তুমি কে? তোমাকে তো চিনি না? আমি লিখি আমার জন্য। সাহিতযেন সেই উর্বসীর মতো, বৃন্তহীন পুষ্পসম যে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। আমি সাহিত্যিক আমি কেন তোমাদের খোঁজ নেব; তোমাদের না হলেও আমি চলতে পারবো আমার মত করে। ফলে সাহিত্যের অপমৃত্যু হলো গুহায়িত হয়ে। ... সাহিত্যিকরা তাই ঠেকে শিখেছেন আসল গলদ কোথায়। সমাজ আমার পেছনে নেই বলে আমিও সমাজের ধার ধারি না, এই ধরনের অভিমানে কারো কোন লাভ

নেই। সাহিত্যিককে বাঁচতে হলে সমাজকে আঁকড়ে ধরেই উঠতে হবে। তার রচনা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে, শুধু তাই নয়, নূতন সমাজ মানস সৃষ্টি করবে।'

সমাজমনস্কতা ও স্বাতন্ত্র্যের অঙ্গীকার নিয়েই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নব-বসন্ত* প্রকাশিত হয় কলকাতার বুলবুল হাউস থেকে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত শিল্পী রামকিংকর বেইজ। কবির বয়স তখন মাত্র আঠারো। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। ততদিনে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূচিত্রে তিনটি দেশের মানচিত্র অংকিত হয়ে গেছে। ভারত ভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকে কবি ঢাকায় বাস শুরু করেন স্থায়ীভাবে। তাই *নব-বসন্তের* দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ঢাকা থেকেই। তৎকালীন কলকাতায় সাহিত্য অঙ্গনে আবুল হোসেনের *নব-বসন্ত* বেশ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। চল্লিশের সময় বৈশিষ্ট্যধারণ করা বইটির অধিকাংশ কবিতাতেই জীবন, সমাজ, রাজনীতি, দেশ তথা সামগ্রিকতার ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে– সারেঙ, ঘোড়সওয়ার, স্বপ্ন, তবু, আমার সোনার দেশ, পটভূমি, স্বগত, উত্তরাধিকার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ কাব্যের বাংলার মেয়ে, ডাইনামো, ঘোড়সওয়ার বেশ আলোচিত কবিতা।

বিতর্ক থাকলেও এ কথা বলাই যায়, কবিতা একটি বিশুদ্ধ ভাষা-নির্ভর শিল্প। ভাষাকে বিনির্মাণের মাধ্যমেই কবির প্রকাশ শৈল্পিক হয়ে ওঠে। আবুল হোসেন এ শিল্প তৈরিতে বরাবরই সহজ-স্বাভাবিকতার পথ বেছে নিয়েছেন। কবিতা যতো না প্রেরণাগত তারচে অধিক পরিকল্পনাগত, ত্রিশের এ কাব্যাদর্শকে মেনে তৈরি করেছেন নিজস্ব কাব্যপথ। আবেগী কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বিশ্লেষণজাত মনোভঙ্গীতে কবি আবুল হোসেন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র ও ভিন্ন এক কণ্ঠস্বর।

২.

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে মূলত বাংলা কবিতার আধুনিকতার যাত্রা শুরু। যদিও ইউরোপে কবিতায় আধুনিকতার যাত্রা আরো বেশ আগেই শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে ফরাসী কবি বোদলেয়ারের *ফ্লুর-দ্য-মাল* বা *ক্লেদজ কুসুমকে* ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার প্রথম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে বোদলেয়ারের কবিতা দিয়ে ইউরোপীয় কাব্য-আধুনিকতাকে চিহ্নিত করা হলেও মূলত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে কবিতার আবির্ভাব ও বিকাশ তাকেই আধুনিক কবিতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। আগেই বলেছি মধুসূদনই বাংলা কবিতায় প্রথম আধুনিকতার প্রবেশ ঘটান। এরপর রবীন্দ্রনাথ হয়ে তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবখ্যাত বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে'র কাছে কবিতার আধুনিকতা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। বস্তুত বলতে গেলে মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আধুনিকতার ছিল একটা প্রস্তুতি পর্ব। রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত কবিতা ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক। তিরিশের আধুনিক কবিদের হাতে তা হলো একান্ত ব্যক্তিহৃদয়ের

অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। অর্থাৎ কবিতা হয়ে উঠল আমিত্বময়। এরপর চল্লিশ দশকে যখন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন কবিতায় বিশেষভাবে যুক্ত হলো সমাজমনস্কতা। আমিত্ব থেকে কবিতা রূপান্তরিত হলো আমরায়। এ ছাড়া সমাজমনস্কতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে রাজনীতিমনস্কতাও। তবে ব্যক্তিমনস্কতা ও সমাজমনস্কতার সমন্বয় সত্তা যে কবির ভেতর মিশেছে তার কবিতার প্রকাশ হয়ে উঠেছে সার্থক। যেমন এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কথা বলা যায়। কারণ সময়ের দাবিতে তার মতো আরো অনেককেই অন্তর্মুখীনতা ছেড়ে বহির্মুখীনতায় নোঙর ফেলতে হয়েছে অবধারিতভাবে।

আধুনিকতা একটি মতবাদ এবং এর ধারণাও অতো স্বচ্ছ নয়। তবু এ নিয়ে আমাদের কিছু কথা বলতে হচ্ছে এ কারণে আবুল হোসেন চল্লিশের আধুনিক কবি হিসেবেই স্বীকৃত। তাহলে তিরিশের কবিরা যখন রবীন্দ্রবিরোধিতার মাধ্যমে তার প্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতা লেখায় ব্রতী হলেন তখন বাংলা কবিতার আধুনিকায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বলা হলেও চল্লিশে এসে কিসের আধুনিকতা যুক্ত হলো কাব্যযাত্রায়? তিরিশের কবিকুল ইউরোপীয় আধুনিকতা নির্ভর যে কাব্যসম্ভার তৈরি করলেন চল্লিশের কবিকুল তা থেকে পুরোপুরি সরে না আসলেও আর্থ সামাজিক পরিবেশ তাদের বিষয়ীগত ভিন্নতার দিকে নিয়ে গেল। তারা হয়ে উঠলেন অনেকটাই দেশীয়। সে সময় সম্পর্কে আবুল হোসেনের নিজের বর্ণনাটি এরকম–

> চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজে কবিতায় যে রূপান্তর তা সম্ভব হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির গড়ে ওঠা আকাঙ্ক্ষা আবেগ অনুভূতিকে অবলম্বন করে। সমসাময়িক বর্ধিষ্ণু হিন্দু সমাজের শৈল্পিক, সামাজিক অভিযানের আদর্শ তো তার সম্মুখে ছিলই, সেই প্রেরণার দোসর হয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া। চল্লিশের মুসলমান তরুণরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। আর তার ফলে আমাদের সমাজে সাহিত্যে ও শিল্পে আধুনিকতার সূচনা।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কবিতার গতিপথও পাল্টে যায়। পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে যে একদল মুসলমান কবি-সাহিত্যিক তাদের সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন তাদের সূচনা কলকাতাতেই। কবি আবুল হোসেনের *নব-বসন্ত* যখন প্রকাশিত হয় তখন তার কাব্যিক সহযাত্রীদের কারো বইই প্রকাশিত হয়নি। সে অর্থে বলা যায় এটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো কবির লেখা প্রথম আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। সে সময়ে আবুল হোসেনের সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৬), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)।

ফররুখ আহমদের *সাত-সাগরের মাঝি* ১৯৪৫ সালে, সৈয়দ আলী আহসানের *চাহার দরবেশ* ১৯৪৫ সালে এবং আহসান হাবীবের *রাত্রিশেষ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। চল্লিশ দশকে আবুল হোসেনের সমসাময়িক আরো দুজন উল্লেখযোগ্য কবি সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়াও ছিলেন নরেশ গুহ, অরুণ কুমার

সরকার এবং বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অশোকবিজয় রাজা, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। এদের মধ্যে সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে আবুল হোসেনের নৈকট্য ছিল সব থেকে বেশি। তিনি সমর সেনের কবিতার অনুরাগী এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও ছিলেন। কবির *নব-বসন্তের* 'নবযুগ' কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছাপও স্পষ্ট। সুভাষের *পদাতিক* এর প্রথম কবিতা 'সকলের গান' এর প্রথম দুই পংক্তি, কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?/ কুয়াশা কঠিন বাস যে সম্মুখে।' অন্যদিকে আবুল হোসেনের *নব-বসন্ত* কাব্যের প্রথম কবিতা নবযুগের শেষ দুই লাইন 'কান পেতে দ্বারে সারা রাত জেগে রই/ আসে আসে সে যে শুয়ে শুয়ে শুনি।' দুটিতেই বিপ্লবের আসন্নতার সংকেত। *নব-বসন্তে* যখন আমরা 'বাংলার মেয়ে' পড়ি তখন রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট', 'ডাইনামো' যখন পড়ি তখন জীবনানন্দ দাশের 'রাত্রি', 'ঘোড়সওয়ার' পড়লে আমাদের বিষ্ণু দে'র কথা মনে আসে। কিন্তু গভীর মনোনিবেশে আবুল হোসেনের কবিতা পাঠে দেখা যায় এসব কবিতা একান্তভাবে তারই। প্রভাব থাকলেও তিনি তার পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর *নব-বসন্তেই* রাখতে পেরেছিলেন। তবে আবুল হোসেনের নিজস্ব বোধের এ স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হতে শুরু করে *নব-বসন্তের* (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশের পর। প্রথম সংস্করণের *নব-বসন্তে* নিজস্ব ডিকশন স্পষ্টভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি তিনি। বিশেষত 'অব্যক্ত', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'বিজয়ী' কবিতাগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়।

'অব্যক্ত' কবিতায় কবির ভাষাভঙ্গি এ রকম : 'নীরবে দাঁড়িয়েছিনু দূরে এক কোণে,/ তুমি স্নেহে/ জানাইয়াছিলে তব অযাচিত প্রীতি-আমন্ত্রণ,/ নিঃশব্দে নীরবে গিয়ে লয়েছিনু টানিয়া আসন।' এ ভাষাভঙ্গির সাথে পরবর্তীকালে আমরা যে আবুল হোসেনকে পাই তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। *নব-বসন্তে* কবি পূর্বসূরীদের প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে পারেন নি এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন : 'নব-বসন্তে আমি আমার কথা পুরোপুরি গলা খুলে বলতে পারিনি। নিজের মনের কথা নিজের মতো করে বলতে আমার আরও তিন চার বছর লেগে যায়। 'দিকনির্ণয়ে' এসে আমি তার সন্ধান পাই।' (*আমার এই ছোট ভুবন* : পৃ. ৮৩) যাকে বলে নিজের পথ খুঁজে নেয়া সেটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন মূলত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিরস সংলাপে*। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। প্রথম বই প্রকাশের উনত্রিশ বছর পরে। ততদিন ভিন্নপথের সন্ধানে লিপ্ত কবির নির্মাণ দিক একান্ত নিজস্ব হয়ে উঠেছে। এর আগে *নব-বসন্তের* সবশেষ কবিতা দিকনির্ণয়ে কবি বলছেন : 'পথটা সোজা না বাঁয়ে না ডাইনে/ জানিনে জানিনে জানতে চাইনে/ শুধু জানি এই সেটা নিজেকেই/ নিতে হবে চিনে যথাসময়ে'– যথাসময়ে চিনে নেয়ার এ অঙ্গীকার থেকেই কবি সে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর তাই বাংলা কবিতা পেলো মননঋদ্ধ সহজিয়া ভঙ্গির এক নাগরিকবোধের কবিকে। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের কণ্ঠের কিছু কথা–

> আধুনিক বাংলা কবিতার শৈশব থেকেই তো আমি তার অবিচল সঙ্গী। এ কবিতার শুরু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে। বিদ্রোহ তার ভাষার বিরুদ্ধে, ছন্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধে, যে ভাবালুতা, অতিনৈতিকতা বাংলা কবিতার ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তা থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ভাষায় আঙ্গিকে বক্তব্যে নতুনত্বের অন্বেষণে বের হলো আধুনিক কবিতা। শুধুমাত্র আবেগই নয়, চিন্তাও কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে দেখা দিলো। ছন্দের যুক্তি, গদ্য এবং ব্যঙ্গ হয়ে পড়লো কবিতার প্রধান উপজীব্য। মুখের ভাষাকে কাব্যের ভাষায় রূপান্তরিত করতে লাগলাম। গদ্য ও পদ্যের ভাষার বেড়া ভেঙ্গে দিতে গেলাম কবিতায়। সেই সঙ্গে ভাবালুতার দরজা-জানালায় এঁটে দিলাম ছিটকিনি। আমার বন্ধুরা যখন ভাসলেন রোমান্টিকতার জোয়ারে। আমি হাঁটতে লাগলাম বাস্তবের বন্ধুর পথে।

এই বন্ধুর পথ ডিঙিয়ে কবিতায় শিল্পময় ও মননঋদ্ধ পথ-নির্মাণে কবি আবুল হোসেন বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। তার দিক নির্ণয়ের ঘোষণা প্রথম কাব্যগ্রন্থে যেমন ছিল পরবর্তীকালের কবিতাতেও তিনি একান্তে নিজের মতো করে কাজ করে যাওয়ার কথা বারবার বলেছেন। অনুচ্চ, ঋজু অথচ দৃঢ় স্বভাবের কবি আবুল হোসেনের জন্যে নিজস্ব পথ-নির্মাণ যেমন কঠিন ছিল এবং নির্মিত সে পথ ধরে রাখা আরো কঠিন ছিল বৈকি। সময়ের বৈরিতা, লোভের নিষ্ঠুরতায় পথ হারিয়ে ফেলার আশংকা ছিল যথেষ্ট। দেশভাগের পর তার সমসাময়িকদের কেউ কেউ পাকিস্তান বন্দনা এবং দূর মরুর বুকে স্বপ্ন আঁকায় মত্ত হলেও তার কাব্য আত্মা ছিল স্বদেশের কাদামাটিতেই প্রোথিত। তিনি পথ হারান নি। নিরাবেগ, নির্জন ও নিরলস সাধনায় একান্ত নিজের মতো করে কাজ করে গেছেন নিভৃতে।

কবিতার মেদ ঝরিয়ে, মজ্জাকে গুরুত্ব দিয়ে কবি আবুল হোসেন গড়ে তুলতে পেরেছেন ভিন্ন এক কণ্ঠস্বর। এ ভিন্নতা ভাষাভঙ্গিতে, শব্দচালে, চিন্তাকে আবেগে রূপান্তরের কৌশলে, ছন্দনিরীক্ষা এবং আঙ্গিক গঠনে। তার মননশীলতার বোধ কেবল বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, আত্মকথনের ঢঙে তিনি যে কথাগুলো বলতেন তার মেজাজেও ছিল আত্মসংযমের কুশলী বুনন। যে কোনো কবির জন্যই নিজস্বতা তৈরি করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আবুল হোসেন দীর্ঘ কাব্য জীবনে এ অসাধ্যই সাধন করেছেন। এ কাজে সহায়ক ছিল তাঁর অপরিমেয় শ্রম এবং কৌশলী কাব্যভাবনা। ক্রমাগত সংশোধন, পরিমার্জনা তার কাব্যচর্চার অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য।

*নব-বসন্তে*র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেন, 'এক একটি কবিতা আমি বহুবার লিখি, বহুদিন ধরে লিখি। নব-বসন্ত বেরুবার কিছুদিন পর থেকেই এটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।' অর্থাৎ তিনি কেবল প্রেরণার প্রশ্রয়ে কবিতা লিখতেন না। স্থপতি যেমন হাতুড়ি বাটালি দিয়ে পাথর কুঁদে কুঁদে ভাস্কর্য তৈরি করেন তিনিও তেমনি শব্দ বাক্যকে ভেঙে চুরে ছেনে বাছাই করে কবিতায় রূপ দিতেন। আর এ রূপায়ণের ভঙ্গিটি ছিল সহজ, সরল ও সাধারণ। কিন্তু শিল্পময়। সাধারণ্যেই ছিল অসাধারণত্বের ঢেউ। সে ঢেউয়ে যিনি ভেসেছেন তিনি জানেন এর মধ্যেই কতোটা গভীর ভাব তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন–

> আর সেই মুহূর্তে/আমার বুকের মধ্যে সেই ছোট পাখিটার/জন্য, প্রথম পা-ফেলা, মুখফোটা, শৈশব, কৈশোর,/যৌবন এমন ঢং ঢং করে বাজতে লাগল/যেন সে ঘন্টা আর কোনদিন থামবে না। ('হলুদের দিনে' : *রাজকাহিনী*)

আপাতসরল এ কথাগুলোর অন্তরালে যে গভীরবোধ আর বেদনার নিঃসীমতা রয়েছে তা ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা ছিল তার অনায়াস।

আবুল হোসেন ভাবনা ও বয়ানে কোন অস্পষ্টতা রাখতেন না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাজ্ঞতার মিশ্রণ যে প্রকাশকে সরল করে তোলে তার প্রমাণ আবুল হোসেনের কবিতা। কবি শিল্পচৈতন্যের গভীর বলয় জুড়ে সচেতন প্রয়াসে যে মাধুর্য ছড়িয়েছেন তাতে মিশেছে জীবন অভিজ্ঞতার নিষ্করুণ নির্যাস। কবি তার প্রাজ্ঞতা দিয়ে তাকে করেছেন আরো উন্মুক্ত ও গভীর। একই সঙ্গে কবি নিজস্ব ভুবন নির্মাণেও ছিলেন সচেষ্ট। বলাবাহুল্য এ কাজে তিনি সফলও হয়েছেন। কবি 'নিজের জমি' কবিতায় বলছেন–

> মেঘের সঙ্গে নেইতো আমার আড়ি,/ আকাশের মেঘ আকাশেই থাক,/ তারার রাজ্যে যে যাবার যাক।/ সুদূরের ডাকে আমি জোরে মাথা নাড়ি।/ যে যাই বলুক, আমি বড়ো ঘরকুনো,/ চেয়েছি নিজের জমিতে দাঁড়াতে,/ মাটির গভীরে শেকড় বাড়াতে।/ নভোচারী হতে চাইনি কখনো (নিজের জমি : *রাজকাহিনী*)

কবি আবুল হোসেনের কবিতা বহুতলহীন ও কূটাভাসমুক্ত। সংযত আবেগ, তীব্রমাত্রাজ্ঞান, চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ততা, মতামত প্রকাশে দৃঢ়তা সর্বোপরি সূক্ষ্মদৃষ্টিভঙ্গিগত উপলব্ধি তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কবিতায় খুব বেশি গূঢ়ার্থ তৈরিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন না। সহজ সরল ও একমাত্রিক ভঙ্গিই ছিল তার পছন্দ। তিনি কবিতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও চারপাশে একধরনের নিরাসক্ত আড়াল তৈরীতে সক্ষম হতেন। সুধীন্দ্রনাথীয় বর্ণনায় যাকে বলা হয়েছে– 'নরাত্ম আমি'। নির্জনতা অভিলাষী কবি কিন্তু কেবল নিজেকেই নিয়েই মত্ত থাকেন নি। কবিতা আর জীবনকে এক করে এমন এক সাত্ত্বিক বলয় তৈরি করেছেন যেখানে নিজের আয়নায় যেমন নিজের মুখ দেখেছেন তেমনি দেখিয়েছেন সমাজ ও সময়ের মুখ। সে দেখানোতে কোনো কোলাহল ছিল না, ছিল না চেঁচামেচি। ছিল কেবল গলা নামিয়ে কিছু প্রাণের কথা বলা। *এখনও সময় আছে* কাব্যগ্রন্থের 'আমার কথা' নামক কবিতায় কবি বলছেন, 'চেঁচিয়ে হাট বসায় যারা/ বসাক তারা তাদের মতো,/ আমার শুধু নামিয়ে গলা/ প্রাণের দু'টো কথা বলা।' প্রাণের এ কথা বলাতে কবি মুখের ভাষাকেই কাব্যের ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কবির বলছেন, 'কবিতা লিখবো সেই ভাষায়, যে ভাষায় মানুষ কথা বলছে হাটে বাজারে, ড্রয়িং রুমে।'

আবুল হোসেন আঙ্গিক সচেতন ছিলেন তীব্রভাবে। এ সচেতনতা শুরু হয় মূলত তার *বিরস সংলাপ* কাব্যগ্রন্থ থেকে। *আর কিসের অপেক্ষা*, *রাজকাহিনী* এবং *কালের খাতায়* তার নিরীক্ষাধর্মিতা চূড়ান্ত রূপ নেয়। অথচ সে সময়ে তিনি বলতে গেলে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু লেখনি ছিল ক্ষুরধার। এটিও এক ব্যতিক্রম অবস্থান তার।

বয়সের সাথে সথে তিনি এলিয়ে না গিয়ে আরো সচেতন ও সজ্ঞান হয়েছিলেন। আবুল হোসেন একজন অনুভবী দ্রষ্টা ও অন্তরঙ্গতম কবি। কবিতার সজীব বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক নিরাভরণ মানব ব্যক্তিত্ব। নিয়ম সর্বস্বতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। ভাষাকে করেছেন প্রাঞ্জল ও অনাড়ম্বর। ছন্দের আলংকারিক মাধুর্যকে অস্বীকার করেননি। বরং ছন্দনিরীক্ষায় দক্ষ কারিগর হয়ে ওঠেন। মিশ্র ছন্দে লিখেছেন প্রচুর কবিতা। আবুল হোসেন কেবল অক্ষরবৃত্তেই নন, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তেও লিখেছেন অনেক কবিতা। এমনকি তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত দুটোকে একসঙ্গে করেও লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা। কবিতায় ছন্দ এবং আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা তার কাব্যকৃতির অন্যতম এক বৈশিষ্ট্যও বটে।

আবুল হোসেন আবেগকে চিন্তায় রূপান্তর করেছেন অত্যন্ত কৌশলী ভঙ্গিতে। কিংবা বলা যায় এটি তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তিনি আবেগের বাহুল্য কিংবা ভাবালুতাকে কঠোরভাবে বর্জন করেছেন। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে আবুল হোসেনকে কথা শুনতে হয়েছে বেশ। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রশীদ করীম তাকে 'রুঠা ভাষার' কবি বলেছেন। বলেছেন, 'আবেগকে তিনি বাঘের মতো ডরান।' মূলত আবেগ ছাড়া কবিতা লেখা সম্ভব নয়। কবি আবেগের সাথে মিশিয়েছেন বুদ্ধির যৌক্তিকতা। বুদ্ধি আর কৌশলে কবিতাকে করেছেন তীর্যক ও মেদহীন। আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'আবুল হোসেন মূলত বুদ্ধিবাদী কবি।' তার বক্তব্যের ভেতর ভাবনা থাকে যুক্তির মোড়ক পেঁচিয়ে। ফলে ভাবালুতা থেকে রক্ষা পায় কবিতা। আবারো বলছি কবির কবিতা বুদ্ধি আর আবেগের মিশ্রণ। চিন্তাকে আবেগে রূপান্তর করেই তিনি কবিতা লিখেছেন। কেবল বুদ্ধিহীন আবেগময় কবিতা মননশীল ও সচেতন পাঠককে টানতে ব্যর্থ। আর এ বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই, বাঙালি কাব্য-পাঠক গীতল কবিতা-পাঠেই অনেক বেশি অভ্যস্ত। মগজের ব্যবহারে তাদের জন্মগত অনীহা। কবিতার রস গ্রহণের জন্যে শিক্ষা ও সুরুচির যে স্তর থাকা বাঞ্ছনীয়, বেশির ভাগ পাঠকের মধ্যেই তার উপস্থিতি কম। ফলে ধৈর্য আর পরিশ্রমে গড়া কাব্যসৌধ ভেঙে তার রস নিংড়ে নেয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বলা হয়– কবিকে কর্মী হতে হয়, কর্মঠ হতে হয়। নিরন্তর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সঙ্গে মেধার মিলনে কবি গড়ে তোলেন তার কাব্যভাস্কর্য। অনুভূতি, আবেগ, কল্পনা ও বিশ্বাসের হাতিয়ার নিয়ে কবি থাকেন সক্রিয়। এই যে ধৈর্য আর পরিশ্রম, এ দুটোর সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে আবুল হোসেনের কবিতায়। ধৈর্য আর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তার যে কাব্য ভুবন তা শেষপর্যন্ত পাঠকের জন্যে আনন্দ আর স্বস্তিই এনে দেয় বেশি। তাই তার কবিতা আনন্দের এমনকি আবেশেরও।

আবুল হোসেন কবিতায় রাজনীতি, প্রেম, নারী, নিসর্গসহ জীবনের ব্যাপক অনুষঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটালেও মূলত মানুষ ও মানবিকতাই ছিল তার আরাধ্য বিষয়। আজকের এই অস্থির বিশ্বে মানবিকতার জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। এ বাস্তবতায় মানবতার পক্ষে লড়াই জারি রাখা অতি জরুরি বিষয়। আবুল হোসেনের কবিতায় সে

লড়াইয়ের চিত্র প্রবলভাবে বিদ্যমান। কবি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস থেকে নিজেকে দূরে রেখে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর জীবন জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে তার শেষদিকের কবিতাগুলোতে গভীর জীবনবোধ ও জিজ্ঞাসা প্রবল। যা আমাদের রবীন্দ্রনাথের *শেষ লেখা* কবিতার বইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া আবুল হোসেনের *কালের খাতায়* কাব্যে জীবন জিজ্ঞাসার পাশাপাশি এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার গভীর বেদনাবোধও তীব্র রূপ নিয়েছে : 'তবু কী আশ্চর্য এই/ দুর্জ্ঞেয় পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময়/ যার চোখে পানি টলমল/ করেনি এমন মানুষ কি কেউ/ কোনদিন দেখেছে কোথাও?' ('পৃথিবীর মায়া' : *কালের খাতা*) কবির শেষ কবিতাই বই *যাবার আগে* প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে মৃত্যুর চার বছর আগে। এতে বেদনাবোধের চেয়েও একধরনের নিঃসীম হাহাকার কবির চেতনাজুড়ে সক্রিয় ছিল যেন। 'চির অধরা' কবিতায় বলছেন : 'হৃদয় চেয়েছে যাকে/ সে যেন কোথায় থাকে,/ পাইনি ঠিকানা তার,/ কত নাম তার বুঝি,/ তাহলে কী করে খুঁজি,/ জানি না কিছুই যার।'

৩.

আঠারো বছর বয়সে কবির *নব-বসন্ত* প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল তার আগেই। এ কাব্যের দুটি বিশেষ বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। এর একটি সমিল গদ্যে কবিতা লেখা। অপরটি লিঙ্গ সচেতনতা। এ দুটি বিষয়ই তার একটি কবিতাতে পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির নাম 'বাংলার মেয়ে'।

আবুল হোসেনের প্রিয় কবি সমর সেন। সমর সেনের গদ্য কবিতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সমর সেন যেটা পারেননি সেটা করেছেন আবুল হোসেন। তিনি সমিল গদ্যে কবিতা লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলছেন–

> প্রকৃত গদ্য কবিতার যে কাব্যিক চাল সেটা আমি সমর সেনের কাছে শিখেছি। তারপর আমার মনে হলো আমি যদি এটাই করি, তাহলেতো হবে না। কারণ, এটাতো সমর সেনই করেছেন। তখন আমি ঠিক করলাম, আমি যদি গদ্য কবিতা লিখি তাহলে গদ্য কবিতায় মিল আনবো। সমিল গদ্য কবিতা লিখবো। সমর সেন প্রচুর গদ্য কবিতা লিখেছেন কিন্তু মিল আনতে পারেননি। গদ্য কবিতায় যে মিল হতে পারে এ ধারণা কারো ছিল না। এই সমিল গদ্য কবিতাটা আমি প্রথম লিখলাম। আমার বই নববসন্তে এই কাজগুলো আছে।

নব-বসন্তের 'বাংলার মেয়ে' কবিতায় এর উদাহরণ, 'সব প্রথমেই দিয়ে রাখি পরিচয়/ তার মানে এই নয়, এটাই সুবিধা, এতে সংশয় নেই/ বরং ব্যাপারটা উল্টো একেবারেই অর্থাৎ কিনা নামটা না দিলেই ছিল ভাল। কারণটা নয় মোটেও ঘোরালো।' এখানে পরিচয়, নয়/ সংশয়/ উল্টো, ঘোরালো এগুলো সবই মধ্যমিল বা সমিল। এ ধরনের আরো কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন। মরণ, হে হিরণ মরণ,/ তোমার তোরণ দিয়ে কারা আসে ঐ/ দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে কাদের মিছিল।' ('এ দেশে আমরা একা' : *বিরস সংলাপ*) 'বাংলার মেয়ে' কবিতায় কবির বাংলার মেয়েদের পিছিয়ে থাকার চিত্র রূপকথার আদলে তুলে ধরেছেন। রাজকুমার অর্থাৎ পুরুষের জবানীতে লিখিত হয়েছে

পৃথিবীর ইতিহাস। এখানে পুরুষ সক্রিয়। নারী নিষ্ক্রিয়। জগতের সকল কর্মে নারীর অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। এছাড়া নারীর ইতিহাস বর্ণনা করার মতো নারীদের মধ্য থেকে যোগ্য কারো আবির্ভাব কবির নজরে পড়ে নি। বাস্তবিকই ছিলও না। তাই কবি বলছেন : 'পুরুষেরা খুব ভাগ্যবান সে মানি। রাজকুমারের জবানীতে/ তারা লিখেছে রাঙায়ে নিজেদের কাহিনীখানি,/ তাদের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা পেল অমরতা।/ এদেশে নেইতো মেয়েদের কবি ওকালতি পাস-করা,/ জানে না কলম ধরতে, কারণ সামান্য লেখাপড়া।/ ওদের কাহিনী যা কিছু রয়েছে কবিতায় রচনাতে,/ বেরিয়েছে তার সবই পুরুষের হাতে।/ তাই তো ওদের রাজকুমারীরা পালঙ্কে শুধু ঘুমিয়ে কাটায়,/ ওরা সব মৃত, একান্ত অসহায়।' নিতান্ত এক কিশোরের উপলব্ধিতে নারীর অসহায়ত্বের এ বর্ণনা প্রশংসদার দাবিদার নিশ্চয়ই।

আবুল হোসেনের কবিতায় আরেকটি দিক নজর কাড়ার মতো। তিনি আত্মজৈবনিক কবি ছিলেন না। তথাপি নিজের জীবনের কথা, সংসার, ছেলেমেয়ে, জীবনসঙ্গিনী, মাতা, পিতা, বন্ধু, স্বজন কারো কথাই কবিতায় তিনি বলতে ভুলেন নি। একান্ত নিজের কথাকে সবার কথা করে তোলার দক্ষতা সবার থাকে না। আবুল হোসেনের তা ছিল। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিরস সংলাপ* থেকে মূলত তিনি এ কাজ শুরু করেছেন। বইটির দ্বিতীয় কবিতা 'আমার ছেলেটা'। কবি তখন চাকরিসূত্রে ব্যাংকক থাকেন। শহীদ পিতার কথাও অকুণ্ঠ দরদে তিনি কবিতায় তুলে এনেছেন। চিত্রিত করেছেন স্ত্রী সাহানাকেও। তিনি ১৯৯৪ সালে মারা গেলে কবি লেখেন গভীর বেদনাবোধের কবিতা 'যে আছে জীবন জুড়ে'। 'চির সত্য কি জানি না, শুধু জানি স্মৃতি অনির্বাণ,/ সে থাকে প্রাণের মাঝে সুধার মতন, চিরকাল।' ('যে আছে জীবন জুড়ে' : *এখনও সময় আছে*)

৪.

বাস্তব আর আর্দশের দ্বন্দ্ব থেকে আবুল হোসেন ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন প্রচুর। সমাজ জীবনের নানা অসংগতি থেকে ব্যঙ্গ কবিতার জন্ম। স্বাভাবিকতা যেখানে বিঘ্নিত সেখানেই ব্যঙ্গ শিল্পীরা নানারকম ব্যাঙ্গানুকৃতির মাধ্যমে সেসব অসঙ্গতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন। সমাজ সচেতনতা আবুল হোসেনের মজ্জাগত ছিল। ছিল অসাধারণ সৃষ্টিশীল ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে ব্যঙ্গ কবিতা লেখা।

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা মূলত ছিল ব্যঙ্গ কবিতাই। এছাড়া *হুতোম প্যাঁচার নকশা* বা *আলালের ঘরের দুলাল* বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আরো রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন, রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দপ্তর*। বাংলার উনিশ শতকীয় সাহিত্যে ছিল ব্যঙ্গ কবিতা, উপন্যাসের জয়জয়কার। আবুল হোসেনেরও একটি গোটা বই বের করা হয়েছে ব্যঙ্গ কবিতা নামে। এটি সম্পাদনা করেছেন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ।

আবুল হোসেনের উন্মেষকাল চল্লিশের দশক নানা কারণেই ছিল উত্তাল। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে স্বাধিকার আন্দোলন, হত্যা, লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,

মন্বন্তর, দেশভাগে দশকটি ছিল ক্ষতবিক্ষত। এর প্রভাব সাহিত্যে পড়েছে অনিবার্যভাবে। কবিতা আমিত্ববলয় ভেঙে চলে আসে সমষ্টিবলয়ে। সে সময়ে তখনও সক্রিয় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সভ্যতার সংকট' নামে অসাধারণ এক প্রবন্ধ। নজরুল লিখলেন 'মহাসমর' নামে কবিতা। জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তিরেশের কবিরা আত্মবলয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। একইসঙ্গে চল্লিশের কবিরাও সমাজসংশ্লিষ্টতা ও রাজনীতি সচেতনতাকে প্রাধান্য দিয়েই কাব্যমাঠে নামলেন। আবুল হোসেন এ সচেতনতা থেকে বিচ্যুত হননি কোনোকালে। লিখে গেছেন অসংখ্য তীর্যক ও ব্যঙ্গ কবিতা। আবুল হোসেন বলছেন : 'আজীবন নির্বিবাদী ও নির্লিপ্ত থেকেও দেখেছি সমাজ-সংসারকে একেবারে ভুলে থাকা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অসহ্য হলে প্রতিবাদ করতেই হয়। আমি ব্যঙ্গের তীর ছুড়ি।' (*আমার এই ছোট ভুবন* : পৃ. ১৫) তার অপূর্ব একটি ব্যঙ্গ কবিতা 'মানপত্র'। এর শেষ দুটি পংক্তি এরকম, 'শব্দহীন নির্বিকার জলের জীবন। মৃত্যু আর/ জীবন সমান। হুজুরের অপূর্ব শাসন।' ('মানপত্র' : *বিরস সংলাপ*) প্রকরণসচেতন কবি আবুল হোসেনের *বিরস সংলাপে* বেশ কিছু ব্যঙ্গ কবিতা রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তার ব্যঙ্গ কবিতা লেখার পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়েছিল। মানব রতন চিনলে ন মন!/ কে বলে সে স্বৈরাচারী?/ সে যে ব্রজের বংশীধারী।/ ফুলে ফুলে গন্ধ শুঁকে/ বেড়ায় শুধু মনের সুখে,/ টানে না তো বসনটসন।' (*আবুল হোসেনের ব্যঙ্গ কবিতা* : পৃ. ৩২)

৫.

আবুল হোসেন ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট খুলনা জেলার তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমার ফকিরহাট থানার আড়ুয়াডাঙ্গা গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কবির ছোটবেলা কেটেছে কৃষ্ণনগরে, যৌবনের প্রথমভাগ কলকাতায়। ভারত ভাগের আগেই আয়কর কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ৪৭ এর দেশভাগের পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। দীর্ঘজীবনে তিনি লিখেছেন কম। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি পুরোপুরি লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের পরামর্শে আবুল হোসেন লেখার পরিমাণের চেয়ে গুণগত মানের দিকে দৃষ্টি দেন। কবি ছোটদের জন্যেও লিখেছেন প্রচুর। এছাড়া তার আত্মস্মৃতির কয়েকখণ্ডে অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গিতে জীবন অভিজ্ঞতার নানা দিকের সুস্পষ্ট ও বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। সবমিলিয়ে তার গ্রন্থসংখ্যা ২৫ এরও বেশি। প্রথম থেকে শেষাবধি কবির অনুভবী কৌশল, প্রকরণ সচেতনতা, ছন্দনিরীক্ষা, ভাষাকে আভরণহীন করে আরো বেশি মুখের ভাষার কাছে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা জাগর ছিল। বরং বলা চলে দিনদিনই এসব শাণিত ও গভীরতামুখী হয়েছে।

কবির ১৯৪০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নব-বসন্তের* পর ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় *বিরস সংলাপ*। ১৯৮২ সালে *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস*, ১৯৮৫ সালে *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*, ১৯৯৭ সালে *এখনও সময় আছে*, ২০০০ সালে *আর কিসের অপেক্ষা*, ২০০৪ সালে

রাজকাহিনী, ২০০৭ সালে *কালের খাতায়* এবং ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় *যাবার আগে*। আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় *আবুল হোসেনের ব্যঙ্গ কবিতা* প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে, প্রেমের কবিতা ২০০৮ সালে। শিশুদের জন্যে লেখা কবিতার সংকলন *রাজা রাজড়া* ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্যে তিনি *শাহানের বই* নামক গ্রন্থও রচনা করেন। তার অনুবাদ কবিতার সংকলন *অন্য ক্ষেতের ফসল* প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এ ছাড়া *বিবিধ গদ্য* ২০০৩, *ভারত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা* ২০০৯ সালে প্রকাশ পায়। তার রয়েছে অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী *পার্বত্যের পথে*। রয়েছে অনুবাদ উপন্যাস *অরণ্যের ডাক*। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন রসুল গামজাতভের *আমার জন্মভূমি : দাগেস্তান* বইটি। আবুল হোসেন পাঁচ খণ্ডে লিখেছেন স্মৃতিকথা। স্মৃতিকথাগুলো হলো *আমার এই ছোট ভুবন* (২০০০), *আর এক ভুবন* (২০০৫), *দুঃস্বপ্নের কাল* (২০০৭), *স্বপ্ন ভঙ্গের পালা* (২০০৯), *অপরাহ্নের স্মৃতি* (২০১৩)। তার *কবিতা সংগ্রহ* প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। প্রেমের কবিতার সংকলন *আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতা* প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। আবুল হোসেনের *নির্বাচিত কবিতা* প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। এরপর ২০১০ সালে কবি মনজুরে মওলার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কবির *কবিতা সমগ্র*। এতে বিশ্লেষণধর্মী ও মূল্যবান এক দীর্ঘ আলোচনা করেন মনজুরে মওলা। এর একেবারে শেষের দিকে এসে তিনি বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও নতুন মাত্রা দিয়েছেন, আমি মনে করি আবুল হোসেন তাদের একজন।' (*কবিতা সমগ্র* : পৃ. ৫৪)

জীবনের বহুমাত্রিকতা প্রকাশে কবি তার কাব্যে যে বৈচিত্র্যসঞ্চার করেছেন, বিষয় ও প্রকরণে, আঙ্গিক ও ভাবে যে নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে মনজুরে মওলার সাথে কণ্ঠতো মেলানোই যায়, দ্ব্যর্থহীনভাবে আরো বলা যায় আবুল হোসেন আমাদের আধুনিক, অগ্রগামী ও তরুণতম কবি। বিখ্যাত কবি রাইনের মারিয়ে রিলকের উচ্চারণ : 'নিঃশব্দের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই। আমরা প্রত্যেকে জন্মসূত্রে শব্দ-জগতের বাসিন্দা। উপায় থাকলে আমরা কখনই নীরবতা ভঙ্গ করতাম না।' আবুল হোসেনও দীর্ঘকাব্য জীবনে নীরবে নিঃশব্দেই কাজ করে গেছেন। 'জানি না কী থাকবে, কী থাকবে না।/ করেছি নিজের কাজ/ নিভৃতে, নিঃশব্দে।/ একান্ত আপন মনে।' ('যখন ফিরে দেখি' : *রাজকাহিনী*) বাস্তবতাকে সংলগ্ন করে সূক্ষ্মবোধ আর বুদ্ধির যৌক্তিক অবস্থানে থেকে কবি আবুল হোসেন নিরাভরণ ভাষায় যে মানবিক কাব্যফসল তার উত্তরপ্রজন্মের জন্যে রেখে গেছেন তা যেমন সমকালীন তেমনি ভবিষ্যের দিগবলয়েরও নৈকট্যগামী।

আবুল হোসেন ২০১৪ সালের ২৯ জুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাব্যদেবীর কৃপা পেয়েছেন। দীর্ঘ এই সময়ে আবুল হোসেন নির্মেদ অথচ ধ্বনিমাধুর্যময় যে কাব্যভুবন রেখে গেছেন তা কালোত্তর পর্যায়েও স্বাদ দেবে বিচিত্রতার।

[১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ– বাংলা সমিতি কর্তৃক আয়েজিত *আবুল হোসেন জন্মশতবার্ষিকী* উপলক্ষে পঠিত]

সাহিত্যিকী

সূচিপত্র (১৩৬৬-১৪২৯)

সাহিত্যিকী

সূচিপত্র (১৩৬৬-১৪২৯)

আজ থেকে চৌষট্টি বছর পূর্বে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খ্রি.) বাংলা বিভাগের মুখপত্র হিসেবে *সাহিত্যিকী* প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ষাণ্মাসিক পত্রিকা হিসেবে এটি বের করার পরিকল্পনা ছিল। তবে প্রথম সংখ্যার পর প্রায় চার-পাঁচ বছর পত্রিকা বের হয়নি। পরে বসন্ত ১৩৭১ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় সংখ্যা বের হয়।

তারপর ১৩৭৬র পর আবার প্রকাশনায় ছেদ পড়ে। সম্ভবত, সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধই এর কারণ। অতঃপর অদ্যাবধি আর সে-অর্থে *সাহিত্যিকী*র প্রকাশ থেমে থাকেনি। যতো প্রতিকূলতাই হোক, দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদনা পরিষদ– একজন সম্পাদকের নেতৃত্বে কাজ সম্পন্ন করে গেছেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরের মাথায় *সাহিত্যিকী*র প্রকাশের উদ্যোগ এবং অদ্যাবধি তারধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ কথা নয়। কিন্তু কঠিন কাজটি সহজ হয়ে উঠেছে সকলের আন্তরিকতায়। এর সমস্ত কৃতিত্ব বাংলা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট পরিবারের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার এ পত্রিকা এখন একপ্রকার 'ইতিহাস'। এ নিয়ে কাজ হতে পারে। আমরা এখানে *সাহিত্যিকী*তে প্রকাশিত যাবতীয় প্রবন্ধের একটি তালিকা (প্রথম সংখ্যার ভূমিকাসহ) অবিকৃতরূপে প্রকাশ করেছি। তাতে করে এর লক্ষ্যাভিসারী পদক্ষেপসমূহ পাঠকের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হবে বলে আশা করা যায়।

[সম্পাদক ॥ *সাহিত্যিকী* ৫৩ সংখ্যা]

প্রথম বর্ষ   প্রথম সংখ্যা   শরৎ– ১৩৬৬
সম্পাদক : ডক্টর ময্‌হারুল ইসলাম
[মুদ্রণ : পূর্ববঙ্গ প্রেস, ঢাকা]

ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্যিকী' বছরে দু'সংখ্যা প্রকাশ পাবে– শরৎ ও বসন্ত। পাক-বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে এ দুটো ঋতুর সাথে আর কোনো ঋতুর তুলনা চলতে পারে না। সুচিন্তিত গবেষণা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এ পত্রিকায় স্থান দেওয়া হবে। পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে সাহিত্যের যে টুকরো খণ্ডগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হতে চলেছে, এ পত্রিকা সেগুলোর উদ্ধার ও মূল্য-বিচারের দিকেও বিশেষভাবে নজর রাখবে। পাকিস্তানের নিজস্ব আদর্শ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ও ইসলামী জীবনধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ এবং সাথে সাথে এসবের সুষ্ঠু রূপায়ণ কোন পথে কীভাবে সম্ভব তার পথ নির্দেশ প্রভৃতির দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য এ পত্রিকায় চিরদিন থাকবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ও গবেষণা এবং আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা– বাংলা সাহিত্যেরএ বিরাট পরিসর ক্ষেত্র নিয়ে 'সাহিতিক্যী'র যাত্রা শুরু হলো।

– মযহারুল ইসলাম
১লা ভাদ্র ১৩৬৬
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক
০১	কবি পাগলা কানাই	ডক্টর ময্‌হারুল ইসলাম
০২	লোক-সংস্কার	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌
০৩	'স্পেন-বিজয়-কাব্য': ইসমাইল হোসেন সিরাজী	মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
০৪	বাংলা বিহারে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম শিক্ষার পটভূমি	ড. এ. আর. মল্লিক

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বসন্ত– ১৩৭১
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	পাক-ভারতীয় লোকগল্পের একটি দিক : বোকা জামাতা	ড. মযহারুল ইসলাম
০২	দোভাষী পুঁথির কবি সৈয়দ হামযা	ড. গোলাম সাক্‌লায়েন
০৩	বাংলা ‘সমালোচনা’র বিকাশে ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’র ভূমিকা	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
০৪	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিক্রমা	মুহম্মদ আবু তালিব

তৃতীয় বর্ষ শহীদুল্লাহ্ সংখ্যা শরৎ– ১৩৭২
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	ডক্টর মযহারুল ইসলাম
০২	বাঙালীর জীবন ধারা ও লোক সাহিত্য	এবাদত হোসেন
০৩	বাঙলা ভাষার উৎস সন্ধানে	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
০৪	হযরত শাহ মুখ্‌দুমের জীবনী তোয়ারিক	মুহম্মদ আবুতালিব
০৫	ব্যাকরণের কথা	শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
০৬	ধ্বনিবিজ্ঞান – কি ও কেন	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
০৭	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ঐতিহ্য সাধনা	খোন্দকার সিরাজুল হক
০৮	গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্র-মানস ও পূর্ব পাকিস্তান	আবু হেনা মোস্তফা কামাল

চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শরৎ ও বসন্ত– ১৩৭৩
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	লোক-কাহিনী সম্পাদনার রীতি ও পদ্ধতি	ডক্টর মযহারুল ইসলাম
০২	বাংলা উপন্যাসে মানব প্রত্যয় ও মুসলিম প্রয়াস	আজিজুল হক
০৩	আধুনিক বাঙলা সাহিত্য : ‘স্বাতন্ত্র্যকামী’ সাহিত্য চেতনা ও ফর্‌রুখ আহমদ	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
০৪	লালন শাহ : মত ও পথ	আবু তালিব
০৫	পাক-চীন লোক-গল্পের গতিপ্রকৃতি	মুহম্মদ আবদুল খালেক
০৬	মনঃসমীক্ষণ ও সাহিত্য	আবদুল হাফিজ

৫ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শরৎ-১৩৭৪
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	ইউরোপীয় লোককাহিনী আফ্রিকান ও আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান পাঠান্তর	ড. মযহারুল ইসলাম
০২	সিরাজী মানস পরিক্রমা	ড. গোলাম সাকলায়েন
০৩	গ্রাম দেবতা – ষষ্ঠি	ড. মুখলেসুর রহমান
০৪	মনঃসমীক্ষণ ও লোককাহিনী	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ
০৫	পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ	ড. মুহম্মদ কছিম উদ্দীন মোল্লা

৫ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বসন্ত-১৩৭৪
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

১.	বিংশ শতকে পাক-ভারতীয় লোককাকহিনীর পঠন-পাঠনে আমেরিকান পণ্ডিতদের অবদান	ডক্টর মযহারুল ইসলাম
২.	কুমারী মাতা	মুখলেসুর রহমান
৩.	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা পরিক্রমা	মুহম্মদ আবূ তালিব
৪.	যাদুবিদ্যার যুগ-যুগান্ত	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ

৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শরৎ–১৩৭৫
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	ইংরেজি লোকগীতিকার শিল্প-কৌশলগত বৈশিষ্ট্য	ড. মযহারুল ইসলাম
০২	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান	ড. কাজী আবদুল মান্নান
০৩	গদ্যশিল্পী মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
০৪	লোকসংস্কার ও ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ
	গ্রন্থ পর্যালোচনা	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ

৬ষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বসন্ত–১৩৭৫
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১.	ছোটগল্প সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ভূমিকা	ড. মযহারুল ইসলাম
০২.	গোলেবকাওলী উপাখ্যানে লোক-উপাদান	গোলাম সাক্‌লায়েন
০৩.	সোপান	আতোয়ার রহমান
০৪.	লোকশিল্পকলার ভূমিকা	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ

৭ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শরৎ–১৩৭৬
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর ও তাঁহার আবির্ভাবকাল	সুলতান আহমদ ভূঁইয়া
০২	হানিফার লড়াই	ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন
০৩	পাকিস্তানী লোক-ঐতিহ্যের রূপরেখা	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ

৭ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বসন্ত–১৩৭৬
সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম

০১	বিশ্বাস ও আচার	মুখলেসুর রহমান
০২	পাকিস্তানে আঞ্চলিকতাবাদ : উৎস ও পরিণতি	সফর এ. আকন্দ
০৩	ইংরেজী ঐতিহ্যিক লোকগীতিকায় অতিপ্রাকৃত উপাদান ও লোকবিশ্বাস	ডক্টর মযহারুল ইসলাম
০৪	লোকশিল্পকলা : একটি বিশেষ দিক	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ

১০ম ও ১১শ বর্ষ বসন্ত ও শরৎ সংখ্যা– ১৩৭৯-৮০
সম্পাদক : কাজী আবদুল মান্নান

০১	অনুবাদ : মনিরুজ্জামান সংস্কৃত ও রুশ ভাষা : তুলনা	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
০২	যাত্রা সাহিত্যের মূল্যায়ন	মঈন উদ্দীন আহম্মদ
০৩	ছন্দ পরিচিতি	এস. এম. আবদুল লতিফ
০৪	পৃথ্বীমাতা	মুখলেসুর রহমান
০৫	বাঙালা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ ও তার নবমূল্যায়ন	মুহম্মদ আবদুল খালেক
০৬	মাইকেল মধুসূদনের কাব্যপাঠের ভূমিকা	জুলফিকার মতিন
০৭	একটি গ্রন্থের সমালোচনা ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা	গোলাম মুরশিদ
	রাইফেল রোটি আওরাত [পুস্তক সমালোচনা]	আসাদুজ্জামান

১৪শ বর্ষ শরৎ সংখ্যা– ১৩৮৪
সম্পাদক : গোলাম সাক্‌লায়েন

০১	সিরাজীর কাব্যের মৌলিক প্রেরণা	এবাদত হোসেন
০২	লোকসংস্কৃতি : মেয়েলী গীত	গোলাম মোস্তফা
০৩	বিপ্লবী ঐতিহ্য ফ্রানজ ফ্যানঁ	সফিউদ্‌দীন জোয়ারদার
০৪	বাঙলা গদ্যের আদি নিদর্শন	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
০৫	বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রথম চল্লিশ বছর (১৭৭৮-১৮১৭)	গোলাম মুরশিদ
০৬	একজন উপেক্ষিত সাহিত্যিক : মুহম্মদ খিরাজ আলী ও তাঁর 'বাইরের ডাক'	মুহম্মদ আবূ তালিব
০৭	আদিবাসী সাহিত্য	আব্দুস সাত্তার
	পুস্তক সমালোচনা *মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক* রমেশচন্দ্র মজুমদার *বাংলা দেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)	আতাউর রহমান গোলাম রসুল

১৫শ ও ১৬শ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা–১৩৮৫-১৩৮৬
সম্পাদক : গোলাম সাক্‌লায়েন

০১	ফরাসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ	আবদুস সাত্তার
০২	বাংলা ধ্বনি আলোচনায় প্রাসঙ্গিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস ও প্রসঙ্গত সমালোচনা	মনিরুজ্জামান
০৩	প্রমথ চৌধুরী	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
০৪	মীর মশাররফ হোসেনের জীবনকথা	এস.এম. আবদুল লতিফ
০৫	বিলুপ্ত হৃদয় : আবু লোহানী	গোলাম সাক্‌লায়েন

১৭শ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা–১৩৮৭
সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

০১	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান : বন্দনা	আবদুল খালেক
০২	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
০৩	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠী	ওয়াকিল আহমদ
০৪	ঋকবেদের যুগে দাক্ষিণাত্য	শ্রী কানাইলাল রায়
০৫	বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার	মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
০৬	ধাঁধায় বিধৃত বাংলার সমাজচিত্র	মুহম্মদ ফরিদ উদ-দীন
০৭	প্রাচীন বাংলার কবি শরণ	শাহানারা হোসেন
০৮	একটি লোকগীতিকায় চট্টগ্রামের উপভাষা	অনিমেষ কান্তি পাল
০৯	কোহিনূর, কবি মোজাম্মেল হক ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা (আলোচনা)	আলি নওয়াজ
	উদাসীন পথিকের মনের কথা [গ্রন্থ সমালোচনা]	মোঃ আলতাফ হোসেন

১৮শ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা–১৩৮৮
সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

০১	সংস্কৃতির ইতিহাস	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
০২	*আনন্দ মঠ* : বিষণ্ন বাস্তব : বিদ্রোহের প্যারাবেল	সুরেশচন্দ্র মৈত্র
০৩	টালা অভিনয়	এস. এম. আবদুল লতিফ
০৪	জীবন ঘনিষ্ঠতা : বিভূতিভূষণের উপন্যাসে	সরদার আবদুস সাত্তার
০৫	নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশির যুদ্ধ, প্রেক্ষিত বাংলার স্বাধীনতা	হারুনুর রশীদ মো. করিমদাদ
০৬	সুরশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ ও তাঁর পত্রাবলী	গোলাম সাক্লায়েন
০৭	গৌড়ীয় উপভাষা	খোন্দকার আবদুর রহীম
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা* *মশাররফ রচনা-সম্ভার* (২য় খণ্ড) *রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা*	 মুহম্মদ মজিরউদ্দীন আতাউর রহমান আবদুল খালেক

১৯-২০ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা–১৩৮৯-৯০

সম্পাদক : আবদুর রহীম খোন্দকার

০১	দক্ষিণ রাঢ় উড়িষ্যা সীমান্তের প্রচীন কবি ও কাব্য	ড. ত্রিপুরা বসু
০২	একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা : 'ছোলতান'–নবপর্যায়	গোলাম সাক্‌লায়েন
০৩	মুসলিম রচিত প্রথম বাংলা গদ্য-গ্রন্থ	এস.এম. আবদুল লতিফ
০৪	ইংরেজি সাহিত্য প্রাসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	সদরুদ্দিন আহমদ
০৫	ভাষাতত্ত্ব : সামাজিক প্রেক্ষাপট	আজিজুল হক
০৬	রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি	এবাদত হোসেন
০৭	'সাহিত্যিকী'র পঁচিশ বছর (১৩৬৬-১৩৯১)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ : ১৯৮৪* (রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার) *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* *মৃগাবতী*	জুলফিকার মতিন আতাউর রহমান আবদুল খালেক

২১শ ও ২২শ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা–১৩৯১-১৩৯২

সম্পাদক : মোল্লা এবাদত হোসেন

(ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক সংখ্যা)

০১	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের পত্রাবলী	আবদুর রহীম খোন্দকার
০২	লোকসাহিত্যচর্চায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক	মুহম্মদ আবদুল খালেক
০৩	প্রয়াত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রসঙ্গত	খোন্দকার সিরাজুল হক
০৪	'পোয়েটিক্স'-এর অনুবাদক ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়	মুহম্মদ আবুল ফজল
০৫	ব্রাত্যজনের সখা ও কবি	সুরেশচন্দ্র মৈত্র
০৬	ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী	রেজাউল হক
০৭	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
০৮	রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ভূমিকা	এবাদত হোসেন
০৯	মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়–	মো. মকসুদুর রহমান
১০	রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের আলোকে 'প্রথম দিনের সূর্য'	রশীদুল আলম
১১	ধর্মীয় রাজনৈতিক চাপ বনাম বাংলা ভাষা চর্চা	জুলফিকার মতিন
১২	*ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক* [গ্রন্থ সমালোচনা]	সদরুদ্দিন আহমেদ

২৯ বর্ষ ১৩৯৪ ত্রয়োবিংশ খণ্ড
সম্পাদক : আবদুল খালেক

০১	মানব কল্যাণ	কাজী আবদুল মান্নান
০২	চরিত কাব্য	মুহম্মদ মজিরউদ্দিন
০৩	রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুচিন্তা	এবাদত হোসেন
০৪	রবীন্দ্র সাহিত্যে পুষ্প প্রসঙ্গ	মঞ্জুশ্রী চৌধুরী
০৫	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বারমাসির গতিপ্রকৃতি	আবদুল খালেক
	['রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা'] **পত্রিকা সমালোচনা**	জুলফিকার মতিন

৩০ বর্ষ ১৩৯৫ চতুর্বিংশ খণ্ড
সম্পাদক : ড. আবদুল খালেক

০১	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : ভক্তি ও যুক্তি	কাজী আবদুল মান্নান
০২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : মুসলিম প্রসঙ্গ	শেখ আতাউর রহমান
০৩	বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা	ওয়াকিল আহমদ
০৪	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিচারের সূত্র	জুলফিকার মতিন
০৫	আলাওল : কবি ও কাব্য	মো. মাহবুব আলম বেগ
০৬	এর উপায় কি?	এস.এম. আবদুল লতিফ
০৭	মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যে জীবনবোধ	জাহাঙ্গীর চৌধুরী
০৮	বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু রচনা	আবদুর রহীম খোন্দাকার
০৮	বাঙালী গণজীবন ও জসীম উদ্‌দীনের কবিতা	অনীক মাহমুদ
০৯	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : অনৈতিহাসিক উপন্যাসের উৎস	সারোয়ার জাহান
	বাসর ফেলে যুদ্ধে আয় **[গ্রন্থ সমালোচনা]**	আবদুল খালেক
	মাঘ নিশীথের কোকিল **[গ্রন্থ সমালোচনা]**	মুহম্মদ মজিরউদ্দিন

পঞ্চবিংশ খণ্ড ১৩৯৬
সম্পাদক : ডক্টর মুহম্মদ মজিরউদ্দীন

০১	লোকায়ত সংস্কৃতি : গণসংযোগের গোড়ার কথা	ক্ষেত্রগুপ্ত
০২	বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসত্তা	মহম্মদ আসাদুজ্জামান
০৩	প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন : একটি রূপরেখা	অশ্রুকুমার সিকদার
০৪	বাংলা পদ-প্রকরণ : প্রসঙ্গ বাক্যাংশ	আজিজুল হক
০৫	বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট (১২০৪-১৫৩৫)	সুখময় মুখোপাধ্যায়
০৬	সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পুঁথি ও শাহ্ গরীবুল্লাহ্	মুহম্মদ আবদুল জলিল
০৭	চট্টগ্রাম রোসাঙে ইসলামী সংস্কৃতি	অমৃতলাল বালা
০৮	উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী শিক্ষা আন্দোলন	এম নুরুল ইসলাম মঞ্জুর
০৯	কালান্তর : মুসলিম প্রসঙ্গ	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
১০	বিস্মৃতপ্রায় এক অবিস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন	আবুবকর সিদ্দিক
১১	'রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন' প্রসঙ্গ	মযহারুল ইসলাম

ষড়বিংশ খণ্ড ১৩৯৭
সম্পাদক : ডক্টর মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া
(ড. আসাদুজ্জামান স্মৃতি সংখ্যা)

০১	উৎসর্গ	শেখ আতাউর রহমান
০২	ড. মুহম্মদ আসাদুজ্জমান : এক-ছয়	অনীক মাহমুদ
০৩	খাজা উসমান আফগানের পতন	আবদুল করিম
০৪	মীর মশাররফ হোসেন : অধিকাংশ বাঙালির জীবন ও মনের দরজা	ক্ষেত্র গুপ্ত
০৫	উনিশ শতকের সংস্কারবাদী চিন্তা ও রামমোহন রায়	আবুল কাশেম চৌধুরী
০৬	বাংলা পদ-প্রকরণ : প্রসঙ্গ বাক্যাংশ	আজিজুল হক
০৭	সোফোক্লিস	মোবাশ্বের আলী
০৮	কবি শ্রীমতি রহিমনিসার সময় কাল বিচার	আবদুল হক চৌধুরী
০৯	রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাবনা	মহম্মদ আসাদুজ্জামান
১০	আসাদুজ্জামানের কবিতা	চৌধুরী জুলফিকার মতিন
১১	স্মৃতির আলোকে	গোলাম সাক্‌লায়েন
১২	ময়মনসিংহ গীতিকা	আবদুল খালেক
১৩	*সাহিত্যিকী* পঞ্চবিংশ খণ্ড একটি পর্যালোচনা	শহিদুল ইসলাম

সপ্তবিংশ খণ্ড ১৩৯৮
সম্পাদক : মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

০১	ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন	আবদুল করিম
০২	আলাওলের বৈষ্ণব-কবিতা	অমৃতলাল বালা
০৩	মঙ্গলকাব্যের আলোকে মধ্যযুগীয় বাংলার ধর্মীয় অবস্থা	মাহমুদা খাতুন
০৪	আবদুল আলীম ও তাঁর ‘মৃগাবর্তী’ কাব্য	মুহম্মদ আবূ তালিব
০৫	সাহিত্য সমালোচক জোন্‌স	আবু তাহের মজুমদার
০৬	গল্পগুচ্ছে অলংকার উপমা : সমাজ প্রেক্ষিত	মোঃ হারুন-অর-রশীদ
০৭	লোককাহিনী এবং বিশ্বজনীনতা	পল্লব সেনগুপ্ত
০৮	শওকত ওসমানের ছোটগল্পে মানব প্রবৃত্তির বিবিধ অনুষঙ্গ	অনীক মাহমুদ
০৯	বাংলাদেশের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
১০	রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনা	মোল্লা এবাদত হোসেন
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র*	রবীন্দ্র গুপ্ত
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *মরমীকবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য*	মুহম্মদ আবদুল জলিল
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *রবীন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম এবং*	আবদুর রহীম খোন্দকার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *পরশুরামের গল্প : মন ও শিল্প*	সারোয়ার জাহান

অষ্টাবিংশ খণ্ড চৈত্র–১৩৯৯
সম্পাদক : খোন্দকার সিরাজুল হক

০১	মধুসূদন : *হেক্টর-বধ*	মোবাশ্বের আলী
০২	চোখের বালি	আমানুল্লাহ আহমদ
০৩	যশোরের আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	সেলীমা বেগম
০৪	অক্ষয়কুমার দত্ত : বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্ব	শেখ আতাউর রহমান
০৫	মাদ্রসা শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা : বিশ ও ত্রিশ দশকের বাংলা সাময়িকপত্রের দৃষ্টিতে	মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম
০৬	সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ঘুম নেই' : একটি সমীক্ষা	লাল মোহাম্মদ
০৭	বাংলাদেশের লোকনাট্য	মাহবুব আলম বেগ
০৮	'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' : একটি বিবেচনা	জুলফিকার মতিন
০৯	দোম এ্যান্তোনিও তাঁর বাংলা গদ্য	আবদুর রহিম খোন্দকার
	রমেশচন্দ্র সেন [গ্রন্থ সমালোচনা]	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মুসলিম কবি [গ্রন্থ সমালোচনা]	মুহম্মদ আবদুল জলিল
	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় [গ্রন্থ সমালোচনা]	খোন্দকার সিরাজুল হক
	The Portuguese Contribution to Bengali Prose, and Lexicography [গ্রন্থ সমালোচনা]	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
	মাতৃকা [গ্রন্থ সমালোচনা]	সাইফুদ্দীন চৌধুরী
	পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস [গ্রন্থ সমালোচনা]	সারোয়ার জাহান

উনত্রিংশ খণ্ড   চৈত্র–১৪০০
সম্পাদক : খোন্দকার সিরাজুল হক
(কাজী আবদুল মান্নান স্মারক-সংখ্যা)

০১	কাজী আবদুল মান্নান : স্মৃতিকথা	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
০২	কাজী আবদুল মান্নানের কয়েকটি চিঠি : প্রসঙ্গ কথা	আতাউর রহমান
০৩	সামন্ত অর্থনীতি ও শরৎচন্দ্রের কথাসহিত্য	সফিকুন্নবী সামাদী
০৪	লোকসংস্কৃতি চর্চায় আশুতোষ ভট্টাচার্য	মুহম্মদ আবদুল জলিল
০৫	গবেষণা পরিচালক কাজী আবদুল মান্নান	মুহম্মদ আবদুল খালেক
০৬	ডাঃ লুৎফর রহমানের সাহিত্যে নারীর অধিকার : সমকালীন নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে	ইসরাইল খান
০৭	মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে রোমান্স-স্বভাব : তত্ত্বগত পটভূমি	অমৃতলাল বালা
০৮	রবীন্দ্রকাব্যে জীবনজিজ্ঞাসা : জগতের মাঝে কত বিচিত্র	মোঃ হারুন-অর-রশীদ
০৯	ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান	আজাহার উদ্দীন খান
১০	কাজী আবদুল মান্নানের দুটি গবেষণা গ্রন্থের আলোচনা *আধুনিক বাঙালাসাহিত্যে মুসলিম সাধনা*	আনিসুজ্জামান
১১	*The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal* (Upto 1855 A.D.)	আনোয়ার পাশা
১২	কাজী আবদুল মান্নান : জীবনীপঞ্জী	এস.এম. আবদুল লতিফ

ত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র– ১৪০১
সম্পাদক : সারোয়ার জাহান
(বঙ্কিম-বিভূতি-ওদুদ স্মরণ সংখ্যা)

০১	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : পুনর্মূল্যায়নের খসড়া	আলী আনোয়ার
০২	বঙ্কিমচন্দ্র : *কপালকুণ্ডলা*	মোবাশ্বের আলী
০৩	বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা	অনীক মাহমুদ
০৪	বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-চেতনা : *দুর্গেশনন্দিনী*	অমৃতলাল বালা
০৫	বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যচিন্তা ও গদ্য	সৌমিত্র শেখর
০৬	বিভূতিভূষণের সাহিত্য : সৃষ্টির প্রকৃতি ও প্রভাব	হাসান আজিজুল হক
০৭	*পথের পাঁচালী* : কথা ও সুর	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
০৮	বিভূতিভূষণ : ক্ষুধার দলিল ও প্রাসঙ্গিকতা	নরারুণ ভট্টাচার্য
০৯	কাজী আবদুল ওদুদ	জুলফিকার মতিন
১০	কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী : একটি পর্যালোচনা	শহিদুল ইসলাম
	বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী **[গ্রন্থ সমালোচনা]**	আমানুল্লাহ আহমদ
	কাছে থেকে দেখা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায় **[গ্রন্থ সমালোচনা]**	আবদুর রহীম খোন্দকার
	কাজী আবদুল ওদুদ **[গ্রন্থ সমালোচনা]**	খোন্দকার সিরাজুল হক

একত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪০২
সম্পাদক : সারোয়ার জাহান

০১	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সমস্যা	মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
০২	*যোগাযোগ* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ	সনৎকুমার সাহা
০৩	*বেনের মেয়ে* ও *নীল ময়ূরের যৌবন*	সফিকুন্নবী সামাদী
০৪	আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : মূল্যায়নের ভূমিকা	আবুল আহসান চৌধুরী
০৫	দুই প্রতিবাদী নারী : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য	ফজিলাতুননেসা
০৬	রজনীকান্ত সেন : তাঁর কবিতা ও গান	শিখা আরেফীন
০৭	ভাষা চিন্তা : প্রসংগ ব্যাকরণের বিকাশ	আজিজুল হক
	[গ্রন্থসমালোচনা] *বিশ্বসাহিত্য*-মোবাশ্বের আলী	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*	অনীক মাহমুদ
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*	মুহম্মদ হায়দার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *কবিতার দেশ*	সালিম সাবরিন

দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪০৩
সম্পাদক : শেখ আতাউর রহমান
(নজরুল স্মরণ সংখ্যা)

০১	রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল	আজহারউদ্দীন খান
০২	কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা	খোন্দকার সিরাজুল হক
০৩	নজরুলের গান : বাণী ও সুর	সারোয়ার জাহান
০৪	বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া	জুলফিকার মতিন
০৫	নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্ম : ফিরে দেখা	শহিদুল ইসলাম
০৬	আধুনিকতা ও নজরুল ইসলাম	রফিকউল্লাহ খান
০৭	নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ	অনীক মাহমুদ
০৮	নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা	সফিকুন্নবী সামাদী
০৯	'ধুমকেতু'র একটি কবিতা ও অন্যান্য	লায়লা জামান
১০	বিদ্রোহী : আমিত্বের স্বরূপ আমি সহসা আমারে চিনেছি	মোঃ হারুন-অর-রশীদ
১১	হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম	অমৃতলাল বালা
১২	নজরুলের চিঠিপত্র	শহীদ ইকবাল
১৩	নজরুল কথাসাহিত্য : ভাষা বিন্যাসের নবদিগন্ত	সুজিত সরকার
১৪	কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা'	আমিনুর রহমান সুলতান

ত্রয়স্ত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪০৪-১৪০৭
সম্পাদক : শেখ আতাউর রহমান
(জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা)

০১	জীবনানন্দের নজরুল-বিপত্তি ও আনুষঙ্গিক ভাবনা	সনৎকুমার সাহা
০২	জীবনানন্দ দাশ : তাঁর 'সাতটি তারার তিমির'	খোন্দকার সিরাজুল হক
০৩	তিরিশের আধুনিকতা ও জীবনানন্দ দাশ	অনীক মাহমুদ
০৪	চেতনায় পরাবাস্তব : জীবনানন্দের কবিতা	মোঃ হারুন-আর-রশীদ
০৫	জীবনানন্দ-কাব্যলোক : অতীন্দ্রিয় চেতনা	অমৃতলাল বালা
০৬	জীবনানন্দ দাশের কাব্যে নিসর্গচেতনা ও ভাষা প্রসংগ	পি.এম. সফিকুল ইসলাম
০৭	বাংলা কবিতায় বিরোধাভাস : জীবনানন্দ দাশ	সুজিত সরকার
০৮	জীবনানন্দের উপন্যাসে সংলাপ : একটি শৈলীগত নিরীক্ষা	শামীমা হামিদ
০৯	জীবনানন্দ দাশের গল্পপঞ্চক : জীবন ও জীবনায়ণ	মিজানুর রহমান খান
১০	কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যানুচিন্তন : একটি সারোদ্ধার অন্বীক্ষা	সৌভিক রেজা
১১	জীবনানন্দ দাশ : কবিতার বহুমাত্রিক বিন্যাস	শহীদ ইকবাল
১২	জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে নারী-পুরুষ সম্পর্ক	মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ
১৩	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আবহমান বাংলাদেশ	শেখ রজিকুল ইসলাম
১৪	জীবনানন্দের জীবন-চরিত	উষারাণী সরকার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *জীবনানন্দের বনলতা সেন : কবিতার গদ্যভাষা ও অব্যয়ের ব্যবহার*	সালিম সাররিন

চতুস্ত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪০৮
সম্পাদক : জুলফিকার মতিন

০১	*ইডিপাস*: ট্র্যাজিক প্যারাডক্স ও অনুসৃত জীবনবোধ	আব্দুল্লাহ আল মামুন
০২	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও তুলনামূলক সাহিত্য	শামসুদ্দিন চৌধুরী
০৩	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পভূমি	মনিরা কায়েস
০৪	প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়	শিখা আরেফিন
০৫	শওকত ওসমানের *জননী* : পটভূমি ও শিল্পকুশলতা	মহীবুল আজিজ
০৬	*ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* : প্রত্যাবর্তন পুর্নবার	সরিফা সালোয়া ডিনা
০৭	মধ্যযুগীয় নৌ-শিল্পের বিকাশ : উৎস মঙ্গলকাব্য	ইমতিয়াজ আহমদ
০৮	তত্ত্বসংগীত কাম, প্রেম ও কামিনী প্রসঙ্গ	ড. আবুল হাসান চৌধুরী
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম : শব্দব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি*	আলী আনোয়ার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *পদ্মাপুরাণ*	আবদুল খালেক
	[গ্রন্থ সমালোচনা] নজরুল সাহিত্যে ধর্ম	শহিদুল ইসলাম
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা (১৯২০-১৯৪৭)*	প্রীতি কুমার মিত্র
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলমান চরিত্র পরিবার ও সমাজ*	মুহাম্মদ হাসান ইমাম
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *সমাজ ও সাহিত্য : আধুনিকতা অর্জনের ধারা*	সালিম সাবরিন

পঞ্চত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪০৯
সম্পাদক : জুলফিকার মতিন

০১	ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যের সত্য	অমৃতলাল বালা
০২	রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা	রহমান হাবিব
০৩	জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা : স্বপ্ন-প্রতীক তাৎপর্য	শিমুল মাহমুদ
০৪	কুসুমকুমারী দাশ	সুজিত সরকার
০৫	আবদুল গনি হাজারীর কবিতা	শহীদ ইকবাল
০৬	সংকটকালের কণ্ঠস্বর : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মনিরা কায়েস
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন*	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

ষষ্ঠত্রিংশৎ ও সপ্তত্রিংশৎ খণ্ড চৈত্র–১৪১০-১৪১১
সম্পাদক : ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল

০১	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা	সৌভিক রেজা
০২	বাংলার কৃষক সংগ্রাম : বাংলা সাহিত্য	সুজিত সরকার
০৩	*কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসে মানব-বীক্ষার স্বরূপ	শহীদ ইকবাল
০৪	গ্রামীণ সমাজ-পটভূমিতে বাংলাদেশের (১৯৪৭–৭১) উপন্যাস : ত্রয়ী শিল্পীর সৃজনকর্ম পরিচিতি (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও শহীদুল্লা কায়সার)	নূর মোহাম্মদ মল্লিক
০৫	জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসে দেশকাল	মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ
০৬	সরদার জয়েন উদ্‌দীনের কথাসাহিত্যে নগরজীবনের বাস্তবতা	ফজলুল হক সৈকত
০৭	রাজশাহী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত : মেয়েলীগীত	ড.মুহম্মদ আবদুল জলিল
০৮	সিরাজদ্দৌলা : ইতিহাসে–সাহিত্যে	অমৃতলাল বালা
০৯	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধে রাজনৈতিক চিন্তাধারা : দায় ও দ্রোহ	ড. শেখ রজিকুল ইসলাম
১০	আদিবাসী কোল : উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিচয়	হাবিবুর রহমান
১১	স্মৃতি তর্পণ (বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বদ্যালয়ের প্রয়াত তিনজন শিক্ষকের লেখা কয়েখটি পত্র)	জুলফিকার মতিন
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *চৌধুরী ওসমান*	মামুন হুসাইন

বর্ষ : ৪৮ অষ্টত্রিংশৎ খণ্ড আষাঢ়–১৪১৪/ জুন ২০০৭
সম্পাদক : প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন

০১	বনফুলের গল্পে নাটকীয়তা	সুজিত সরকার
০২	মাটি ও মানুষের দর্পণ : শাহেদ আলীর স্বনির্বাচিত গল্প	শামীমা হামিদ
০৩	কথাসাহিত্যে যাদুবাস্তবতা : প্রেক্ষিত হাসান আজিজুল হকের গল্প	সরিফা সালোয়া ডিনা
০৪	অন্য অবলোকন : কায়েস আহমেদের গল্প	মনিরা কায়েস
০৫	ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্য-প্রতিভা : প্রসঙ্গ *বহিপীর*	মিজানুর রহমান খান
০৬	কাব্যনাটকের সংজ্ঞার্থ এবং বাংলা কাব্যনাটকের স্বরূপ ও উৎস পর্যালোচনা	অনুপম হাসান
০৭	*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক	শহীদ ইকবাল

বর্ষ : ৫০ উনচত্বারিংশ খণ্ড বৈশাখ–১৪১৬/ মে ২০০৯
সম্পাদক : প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন

০১	চৌধুরী ওসমান : কবি ও কাব্যকৃতি	মোঃ হারুন-অর-রশীদ
০২	শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাসে জীবন ও জীবনবোধ	সরিফা সালোয়া ডিনা
০৩	সমাজ-নারী ও মানোবিকলন তত্ত্ব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলা উপন্যাস	সুজিত সরকার
০৪	সংসারক্লিষ্ট নারীর আখ্যান : হুমায়ুন কাদিরের গল্প	মনিরা কায়েস
০৫	*ক্রন্দসী* : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অভীপ্সিত আত্মপরিক্রমণের এষণা	সৌভিক রেজা
০৬	ভাষা আন্দোলন : হামিদুর রহমান ও নভেরার ভাস্কর্য	ড. মোস্তফা শরীফ আনোয়ার
০৭	আবিদ আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শৈলী	আনিরুদ্ধ কাহালি
০৮	কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রা* : তত্ত্বচেতনায় শিল্পরূপায়ণ প্রসঙ্গে	সোয়াইব জিবরান
০৯	বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক	অনুপম হাসান
১০	তিনটি সাম্প্রতিক উপন্যাস : নারীবাদী বিবেচনা	শামসুন নাহার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *বাংলাদেশের কবিতায় সংকেত ও ধারা*	রহমান রাজু

বর্ষ : ৫১   চত্বারিংশ খণ্ড   আষাঢ়–১৪১৭/জুলাই ২০১০
সম্পাদক : প্রফেসর সফিকুন্নবী সামাদী

০১	কবিতায় ব্যক্তি-তর্পণ : প্রসঙ্গ শামসুর রাহমানের কবিতা	সরিফা সালোয়া ডিনা
০২	শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : সময়, সমাজ ও মানুষ	অনিরুদ্ধ কাহালি
০৩	আলাউদ্দিন আল আজাদের মানোনীত গল্প : বহুস্তরীয় বিরূপ বাস্তবতার উন্মোচন	মোহাঃ সাইদুর রহমান
০৪	কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাব্যনুচিন্তন : আত্মসচেতনতার উজ্জ্বল উন্মোচন	সৌভিক রেজা
০৫	স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত (১৯৪৭-১৯৭১)	রিষিণ পরিমল
০৬	*জীবন আমার বোনের* খোকা : বিনাশী রাষ্ট্রের উন্মুল নাগরিক	মোঃ মেহেদী হাসান
০৭	শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদের উপন্যাস : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ	আনোয়ার সাঈদ
০৮	বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতি	গৌতম কুমার দাস
০৯	রাগসঙ্গীত : ভাবের অভিব্যক্তি	অসিত রায়
১০	নাট্যতত্ত্বের আলোকে সংস্কৃত প্রকরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ	বিপুল কুমার বিশ্বাস
১১	প্রসঙ্গ সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশে	মো. আতাউর রহমান
১২	সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত	তারেক রেজা
১৩	লেডি ম্যাকবেথ : নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে	শিবলী চৌধুরী
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *লক্ষ্য যেথা স্থির*	ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা*	চন্দন আনোয়ার
	[গ্রন্থ সমালোচনা] *উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*	তবিবুর রহমান

বর্ষ : ৫২ একচত্বারিংশ খণ্ড আশ্বিন–১৪১৮/অক্টোবর২০১১
সম্পাদক : প্রফেসর সফিকুন্নবী সামাদী

০১	লোকসাহিত্যে নারীর অংশীদারিত্ব : নৃতাত্ত্বিক বিবেচনা	মো. নাজমুল হক
০২	বাংলাদেশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠির জীবনপাঠ : প্রসঙ্গ মণিপুরি	এ এস এম আবু দায়েন
০৩	বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ ও খেয়াল	অসিত রায়
০৪	রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যচিন্তা	মোস্তফা তারিকুল আহসান
০৫	কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রা* : একটি নারীবাদী পর্যবেক্ষণ	নাহিদ হক
০৬	সেলিম আল দীনের *চাকা* : বিষয় ও আঙ্গিক	হোসনে আরা জলী
০৭	বাংলাদেশের উপন্যাসে দেশভাগ	মিল্টন বিশ্বাস
০৮	নজরুল গানে ভৈরব রাগ	পদ্মিনী দে
০৯	*আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে নারীর স্বর : ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা	সোহানা বিলকিস
১০	সাঈদ আহমদের নাট্যবিশ্ব : তত্ত্ব ও নির্মিতি	ফারহানা আখতার
১১	সমরেশ বসুর গল্পে নিম্নবর্গের জীবন	মো. খোরশেদ আলম
১২	সমর সেনের কবিতা : অন্ধকারের চিত্রনাট্য	মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার
১৩	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রাচীন ভারত, আবহমান বাংলা ও হিন্দুপুরাণ অনুষঙ্গ	শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ
১৪	*দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* : নারীর অন্তর্বয়ন	শারমীন মুস্তারী
১৫	বাংলা কথাসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ ও ভাবনা	মো. ফখরুল ইসলাম
১৬	রবীন্দ্রসঙ্গীত ও দুটি ছোটগল্প : একটি সমীক্ষা	সরোজ কুমার ঘোষ
১৭	বাংলাদেশের তিন দশকের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা (১৯৪৭-১৯৭১)	তবিবুর রহমান
১৮	হুমায়ুন আজাদের কবিতা : স্বদেশ ও রাজনীতি	শামীম নওরোজ

বর্ষ : ৫৩ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড বৈশাখ–১৪১৯/২০১২
[সার্ধশত রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা]
সম্পাদক : প্রফেসর সফিকুন্নবী সামাদী

০১	আমার জীবনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০২	‘রবীন্দ্রনাথ ও আজকের আমরা : মূল্যায়নের প্রশ্নে’	সনৎকুমার সাহা
০৩	পান্থ তিনি, পান্থজনের সখা	তপোধীর ভট্টাচার্য
০৪	“কালের যাত্রার ধ্বনি”	পল্লব সেনগুপ্ত
০৫	রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ছোটগল্প	রবিন পাল
০৬	লোকদর্পণে রবীন্দ্রনাথ	সত্যবতী গিরি
০৭	আদিমতার সন্ধানে	জুলফিকার মতিন
০৮	রবীন্দ্রগানের ভুবন	চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত
০৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাগভাবনা	অসিত রায়
১০	রবীন্দ্রছোটগল্পে নিম্নবর্গ চরিত্র ও প্রসঙ্গ	মোস্তফা তারিকুল আহসান
১১	রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ভূমি ও মানুষ	গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
১২	রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ‘মেঘদূত’ প্রসঙ্গ	মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার (তারেক রেজা)
১৩	নজরুলের গানে রবীন্দ্রসুর	পদ্মিনী দে
১৪	থিয়েটার ও রবীন্দ্রনাথ	এ টি এম ফরহাদ-উজ-জামান
১৫	রবীন্দ্রনাথ ও অস্তিত্ববাদ : সাদৃশ্যের অনুসন্ধানে	মো. এলাম উদ্দীন
১৬	রবীন্দ্রনাথের গানে লোকধর্মতত্ত্ব	মো. আরিফুর রহমান

বর্ষ : ৫৪ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২০/জুন ২০১৩
সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ

০১	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তিন নারী : মৃণাল, অনিলা ও বিভা	শামীমা হামিদ
০২	বাউলদর্শনের ক্রম-বিবর্তন ও শাহ আবদুল করিম	আবু দায়েন
০৩	শহীদুল্লা কায়সারের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : *কবে পোহাবে বিভাবরী* : বিষয় ও শিল্পরূপ	আরজুমন্দ আরা বানু
০৪	প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মানব-সম্পর্কের স্বরূপ	শামীমা সুলতানা
০৫	সমরেশ বসুর উপন্যাস : ভাষা-নির্মিতির বৈচিত্র্য	মো. খোরশেদ আলম
০৬	সুফিয়া কামালের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ	রিষিণ পরমিল
০৭	আবুবকর সিদ্দিকের ছোটগল্প : জীবনের গভীর ভাষ্যচিত্র	মোস্তাফা তারিকুল আহসান
০৮	বাংলা ধ্রুপদ গানে কাজী নজরুল ইসলামের আবদান	অসিত রায়
০৯	কৃত্যমূলক পাঁচালি গাজীর গান : আঙ্গিক ও পরিবেশনরীতি	মো. আবদুল হালিম প্রামানিক
১০	'তোতা-কাহিনী' : রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা	হিমেল বরকত
১১	'মেটামরফসিস' : বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার ঐকতান	রেজওয়ানা আবেদীন
১২	কাজী নজরুল ইসলামের গানে বিদেশি সুর	পদ্মিনী দে
১৩	প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস	শামসুন নাহার
১৪	শহীদুল জহিরের *পারাপার* : আঙ্গিক-নিরীক্ষা	তাশরিক-ই-হাবিব
১৫	কবিচেতনায় মৃত্যুবোধ এবং শামসুর রাহমান	তানভীর দুলাল
১৬	রবীন্দ্রসংগীত আস্বাদন : তথ্যের তাৎপর্য	ফজলে এলাহি চৌধুরী
১৭	শওকত আলীর ট্রিলজি *দক্ষিণায়নের দিন* : শিল্পরূপ	লোপামুদ্রা রহমান
১৮	জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা	মো. এলাম উদ্দীন
১৯	সোমের চন্দের গল্প : বিষয়বিন্যাস	তবিবুর রহমান

বর্ষ : ৫৫ চতুশ্চত্বারিংশৎ খণ্ড আষাঢ়–১৪২১/জুন ২০১৪
সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ

০১	প্রেমেন্দ্র মিত্রের তিনটি গল্প : জীবনের রূপ ও গল্পবয়নরীতি	মিজানুর রহমান খান
০২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ : উপনিবেশিতের চোখে	মোঃ মেহেদী হাসান
০৩	সাধন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প : বিষয় ও আঙ্গিক	নাহিদ হক
০৪	নারীর উপন্যাসে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ : স্বপ্নচারীর সংকল্প ও বিপন্নতা	ফরজানা সিদ্দিকা
০৫	আবদুল গনি হাজারীর কবিতায় বিষয়বৈভব	এম. আবদুল আলীম
০৬	বাংলাদেশের কবিতা : স্বাধিকার-চেতনা	লোপামুদ্রা রহমান
০৭	*ধর্মমঙ্গল কাব্যের* সমাজ ও মানুষ	শামীম আরা
০৮	রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* : প্রেম ও রূপান্তর প্রসঙ্গ	ফজলে এলাহি চৌধুরী
০৯	শ্বশুরবাড়ির বন্দিজীবনে গৃহবধূ : লিঙ্গ-বৈষম্যের আলোচনায় উত্তরাঞ্চলের লোকসঙ্গীত	শিবলী চৌধুরী
১০	বনফুলের *স্থাবর* : জঙ্গমতার ইতিবৃত্ত	মোসা. শামসুন নাহার
১১	মাহমুদুল হকের *কালো বরফ* : বিচ্ছিন্ন-সত্তার অন্তর্দাহ	তানভীর হায়দার
১২	কৃতী শিক্ষাবিদ-গবেষক অধ্যাপক এস.এম. অবদুল লতিফ [শ্রদ্ধা]	অনীক মাহমুদ

বর্ষ : ৫৬ পঞ্চচত্বারিংশৎ খণ্ড বৈশাখ– ১৪২২/এপ্রিল ২০১৫
সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ

০১	‘ভোরের আলো’: একটি বিলুপ্ত পত্রিকা	জুলফিকার মতিন
০২	কবি ওমর আলীর ‘শ্যামল রঙ রমণী’ : তার সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন	ড. তাসলিমা বেগম
০৩	কবি আবুল হোসেন : জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি	ড. রেজাউল করিম তালুকদার (তারেক রেজা)
০৪	গানে নজরুল : প্রসঙ্গ ফুল	ড. সুমাইয়া খানম
০৫	হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : প্রসঙ্গ আখ্যান-নির্মাণ ও চরিত্রায়ণ	ড. চন্দন আনোয়ার
০৬	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাধা : বৈষ্ণব জীবন	মো. ফখরুল ইসলাম
০৭	শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-ভাবনায় অস্তিত্ববাদী দর্শন	মো. এলাম উদ্দীন
০৮	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর চোখে শেকস্‌পীয়ারের মেয়ে : *ওথেলোর* ডেসডিমোনা	মোছা. আমিনা খাতুন
০৯	অসীম রায়ের *আবহমানকাল* : জীবনের রূপায়ণ	আসমা ইয়াসমীন রুনা
১০	জীবনানন্দ দাশের ‘মাঠের গল্প’ : রিক্ত পৃথিবী ও শূন্য জীবনের গল্প	কল্পনা হেনা
১১	আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক *কোকিলারা* : শিল্পরীতি	মোহাম্মদ শামসুল আলম

বর্ষ : ৫৭ ষট্চত্বারিংশৎ খণ্ড কার্তিক–১৪২৩/নভেম্বর ২০১৬
সম্পাদক : প্রফেসর অমৃতলাল বালা

০১	হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদের সমস্যা : প্রেমচন্দ প্রসঙ্গ	সফিকুন্নবী সামাদী
০২	প্রফেসর ড. আবদুর রহীম খোন্দকার : জীবন ও কর্ম	ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম ও মাহমুদা আকতার
০৩	কমলকুমারের গল্প : ঔপনিবেশিকতা এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের অস্তিত্ববোধের স্বরূপ	চঞ্চল কুমার বোস
০৪	ঔপন্যাসিক জসীম উদ্‌দীন : গ্রামীণ ঐতিহ্যের রূপকার	ড. নাজমুল হাসান তালুকদার
০৫	সুফিপ্রেমের ঐশীচেতনা : প্রসঙ্গ হাছন রাজার গান	মো. ফয়জুল হক
০৬	আনিস চৌধুরীর নাটকে নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্র	মীর হুমায়ুন কবীর
০৭	শামসুর রাহমানের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা	ড. মুশফিকুর রহমান
০৮	আবুল হাসানের কবিতা : প্রকৃতি ও প্রবণতা	মোহাম্মদ আব্দুর রঊফ
০৯	গানের ছন্দ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত	ড. ঝুমুর আহমেদ
১০	সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* : প্রতিবাদের এক শিল্পরূপ	তৃপ্তি সরকার
১১	বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ভাষা (১৯৭১-২০০৫) একটি ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা	নাহিদা বেগম
১২	আহসান হাবীবের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিত এবং সমসাময়িক কবিমানসের চেতনাচিত্র	মো. ইসমাইল হোসেন সাদী

বর্ষ ৫৮ সপ্তচত্বারিংশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৪/জুন ২০১৭
সম্পাদক : প্রফেসর অমৃতলাল বালা

০১	যেমন রবীন্দ্রনাথ	সনৎকুমার সাহা
০২	রবীন্দ্রনাথ-পুনর্ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিত	জুলফিকার মতিন
০৩	মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কবিতা : ভাবরূপের পালাবদল **[আমন্ত্রিত বক্তৃতা]**	রফিকউল্লাহ খান
০৪	শওকত ওসমানের উপন্যাস : উপনিবেশবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা **[আমন্ত্রিত বক্তৃতা]**	সৈয়দ আজিজুল হক
০৫	কিছুই জানা ছিল না, জানতে চেয়েছি **[আমন্ত্রিত বক্তৃতা]**	মহীবুল আজিজ
০৬	রফিক আজাদের কবিতায় ঐতিহ্য ও মৃত্তিকা সংলগ্নতার পরিচয়	পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা
০৭	এস.এম. সোলায়মানের নাটক : বৈচিত্র্যময় সমকাল	মো. আতাউর রহমান
০৮	আহমদ শরীফের সাক্ষাৎকার : কালের যাত্রার ধ্বনি	মোঃ রিজাউল ইসলাম
০৯	নারী জীবনের আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পভাষ্য : প্রসঙ্গ *মতিজানের মেয়েরা*	শিরিন আক্তার সরকার
১০	গণনাট্য আন্দালন ও ঋত্বিক ঘটকের নাটক	রুবেল আনছার
১১	সাহিত্য-মিথ-মনসা : *নাগিনী কন্যার কাহিনী*	শামসুন নাহার
১২	আল মাহমুদের কবিমানস ও কাব্যভাষা : *সোনালি কাবিন*-পরবর্তী পর্যায়	তানভীর দুলাল
১৩	আহসান হাবীব : কবিসত্তা এবং কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য	মো. ইসমাইল হোসেন সাদী

বর্ষ : ৫৯ অষ্টচত্বারিংশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৫/জুন ২০১৮
সম্পাদক : প্রফেসর ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম

০১	সাঁওতালি ভাষা : একটি সাধারণ সমীক্ষা	ড. পি.এম. সফিকুল ইসলাম
০২	রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদবিরোধিতা	সুজিত সরকার
০৩	সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* : শিকড়সংকীর্তন ও নাট্যরীতির স্বাতন্ত্র্য	মিজানুর রহমান খান
০৪	চর্যাপদের প্রাকৃতিক পরিবেশ	গৌতম দত্ত
০৫	সানাউল হকের কবিতায় চরিতচর্চা	ড. মো. সুজা উদ-দৌলা
০৬	নিঃসঙ্গ ও একাকী ওফেলিয়া নয়, হ্যামলেট	মোছা. আমিনা খাতুন
০৭	শহীদ কাদরীর কবিতা : স্বনির্মিত স্বতন্ত্র স্বর	ড. আরজুমন্দ আরা বানু
০৮	কাজী নজরুল ইসলামের জাগরণী গানের কাব্যমূল্য	ড.জি.এম. মনিরুজ্জামান, নাজিয়া সুলতানা নিশি
০৯	মাহমুদুল হকের উপন্যাস : দ্বিবাচনিকতার সূত্র-সন্ধান	শামসুজ্জামান মিলকী
১০	রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান : বাণী, সুর ও ছন্দ	ড. ঝুমুর আহমেদ
১১	রংপুরের ভাওয়াইয়া ও মেয়েলিগীতে যৌতুক প্রথা	ড. শিবলী চৌধুরী
১২	সকল রসের ধারা [**আমন্ত্রিত বক্তৃতা**]	ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়
১৩	পারা ও পারাহীন আয়নায় [**আমন্ত্রিত বক্তৃতা**]	জাহিদ হায়দার

বর্ষ : ৬০ উনপঞ্চাশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৬/জুন ২০১৯

[প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল স্মরণ সংখ্যা]

সম্পাদক : প্রফেসর ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম

০১	প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল এর জীবনী ও সাহিত্য সাধনা : সংক্ষিপ্ত পরিলেখ	অনীক মাহমুদ
০২	মানিকপুরের যাত্রী : মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল
০৩	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল এর ভাষা গবেষণা প্রসঙ্গ	ড. পি.এম. সফিকুল ইসলাম
০৪	সত্যেন সেনের *পুরুষমেধ* : সুসভ্য যুগে প্রাক-সভ্যতার চর্চা	ড. শামসুন নাহার
০৫	*মহাভারত*-এর কুন্তী : নিঃসঙ্গ-শোকার্ত নারী	পুরনজিত মহালদার
০৬	মহাদেব সাহার রবীন্দ্রচর্চায় 'আনন্দের মৃত্যু নেই' : একটি পর্যালোচনা	তানিয়া তহমিনা সরকার
০৭	শওকত আলীর উপন্যাসে বিধৃত অধিকার সচেতন মানুষের কথা	ড. মনোরমা ইসলাম
০৮	হরিশংকর জলদাসের *দহনকাল* : নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনবেদ	ড. মো. সুজা উদ-দৌলা
০৯	বাংলার লোকনাট্য : সত্যপীরের গান	মাহমুদা আকতার
১০	শামসুর রাহমানের কাব্যভাষা : রূপ ও রূপান্তর	ড. তানভীর দুলাল
১১	*উজানে মৃত্যু* ও *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকে প্রতিফলিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন : একটি তুলনামূলক আলোচনা	মোছাঃ আঞ্জুমানআরা বেগম
১২	ওমর আলীর কাব্য : স্থানিক ও জাতিক ভাবনা	ড. মো. আবদুল মজিদ
১৩	শামসুর রাহমানের কবিতায় নারীপ্রেম	ড. মুশফিকুর রহমান
১৪	ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ	ড. কুদরত-ই-হুদা
১৫	বাউলগানে নারী : স্তুতি ও নিন্দা	ড. নাসিমা খাতুন
১৬	কুষ্টিয়ার উপভাষা : ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	গৌতম কুমার দাস

বর্ষ : ৬১ পঞ্চাশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৭/জুন ২০২০
সম্পাদক : প্রফেসর ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম

০১	কাজী আবদুল মান্নান : জীবন ও সাহিত্য	ড. আবদুল খালেক
০২	মযহারুল ইসলাম : জীবন ও কর্ম	ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল
০৩	মিশনারি চ্যাম্পিয়ন জন মারডক এবং উনিশ শতকের শিক্ষা-পরিস্থিতি	মহীবুল আজিজ
০৪	রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা* উপন্যাসে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও মুক্তিযুদ্ধ	চন্দন আনোয়ার
০৫	ছন্দ-কাঠামোর পরিবর্তনে নতুন গঠন : গদ্যকবিতা	মোছা. আমিনা খাতুন
০৬	হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ *পাতালে হাসপাতালে* : নিরন্ন ব্রাতজনের আখ্যান	সুলতানা নাজনীন
০৭	লোকনাট্যে নারী : তপন-মদন, মেহেরন্নেসা ও লালবানু-শাহজামাল পালা	ড. শামস্ আল্‌দীন
০৮	রাজশাহী অঞ্চলের প্রবচন : বিষয়বৈচিত্র্য	গাজী মাহমুদ হাসান
০৯	সমকালীন চারুকলাচর্চায় শিল্পী রোকেয়া সুলতানা প্রকৃতি ও নারীর মানবিক যাত্রা	মুসলিমা হাফিজ চৌধুরাণী
১০	*গড় শ্রীখণ্ড* : ইতিহাসের মানবিক আখ্যান	মেহেদী হাসান

বর্ষ : ৬২ একপঞ্চাশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৮/জুন ২০২১
সম্পাদক : সুজিত সরকার

০১	হাট-বাজারের কবিতা	বিলু কবীর
০২	অভিনেতার বাচিক প্রস্তুতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গ	ওয়াহীদা মল্লিক ও রহমত আলী
০৩	বেঠবেগারীর ভয়াবহতা : প্রসঙ্গ *আরণ্যের অধিকার* ও *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর*	ড. শামীম আরা
০৪	মনোজ মিত্রের নাটকে বাচনিক নাট্যশ্লেষ	ড. রুবেল আনছার
০৫	রবীন্দ্র কাব্যলোক : প্রত্যয়, প্রবণতা ও আন্তর্জাতিক ভাবনা	আবদুল মজিদ
০৬	বাংলা মঞ্চনাটকে নারীশিল্পীর আবির্ভাব : প্রাথমিক সূত্রসন্ধান	সুমনা সরকার
০৭	নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার	মো. আব্দুল খালেক
০৮	সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* উপন্যাসে 'চেতনাপ্রবাহরীতি' এবং 'হেপটিক'-এর অনুষঙ্গ ও স্বরূপ	ড. সরোজকুমার ঘোষ
০৯	স্বর্ণকুমারী দেবীর *কাহাকে* : নারীমনের দোলাচলবৃত্তি	ইয়াসমিন সুলতানা
১০	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফবিজম	মুঞ্জু রানী দাস

বর্ষ : ৬৩ দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ– ১৪২৯/জুন ২০২২
সম্পাদক : সুজিত সরকার

০১	জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস-পাঠ : *কারুবাসনা*	আহমেদ মাওলা
০২	শাহীন আখতারের *তালাশ* উপন্যাস : বীরঙ্গনা জীবনের বিরূপ-বাস্তবতা	শারমিন আক্তার
০৩	সুকুমার রায়ের সাহিত্য : তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ	জাকিয়া সুলতানা মুক্তা
০৪	*নামহীন গোত্রহীন* : মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞান	মোছাঃ আঞ্জুমানআরা বেগম
০৫	বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা' ও শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*	সঞ্জয় বিক্রম
০৬	সিকদার আমিনুল হকের কবিতা : যাপিত জীবনের ক্লেদ ও জঙ্গমতা	শামীম আক্তার
০৭	বাংলাদেশে শিল্পচর্চায় নারী-শিল্পীর অবস্থান	মুসলিমা হাফিজ চৌধুরাণী
০৮	বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ : মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র মেলবন্ধন	মো. ইসমাইল হোসেন সাদী
	[পুস্তক সমালোচনা] *অমরত্বের জ্বালা*	মনিরা কায়েস

সেমিনার লাইব্রেরী
তা:..................
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

ক. *সাহিত্যিকী*র লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১. শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে লিখিত যে কোনো মৌলিক প্রবন্ধ, যা অন্য কোনো গবেষণা পত্রিকায় প্রেরিত হয়নি বা ইতোমধ্যে ছাপার জন্য মনোনীত হয়নি, *সাহিত্যিকী*তে প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়।

২. সম্পাদকের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারী কর্তৃক মূল্যায়নের পর এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৩. উপরিউক্ত বিষয়ে লিখিত যে কোনো প্রবন্ধের ২ কপি সম্পাদকের নিকট সরাসরি বা ডাক যোগে প্রেরণ করতে হবে। লেখার সঙ্গে সম্পাদকের মেইলেও (shiqbal70@gmail.com) পাঠাতে হবে।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি/পদবি লিপিবদ্ধ থাকবে। মূল প্রবন্ধ শিরোনামসহ ২য় পৃষ্ঠা থেকে শুরু করতে হবে। ২য় পৃষ্ঠায় লেখকের কোনো নাম থাকবে না।

৫. প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'সুতন্বীএমজে' ফন্টে ২ লাইনের মাঝখানে ১.৫ ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে পাঠাতে হবে। কাগজের উপরে ও নিচে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা খালি রাখতে হবে।

৬. মূল পাঠে সংগতি রেখে যথাসম্ভব অধ্যায় (chapter) ও উপ-অধ্যায়ে (sub-chapter) ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়কে শিরোনামসহ যথাক্রমে ১ ও ১.১, ১.১.১ ইত্যাদিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

৭. প্রবন্ধের শুরুতে কম-বেশি ১০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।

৮. প্রবন্ধে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

খ. টীকা, উদ্ধৃতি ও সূত্র ব্যবহারের নিয়মাবলি

১. মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে অথবা নতুন কোনো অভিধা (term) সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হলে তা মূল-পাঠের অতিরিক্ত 'অন্ত্য-টীকায়' (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্যে অধিসংখ্যা (superscript) যথা : ১, ২ ইত্যাদি প্রদানপূর্বক মূল পাঠের শেষে 'অন্ত্য-টীকায়' (end-note) সংখ্যা উল্লেখসহ এগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হবে।

২. উদ্ধৃতি ও সূত্র

ক. প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো লেখকের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা এব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) ও উদ্ধৃতি সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃ দৈর্ঘ্য ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম দিকে ১/৪ ইঞ্চি ভেত (indenting) নতুন অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃ চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ :

বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমানগণের ইহা অপেক্ষা শতগুণ বড় অবদান আে তাঁহারা ঐ বিরাট সাহিত্যের শুধু পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা এবং লেখক নহে তাঁহারা ইহার রক্ষক। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৪৪ : ৮২)

খ. উদ্ধৃতি সূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে লেখকে পারিবারিক উপাধি নয়, বরং মূল নাম যথা : রবীন্দ্রনাথ, শহীদুল্লাহ্ ইত্য প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ উল্লেখ করতে হবে (দেখুন, পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি)।

গ. প্রবন্ধকার অন্য লেখকের উদ্ধৃতিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা (paraphrasin করলে পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখের দরকার নেই। আবার কোনো উদ্ধৃতির মূল লেখক য প্রবন্ধকারের বাক্যের অংশ হয়ে যান, সেক্ষেত্রেও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করতে হ না। যেমন, দীনেশচন্দ্র (১৯৪৪) ব্যাখ্যা করেন যে, ... ইত্যাদি।

৩. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে একটি **সহায়কপঞ্জি** (references) প্রদান করতে হে এই সহায়কপঞ্জিতে কেবল মূল পাঠের উদ্ধৃতি সূত্রে উল্লিখিত লেখক ও গ্রন্থে বর্ণনা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হে বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য আলাদাভাবে **সহায়কপঞ্জি** রচনা করতে হে যেখানে প্রথমে বাংলা গ্রন্থাদি স্থান পাবে।

বই থেকে

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১১)। *মন ও মনন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সম্পাদিত বই থেকে

সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া খণ্ড ১* । বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, ঢাকা।

সম্পাদিত বই থেকে প্রবন্ধ

আহমদ রফিক (২০১২)। ‘রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন : ভাবনায় ও কর্মে’। *সার্ধশতব রবীন্দ্রনাথ* [সম্পা. আনিসুজ্জামান], বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা। পৃ, ৩৭-৪৬

গবেষণা পত্রিকা থেকে

আলী আনোয়ার (১৯৯৫)। ‘বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : পুনর্মূল্যায়নের খসড়া সাহিত্যিকী, সংখ্যা : ৩০, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ১১-৪৬

ISSN 1994-4888